১

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ

সূচীপত্র

ভূমিকা

সাহাবা কারা?

'সাহাবী' শব্দটি আরবী ভাষার 'সুহবত' শব্দের একটি রূপ। একবচনে 'সাহেব' ও 'সাহাবী' এবং বহুবচনে 'সাহাবা' ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থ সংগী, সাথী, সহচর, এক সাথে জীবন যাপনকারী অথবা সাহচর্যে অবস্থানকারী। ইসলামী পরিভাষায় 'সাহাবা' শব্দটি দ্বারা রাসূলুল্লাহর (সা) মহান সংগী-সাথীদের বুঝায়। 'সাহেব' শব্দটির বহুবচনের আরো কয়েকটি রূপ আছে। তবে রাসূলুল্লাহর (সা) সংগী-সাথীদের বুঝানোর জন্য 'সাহেব'-এর বহুবচনে 'সাহাবা' ছাড়া 'আসহাব' ও 'সাহব'ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আল্লামা ইবন হাজার (রাহ) *'আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা'* গ্রন্থে সাহাবীর সংজ্ঞা দিতে দিয়ে বলেন ঃ ইন্নাস সাহাবিয়্যা মান লাকিয়ান নাবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মু'মিনান বিহি ওয়া মাতা আলাল ইসলাম'– অর্থাৎ সাহাবী সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন।

উপরোক্ত সংজ্ঞায় সাহাবী হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ঈমান (২) ঈমানের অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ (আল-লিকা) (৩) ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ (মাউত 'আলাল ইসলাম)।

প্রথম শর্তটি দ্বারা এমন লোক সাহাবী বলে গণ্য হবে না যারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাক্ষাৎ তো লাভ করেছে কিন্তু ঈমান আনেনি। যেমন ঃ আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ মক্কার কাফিরবৃন্দ। দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্বারা এমন ব্যক্তিও সাহাবী বলে গণ্য হবেন, যিনি হুজুরের তো সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, কিন্তু অন্ধত্ব বা এ জাতীয় কোন অক্ষমতার কারণে চোখে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যেমন ঃ অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম (রা)।

তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ মাউত 'আলাল ইসলাম দ্বারা এমন লোকও সাহাবীদের দলে শামিল হবেন, যাঁরা ঈমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। তারপর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছেন। তারপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন। পুনরায় ইসলাম গ্রহণের পর নতুন করে রাসূলুল্লাহর (সা) সাক্ষাৎ লাভ না করলেও তিনি সাহাবী বলে গণ্য হবেন। এটাই সর্বাধিক সঠিক মত। যেমন ঃ হযরত আশয়াস ইবন কায়েস (রা) ও আরো অনেকে। হাদীস বিশারদগণ আশয়াস ইবন কায়েসকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহে সংকলন করেছেন। অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যান এবং হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে আবার ইসলামে ফিরে আসেন।

শেষোক্ত শর্তের ভিত্তিতে এমন ব্যক্তি সাহাবী বলে গণ্য হবেনা যে ইসলামের অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাক্ষাৎ লাভ করেছে, কিন্তু পরে মুরতাদ অবস্থায় মারা গেছে। যেমন ঃ আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ আল-আসাদী। সে মুসলমান হয়ে হাবশায় হিজরাত করার পর খৃষ্টান হয়ে যায় এবং সেখানে মুরতাদ অবস্থায় মারা যায়। তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল, রাবীয়া ইবন উমাইয়্যা প্রমুখ মুরতাদ ব্যক্তিবর্গ। সাহাবী হওয়ার জন্য ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ শর্তটি উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাতের পর তাঁর সাহচর্য বেশী বা অল্প দিনের জন্য হউক, রাসূলুল্লাহর (সা) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করুক বা না করুক, রাসূলুল্লাহর সংগে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক, এমন কি যে ব্যক্তির জীবনে মুহূর্তের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) সাক্ষাত লাভ ঘটেছে এবং ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, এমন সকলেই সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

যারা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ঈমান আনেনি; কিন্তু পূর্ববর্তী অন্য কোন নবীর প্রতি ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহর (সা) সাক্ষাৎ লাভ করেছে, তারা সাহাবী নয়। আর 'বুহাইরা' রাহিবের মত যাঁরা পূর্ববর্তী কোন নবীর প্রতি ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের পূর্বে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন, তিনি ভবিষ্যতে নবী হবেন– এমন ব্যক্তিদের সাহাবা হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। মুসলিম মনীষীরা তাঁদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারেননি।

উল্লেখিত সংজ্ঞার শর্তাবলী জ্বীনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জ্বীনরাও 'সাহাবা' ছিলেন। কুরআন মজিদে এমন কিছু জ্বীনের কথা বলা হয়েছে যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) কুরআন তিলাওয়াত শুনে ঈমান এনেছিলেন। নিঃসন্দেহে তারা অতি মর্যাদাবান সাহাবা ছিলেন।

সাহাবীর উল্লেখিত সংজ্ঞাটি ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলসহ অধিকাংশ পণ্ডিতের নিকট সর্বাধিক সঠিক বলে বিবেচিত। অবশ্য সাহাবীর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি অপ্রসিদ্ধ মতামতও আছে। যেমন, কেউ কেউ সাক্ষাতের (আল-লিকা) স্থলে চোখে দেখার (রু'ইয়াত) শর্ত আরোপ করেছেন। কিন্তু তাতে এমন সব ব্যক্তি বাদ পড়ে যাবেন যাঁরা মুমিন হওয়া সত্ত্বেও অন্ধত্বের কারণে রাসূলুল্লাহকে (সা) চোখে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যেমন ঃ আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম (রা)। অথচ তিনি অতি মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন ঃ সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, এক বা দু'বছর রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য অথবা তাঁর সাথে দু'একটি গাযওয়া বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ। কিছু সংখ্যক উলামায়ে উসূল ও উলামায়ে ইলমুল কালাম-এর মতে, সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহর (সা) দীর্ঘ সাহচর্য ও সুন্নাতে নববীর (সা) অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁর পরিচিতি ও খ্যাতি। কেউ কেউ আবার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। একদল আলিমের মতে যে ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর এক নজর রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখেছেন, তিনি সাহাবী। আর যিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখেছেন,

তিনিও সাহাবী। তবে এ হিসেবে যে, রাসূল (সা) তাকে দেখেছেন। তিনি রাসূলকে (সা) দেখেছেন সে হিসেবে নয়। কিন্তু হাদীস বর্ণনার দিক দিয়ে এমন ব্যক্তি সাহাবী নন, বরং তাবেঈর মর্যাদা লাভ করবেন। প্রশ্ন হতে পারে, যদি কেউ রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর দাফনের পূর্বে তাকে দেখে থাকেন, যেমনটি ঘটেছিল প্রখ্যাত আরবী কবি 'আবু জুয়ায়িব আল-হুজালীর' ক্ষেত্রে– তাঁর ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হবে? আলিমদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো, এমন ব্যক্তি সাহাবীদের দলভুক্ত হবেন না।

ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য বা 'সুহবত' এমন একটি মর্যাদা, যার সমকক্ষ আর কোন মর্যাদা মুসলমানদের জন্য নেই। সুহবতের মর্যাদা ছাড়াও দ্বীনের ভিত্তিকে শক্তিশালী ও মজবুত করা, ইসলামের তাবলীগ ও শরীয়াতের খিদমতের ক্ষেত্রে কঠোর শ্রমদান ও আত্মত্যাগের কারণে প্রতিটি মুসলমানের কাছে সাহাবায়ে কিরামের একটি পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদা আছে। এ কারণে কোন কোন আলিমের মতে সাহাবীদেরকে হেয় প্রতিপন্নকারী ব্যক্তি 'যিন্‌দীক'। আবার কারো মতে, এটা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সাহাবীদের মর্যাদা

সাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা হিসেবে স্তরভেদ থাকতে পারে, কিন্তু পরবর্তী যুগের কোন মুসলমানই, তা তিনি যত বড় জ্ঞানী, গুণী ও সাধক হোন না কেন কেউই একজন সাধারণ সাহাবীর মর্যাদাও লাভ করতে পারেন না। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ্ এবং ইজমা একমত।

এই সাহাবীরাই আল্লাহর রাসূল (সা) ও তাঁর উম্মাতের মধ্যে প্রথম মধ্যসূত্র। পরবর্তী উম্মাত আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআন, কুরআনের ব্যাখ্যা, আল্লাহর রাসূলের পরিচয়, তাঁর শিক্ষা, আদর্শ, মোটকথা দ্বীনের সবকিছুই একমাত্র তাঁদেরই সূত্রে, তাঁদেরই মাধ্যমে জানতে পেরেছে। সুতরাং এই প্রথম সূত্র উপেক্ষা করলে, বাদ দিলে অথবা তাঁদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হলে দ্বীনের মূল ভিত্তিই ধসে পড়ে। কুরআন ও হাদীসের প্রতি অবিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে।

'হাফেজ ইবন আবদিল বার' সাহাবীদের মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবত ও তাঁর সুন্নাতের হিফাজত ও ইশায়াতের দুর্লভ মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলা এইসব মহান ব্যক্তির ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। এ কারণেই তাঁরা 'খায়রুল কুরুন' ও 'খায়রু উম্মাতিন' এর মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

হাফেজ আবু বকর ইবন খতীব আল-বাগদাদী বলেন ঃ "উল্লেখিত ভাব ও বিষয়ের হাদীস ও আখবারের সংখ্যা অনেক এবং সবই 'নাসসুল কুরআনের' ভাবের সাথে সংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ তাতে সাহাবীদের সুমহান মর্যাদা, আদালাত, পবিত্রতা ইত্যাদি ভাব ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক তাদের আদালাতের ঘোষণা দানের পর পৃথিবীর

আর কোন মানুষের সনদের মুখাপেক্ষী তাঁরা নন। আল্লাহ ও রাসূল (রা) তাঁদের সম্পর্কে কোন ঘোষণা না দিলেও তাঁদের হিজরাত, জিহাদ, সাহায্য, আল্লাহর রাহে ধন-সম্পদ ব্যয়, পিতা ও সন্তানদের হত্যা, দ্বীনের ব্যাপারে উপদেশ, ঈমান ও ইয়াকীনের দৃঢ়তা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড এ কথা প্রমাণ করতো যে, আদালাত, বিশ্বাস, পবিত্রতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ন্যায় পরায়ণ ও পবিত্র ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁরা ছিলেন সকলের থেকে উত্তম।"

কোন কোন সাহাবীর জীবদ্দশায় রাসূল (সা) তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তবে মুসলিম পণ্ডিতদের অনেকে সাহাবীদের সকলেই জান্নাতী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবন হাজার *'আল-ইসাবা'* গ্রন্থে স্পেনের ইমাম ইবন হাযামের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ 'আস-সাহাবাতু কুল্লুহুম মিন আহলিল জান্নাতী কাতআন— সাহাবীদের সকলেই নিশ্চিতভাবে জান্নাতী।'

রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদের গালি দেওয়া বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সমালোচনা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "আল্লাহ, আল্লাহ! আমার পরে তোমরা তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করো না। তাদেরকে যারা ভালোবাসে, আমার মুহাব্বতের খাতিরেই তারা ভালোবাসে, আর যারা তাদেরকে হিংসা করে, আমার প্রতি হিংসার কারণেই তারা তা করে।"

সাহাবী চিনবার উপায়

প্রশ্ন হতে পারে, কে সাহাবী এবং কে সাহাবী নয়, তা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে? 'রিজাল ও হাদীস' শাস্ত্র বিশারদগণ এ ব্যাপারে কতিপয় মূলনীতির অনুসরণ করেছেন। প্রথমতঃ 'খবরে তাওয়াতুর' অর্থাৎ একজন মানুষ সম্পর্কে যখন প্রতিটি যুগের অসংখ্য মানুষ বর্ণনা বা সাক্ষ্য দেবে যে তিনি সাহাবী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ 'খবরে মাশহুর' অর্থাৎ প্রতিটি যুগের প্রচুর সংখ্যক মানুষ সাক্ষ্য দিবে যে, অমুক সাহাবী। তৃতীয়তঃ কোন একজন সাহাবীর বর্ণনা বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। চতুর্থতঃ কোন একজন প্রখ্যাত তাবেঈর বর্ণনা বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। পঞ্চমতঃ কেউ নিজেই যদি দাবী করেন, আমি সাহাবী। সে ক্ষেত্রে দু'টি বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে আছে কিনা তা দেখতে হবে। (১) 'আদালাত' বা ন্যায়নিষ্ঠতা। এটি সাহাবীদের বিশেষ গুণ। সাহাবিয়্যাতের দাবীদার ব্যক্তির মধ্যে এ গুণটি অবশ্যই থাকতে হবে। (২) 'মুয়াসিরাত' বা সমসাময়িকতা। সাহাবীদের যুগ শেষ হয়েছে হিজরী ১১০ সনে। কারণ, রাসূল (সা) তাঁর ইনতিকালের একমাস পূর্বে বলেছিলেন, আজ এ পৃথিবীতে যারা জীবিত আছে, আজ থেকে একশ' বছর পর তারা কেউ জীবিত থাকবে না। সুতরাং হিজরী ১১০ সনের পর কেউ জীবিত থাকলে এবং সে সাহাবী বলে দাবী করলে, 'রিজাল' শাস্ত্র বিশারদরা তাকে সাহাবী বলে মেনে নেননি। অনেকে এমন দাবী করেছিলেন; কিন্তু সে দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। তাদের জীবনীও 'রিজাল' শাস্ত্রে লিখিত আছে। এ ছাড়াও সাহাবী নির্ধারণের আরো কিছু নিয়ম নীতি মুহাদ্দিসগণ অনুসরণ করেছেন।

সাহাবীদের সংখ্যা

সাহাবীদের সংখ্যা যে কত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। ইমাম আবু যারআ আর-রাযী বলেছেন, রাসূল (সা) যখন ইনতিকাল করেন, তখন যারা তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর কথা শুনেছেন এমন লোকের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলে এক লাখেরও ওপরে। তাঁদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাহলে যে সকল সাহাবী কোন হাদীস বর্ণনা করেননি তাঁদের সংখ্যা যে কত বিপুল তা সহজেই অনুমেয়। আবু যারআর একথার সমর্থন পাওয়া যায় বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত কা'ব ইবন মালিকের একটি বক্তব্য দ্বারা। তিনি তাবুক অভিযান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "মানুষের সংখ্যা অনেক। কোন দফতর বা দিওয়ান তা গণনা করতে পারবে না।"

সাহাবীদের যথাযথ হিসেব কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের শেষ দিকে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর হাতে বাইয়াত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, হিজরী দশম সনে মক্কা এবং তায়েফে একজনও অমুসলিম ছিল না। সকলে ইসলাম গ্রহণ করে বিদায় হজ্জে অংশ গ্রহণ করে। এমনিভাবে আরবের বহু গোত্র সম্পূর্ণরূপে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের অধিকাংশ ছিল মরুবাসী। তাদের হিসেব সংরক্ষণ করা কোনভাবেই সম্ভব ছিলনা। তাছাড়া হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে ভণ্ড নবী ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে অসংখ্য সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের অনেকের পরিচয় ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে সাহাবীদের মর্যাদা ও ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াতের অর্থ উদ্ধৃত হলো ঃ

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ, কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইন্‌জীলেও।" (সূরা আল-ফাতহ্ ঃ ২৯)

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটা মহা কামিয়াবী।" (সূরা আত-তওবা ঃ ১০০)

"এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে (মদীনা) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।" (সূরা আল-হাশর ঃ ৮-৯) এ আয়াতে প্রথমে মুহাজির ও পরে আনসারদের প্রশংসা করা হয়েছে।

এমনিভাবে সূরা আল-ফাত্হ-১৮, সূরা আল-ওয়াকিয়া-১০, এবং সূরা আল-আনফালের ৬৪ নাম্বার আয়াতসহ বিভিন্ন আয়াতে কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও পরোক্ষভাবে সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা এসেছে।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও তাঁর সাহাবীদের শানে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ করে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

"আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা, তারপর তার পরের যুগের লোকেরা। তারপর এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে যাদের কসম হবে তাদের সাক্ষ্যের অগ্রগামী। তাদের কাছে সাক্ষী চাওয়ার আগেই তারা সাক্ষ্য দেবে।"

"তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দেবেনা, কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও ব্যয় করো তবুও তাদের যে কোন একজনের 'মুদ' বা তার অর্ধেক পরিমাণ যবের সমতুল্য হবে না।"

রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ "তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তার ওপর আমল করতে হবে। তা তরক করা সম্পর্কে তোমাদের কারো কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি আল্লাহর কিতাবে কোন সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায় তাহলে আমার সুন্নাতে খোঁজ করতে থাক। যদি তাতেও না পাওয়া যায় তাহলে আমার সাহাবীদের কথায় তালাশ করতে হবে। আমার সাহাবীরা আকাশের তারকা সদৃশ। তার কোন একটিকে তোমরা গ্রহণ করলে সঠিক পথ পাবে। আর আমার সাহাবীদের পারস্পরিক ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ।"

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

"আমার পরে আমার সাহাবীদের পারস্পরিক মতপার্থক্য সম্পর্কে আমার 'রব'—প্রভুকে জিজ্ঞেস করলাম। আল্লাহ্ আমার কাছে ওহী পাঠালেন ঃ হে মুহাম্মাদ, তোমার সাহাবীরা আমার কাছে আকাশের তারকা সদৃশ। তারকার মত তারাও একটি থেকে অন্যটি উজ্জ্বলতর। তাদের বিতর্কিত বিষয়ের কোন একটিকে যে আঁকড়ে থাকবে, আমার কাছে সে হবে হিদায়াতের ওপরে।"

ইমাম শাফেঈ হযরত আনাস ইবন মালিকের সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সাহাবীদেরকে মনোনীত করেছেন। তাদের সাথে আমার বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে আমার আনসার বানিয়ে দিয়েছেন। শেষ যামানায় এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে যারা তাদের অবমাননা করবে। সাবধান, তোমরা তাদের ছেলে-মেয়ে বিয়ে করবে না তাদের কাছে ছেলে-মেয়ে বিয়েও দেবে না। সাবধান, তাদের সাথে নামায পড়বে না, তাদের জানাযাও পড়বে না। তাদের ওপর আল্লাহ্ লা'নত।

মিশকাত শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন। আমার উম্মাতের মধ্যে একটি ফিরকাই নিশ্চিত জান্নাতী হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কে? বললেন ঃ যারা আমার ও আমার সাহাবীদের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

অন্য একটি হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'আমার উম্মাতের মধ্যে সাহাবীদের স্থান তেমন, যেমন খাবারের মধ্যে লবণের স্থান।'

সাহাবীদের সমাজ ছিল একটি আদর্শ মানব সমাজ। তাঁদের কর্মকাণ্ড মানব জাতির জন্য একটি উৎকৃষ্টতম নমুনা স্বরূপ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের সততা, বিশ্বস্ততা, ভদ্রতা, আত্মত্যাগ ও সদাচরণ তুলনাবিহীন। তাঁরা ছিলেন একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশীল। গরীব ও মুহতাজ শ্রেণীর প্রয়োজন ও চাহিদাকে তাঁরা সবসময় অগ্রাধিকার দিতেন। বীরত্ব ও সাহসিকতায় তাঁরা ছিলেন নজীরবিহীন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইত্তেবা বা অনুসরণ ছিল তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য। তাঁদের জীবন-মরণ উভয়ই ছিল ইসলামের জন্য।

হযরত রাসূলে করীম (সা) যে সর্বোত্তম সমাজের ভিত্তি রেখেছিলেন, সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন সেই সমাজের প্রথম নমুনা। রাসূলে পাকের (সা) সুহবতের বরকতে তাঁরা মহান মানবতার বাস্তব রূপ ধারণ করেছিলেন। 'আদল, তাকওয়া, দিয়ানাত, ইহসান এবং খাওফে খোদার তাঁরা ছিলেন সমুজ্জ্বল প্রতীক। তাঁদের মধ্যে এই অনুভূতি সদা জাগ্রত ছিল যে, এই পৃথিবীতে তাঁদের আগমন ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত করা ও মানব জাতির মধ্যে সমতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। এখানে তাঁদেরকে খিলাফতে ইলাহিয়ার আমীন বা বিশ্বাসী রূপে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে।

পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা তাঁদের মধ্যে এমন পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও ন্যায়ের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে, হক ও ইনসাফের ব্যাপারে তাঁরা যেমন নিজেদেরকে দায়িত্বশীল মনে করতেন, তেমন মনে করতেন অন্যদেরকেও। তাঁরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সন্তান ও আত্মীয়-বন্ধুদের শরয়ী বিধানের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারেননি, বাঁচাতে চেষ্টাও করেননি।

মোটকথা ঈমান ও বিশ্বাস তাদের সামগ্রিক যোগ্যতাকে আলোকিত করে দিয়েছিল। তাঁরা খুব অল্প সময়ে বিশ্বের সর্বাধিক অংশ প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁদের সামরিক ও সাংগঠনিক যোগ্যতার ভুরিভুরি নজীর ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান।

সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ সমাজের অনুরূপ সমাজ যদি আজ আমরা গড়তে চাই, আমাদের অবশ্যই তাঁদের সম্পর্কে জানতে হবে। তাঁদের মত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কুরআনী সমাজ গড়ার যে চেতনা দেখা যাচ্ছে, তাকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে হলে সাহাবীদের জীবনীর ব্যাপক চর্চা হওয়া দরকার। তাঁদের জীবন থেকেই দিক নির্দেশনা নিতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে সাহাবীদের জীবনের চর্চা খুব কম। এখানে পীর-আওলিয়ার জীবনের কাল্পনিক কিস্সা-কাহিনী যে পরিমাণে আলোচিত হয় তার কিয়দংশও সাহাবীদের জীবনীর আলোচনা হয়না।

আরবী-উর্দুসহ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় সাহাবীদের জীবনীর ওপর বহু বড় বড় গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইসলামী সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় এক্ষেত্রেও বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য তেমন কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। মাসিক 'পৃথিবী'-র নির্বাহী সম্পাদক ও বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক নাজির আহমদ তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে সাহাবীদের জীবনের কিছু কথা পাঠকদের কাছে তুলে ধরার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মূলতঃ তাঁরই উৎসাহে আমি ধারাবাহিকভাবে 'পৃথিবী'র পাতায় লিখতে থাকি। 'পৃথিবী'র পাতার লেখাগুলিই 'আসহাবে রাসূলের জীবনকথা' নামে বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে লেখা ও বই আকারে প্রকাশের ব্যাপারে অধ্যাপক নাজির আহমদের উৎসাহ ও ভূমিকা না থাকলে হয়তো আমি কখনো লিখতাম না এবং বই আকারে প্রকাশও হতো না। তাই দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

'আসহাবে রাসূলের জীবনকথা'র প্রথম খণ্ডে মোট তিরিশজন সাহাবীর জীবনের আলোচনা এসেছে। তাঁরা সকলেই মুহাজিরীন তাবকার অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের মধ্যে 'আশারা মুবাশ্‌শারা'র সেই গৌরবান্বিত দশ জন সাহাবীও সন্নিবেশিত হয়েছেন। লেখাগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্যসমূহ আরবী-উর্দুর মূল সূত্রসমূহ থেকে গৃহীত হয়েছে। বিতর্কিত বিষয় যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি।

পরিশেষে, পাঠকবৃন্দ এই লেখা থেকে বিন্দুমাত্র উপকৃত হলে আমার কষ্ট সার্থক বলে মনে করবো। কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা আমার গোচরে আনার জন্য পাঠকদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রকাশনার সাথে জড়িত ভাই কামরুল ইসলাম সহ সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ পাক আমার এ সামান্য শ্রমটুকু কবুল করুন। আমীন।

২৭-২-১৯৮৯ ইং

মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা

খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রা)

নাম তাঁর খাদীজা। কুনিয়াত 'উম্মু হিন্দ' এবং লকব 'তাহিরা'। পিতা খুওয়াইলিদ, মাতা ফাতিমা বিনতু যায়িদ। জন্ম 'আমুল ফীল' বা হস্তীবর্ষের পনের বছর আগে মক্কা নগরীতে। পিতৃ-বংশের উর্ধ পুরুষ কুসাঈ-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। জাহিলী যুগেই পূতপবিত্র চরিত্রের জন্য 'তাহিরা' উপাধি লাভ করেন। (আল-ইসাবা) রাসূলুল্লাহ (সা) ও খাদীজার (রা) মধ্যে ফুফু-ভাতিজার দূর সম্পর্ক ছিল। এ কারণে, নবুওয়াত লাভের পর খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফিলের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' সম্ভবতঃ বংশগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই তিনি একথা বলেছিলেন।

পিতা খুওয়াইলিদ তৎকালীন আরব সমাজের বিশিষ্ট তাওরাত ও ইনজীল বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবন নাওফিলকে খাদীজার বর নির্বাচন করেছিলেন, কিন্তু কেন যে তা বাস্তবে রূপ লাভ করেনি সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নীরব। শেষ পর্যন্ত আবু হালা ইবন যারারাহ আত-তামীমীর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। জাহিলী যুগেই তাঁর মৃত্যু হয়। আবু হালার মৃত্যুর পর 'আতীক বিন আবিদ আল-মাখযুমীর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। (শারহুল মাওয়াহিব, আল-ইসতিয়াব) তবে কাতাদার সূত্রে জানা যায়, তাঁর প্রথম স্বামী 'আতীক, অতঃপর আবু হালা। ইবন ইসহাকও এ মত সমর্থন করেছেন বলে ইউনুস ইবন বুকাইর বর্ণনা করেছেন। (আল-ইসাবা ঃ ৪/২৮১) তবে প্রথমোক্ত মতটি ইবন আবদিল বার সহ অধিকাংশের মত বলে ইবন হাজার উল্লেখ করেছেন।

খাদীজার পিতা খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ ছিলেন ফিজার যুদ্ধে নিজ গোত্রের কমাণ্ডার। তিনি ছিলেন বহু সন্তানের জনক। প্রথম পুত্র হিযাম। এই হিযামের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী হাকীম জাহিলী যুগে মক্কার 'দারুন নাদওয়ার' পরিচালনভার লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় সন্তান হযরত খাদীজা। তৃতীয় সন্তান 'আওয়াম' প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যুবাইরের (রা) পিতা। রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু এবং হযরত হামযার আপন বোন হযরত সাফিয়্যা (রা) ছিলেন 'আওয়ামের' স্ত্রী বা যুবাইরের (রা) মা। সাফিয়্যা ছিলেন খাদীজার ছোট ভাইয়ের বউ। চতুর্থ সন্তান হালা। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে হযরত যয়নাবের (রা) স্বামী আবুল আস ইবন রাবী'র মা। আবুল আ'স রাসূলুল্লাহর (সা) বড় জামাই। পঞ্চম সন্তান রুকাইয়া। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে হিযাম, আওয়াম এবং রুকাইয়া ইসলামের আবির্ভাবের আগেই মারা যান। হযরত খাদীজা ও হালা ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

খাদীজার পিতার মৃত্যু কখন হয়েছিল, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, 'ফিজার' যুদ্ধে মারা যান। ইমাম সুহাইলীর মতে ফিজার যুদ্ধের আগেই মারা যান। তখন খাদীজার বয়স পঁয়ত্রিশ। কারো কারো মতে রাসূলুল্লাহর (সা) বিয়ের পর তিনি মারা যান। (হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫২)

পিতা বা স্বামীর মৃত্যু বা যে কোন কারণেই হোক কুরাইশ বংশের অনেকের মত খাদীজাও ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। ইবন সা'দ তাঁর ব্যবসায় সম্পর্কে বলছেন ঃ 'খাদীজা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও সম্পদশালী ব্যবসায়ী মহিলা। তাঁর বাণিজ্য সম্ভার সিরিয়া যেত এবং তাঁর একার পণ্য কুরাইশদের সকলের পণ্যের সমান হতো।' ইবন সা'দের এ মন্তব্য দ্বারা খাদীজার ব্যবসায়ের পরিধি উপলব্ধি করা যায়। অংশীদারী বা মজুরী বিনিময়ে যোগ্য লোক নিয়োগ করে তিনি দেশ বিদেশে মাল কেনাবেচা করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) তখন পঁচিশ বছরের যুবক। এর মধ্যে চাচা আবু তালিবের সাথে বা একাকী কয়েকটি বাণিজ্য সফরে গিয়ে ব্যবসায় সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলেছেন। ব্যবসায়ে তাঁর সততা ও আমানতদারীর কথাও মক্কার মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সবার কাছে তিনি তখন আল-আমীন। তাঁর সুনামের কথা খাদীজার কানেও পৌঁছেছে। বিশেষতঃ তাঁর ছোট ভাই-বউ সাফিয়্যার কাছে আল-আমীন মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে বহু কথাই শুনে থাকবেন।

হযরত খাদীজা একবার কেনাবেচার জন্য সিরিয়ায় পণ্য পাঠাবার চিন্তা করলেন। যোগ্য লোকের সন্ধান করছেন। এ প্রসঙ্গে ওয়াকিদী থেকে যারকানীর বর্ণনা ঃ 'আবু তালিব মুহাম্মাদকে (সা) ডেকে বললেন ঃ ভাতিজা! আমি একজন দরিদ্র মানুষ, সময়টাও খুব সঙ্কটজনক। মারাত্মক দুর্ভিক্ষের কবলে আমরা নিপতিত। আমাদের কোন ব্যবসায় বা অন্য কোন উপায়-উপকরণ নেই। তোমার গোত্রের একটি বাণিজ্য কাফিলা সিরিয়া যাচ্ছে। খাদীজা তাঁর পণ্যের সাথে পাঠানোর জন্য কিছু লোকের খোঁজ করছে। তুমি যদি তার কাছে যেতে, হয়তো তোমাকেই সে নির্বাচন করতো। তোমার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা তার জানা আছে। যদিও তোমার সিরিয়া যাওয়া আমি পছন্দ করিনে এবং ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে তোমার জীবনের আশঙ্কা করি, তবুও এমনটি না করে উপায় নেই।' জবাবে রাসূল (সা) বললেন, সম্ভবতঃ সে নিজেই লোক পাঠাবে। আবু তালিব বললেন ঃ হয়তো অন্য কাউকে সে নিয়োগ করে ফেলবে। চাচা-ভাতিজার এ সংলাপের কথা খাদীজার কানে গেল। 'তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট লোক পাঠালেন।' (টীকা, সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৮) উল্লেখ থাকে যে, কৈশোরে একবার রাসূল (সা) চাচার সাথে সিরিয়া গিয়েছিলেন। তখন পাদরী 'বুহাইরা' রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে আবু তালিবকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। উপরোক্ত বর্ণনায় আবু তালিব সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

খাদীজা লোক মারফত মুহাম্মাদের (সা) কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, তিনি যদি ব্যবসায়ের দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া যান, অন্যদের তুলনায় খাদীজা তাঁকে দ্বিগুণ মুনাফা দেবেন। মুহাম্মাদ (সা) রাজী হলেন।

খাদীজার (রা) পণ্য-সামগ্রী নিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত দাস মায়সারাকে সঙ্গে করে মুহাম্মাদ (সা) চললেন সিরিয়া। পথে এক গীর্জার পাশে একটি গাছের ছায়ায় বসে আছেন তিনি। গীর্জার পাদ্রী এগিয়ে গেলেন মায়সারার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'গাছের নিচে বিশ্রামরত লোকটি কে?' মায়সারা বললেন ঃ 'মক্কার হারামবাসী কুরাইশ গোত্রের একটি

লোক।' পাদ্রী বললেন ঃ 'এখন এই গাছের নীচে যিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি একজন নবী ছাড়া আর কেউ নন।' ঐতিহাসিকরা এই পাদ্রীর নাম 'নাসতুরা' বলে উল্লেখ করেছেন। (টীকা, সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৮) তবে ইবন হাজার 'আসকালানী এই পাদ্রীর নাম 'বুহাইরা' বলেছেন। (আল্-ইসাবা ঃ ৪/২৮১) তিনি আরো বলেছেন, এই বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে রাসূল (সা) বসরার বাজারে গিয়েছিলেন। তাবারী ইবন শিহাব যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজার পণ্য নিয়ে সিরিয়া নয়, বরং ইয়ামনের এক হাবশী বাজারে গিয়েছিলেন। তবে সিরিয়া যাওয়ার বর্ণনাটাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। (তারীখুল উম্মাহ আল ইসলামিয়া, মুহাম্মদ আল-খিদরী বেক ঃ ১/৬৪)

রাসূলুল্লাহ (সা) সিরিয়ার বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রী করলেন এবং যা কেনার তা কিনলেন। তারপর মায়সারাকে সঙ্গে করে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। পথে মায়সারা লক্ষ্য করলেন, রাসূল (সা) তাঁর উটের ওপর সওয়ার হয়ে চলেছেন, আর দু'জন ফিরিশতা দুপুরের প্রচণ্ড রোদে তাঁর ওপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। এভাবে মক্কায় ফিরে খাদীজার পণ্য-সামগ্রী বিক্রী করলেন। ব্যবসায়ে এবার দ্বিগুণ অথবা দ্বিগুণের কাছাকাছি মুনাফা হলো। বাড়ী ফিরে বিশ্বস্ত ভৃত্য মায়সারা তাঁর মনিব খাদীজার নিকট পাদ্রীর মন্তব্য এবং সফরের অলৌকিক ঘটনাবলী সবিস্তার বর্ণনা করলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৯)

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন এক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতি ভদ্র মহিলা। তাঁর ধন-সম্পদ, ভদ্রতা ও লৌকিকতায় মক্কার সর্বস্তরের মানুষ মুগ্ধ ছিল। অনেক অভিজাত কুরাইশ যুবকই তাঁকে সহধর্মিনী হিসেবে লাভ করার প্রত্যাশী ছিল। তিনি তাদের সকলকে প্রত্যাখ্যান করেন। মায়সারার মুখে সবকিছু শুনে খাদীজা নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠান। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৯)

বিয়ের প্রস্তাব কিভাবে এবং কেমন করে হয়েছিল সে সম্পর্কে নানা রকম বর্ণনা রয়েছে। তবে খাদীজাই যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রস্তাবটি পেশ করেন সে ব্যাপারে সব বর্ণনা একমত।

একটি বর্ণনায় এসেছে, খাদীজা (রা) নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কথা বলেন এবং তাঁর পিতার নিকট প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে, দারিদ্রের কারণে হয়তো খাদীজার পিতা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবেন। অবশেষে খাদীজার পিতা যখন অতিরিক্ত মদপান করে মাতাল অবস্থায় ছিলেন তখন খাদীজা নিজেই বিষয়টি তাঁর কাছে উত্থাপন করেন এবং সম্মতি আদায় করেন। কিন্তু সুস্থ হয়ে আবার তিনি বেঁকে বসেন। তবে খাদীজা পুনরায় তাঁর সম্মতি আদায় করেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫২) অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইয়ালার স্ত্রী ও খাদীজার বান্ধবী 'নাফীসা বিনতু মানিয়্যা' এ ব্যাপারে পুরো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম খাদীজার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এভাবে প্রস্তাব পেশ করেন ঃ 'আপনাকে যদি ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য ও জীবিকার নিশ্চয়তার দিকে আহ্বান জানানো হয়, আপনি কি গ্রহণ করবেন ?.... এ কথাগুলি ছিল হযরত খাদীজা সম্পর্কে।

কথা পাকাপাকি হয়ে গেল। নির্ধারিত তারিখে আবু তালিব, হামযাসহ রাসূলুল্লাহর (সা) খান্দানের আরো কিছু ব্যক্তি খাদীজার বাড়ী উপস্থিত হলেন। খাদীজাও তাঁর খান্দানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। সকলের উপস্থিতিতে আবু তালিব বিয়ের খুতবা পাঠ করলেন। সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক দিয়ে এ খুতবা জাহিলী যুগের আরবী-গদ্য সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পাঁচশ' স্বর্ণমুদ্রা মোহর ধার্য্য হয়। খাদীজা নিজেই উভয় পক্ষের যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন। তিনি দুই উকিয়া সোনা ও রুপো রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান এবং তা দিয়ে উভয়ের পোশাক ও ওয়ালীমার বন্দোবস্ত করতে বলেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫২) এভাবে হযরত খাদীজা হলেন 'উম্মুল মুমিনীন'। এটা নবুয়াত প্রকাশের পনের বছর পূর্বের ঘটনা। সে সময় তাঁদের উভয়ের বয়স সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য থাকলেও সর্বাধিক সঠিক মতানুযায়ী রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স ছিল পঁচিশ এবং খাদীজার চল্লিশ।

বিয়ের পনের বছর পর হযরত নবী করীম (সা) নবুওয়াত লাভ করেন। তিনি খাদীজাকে (রা) সর্বপ্রথম এ বিষয়ে অবহিত করেন। পূর্ব থেকেই খাদীজা রাসূলুল্লাহর (সা) নবী হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। সহীহ বুখারীর 'ওহীর সূচনা' অধ্যায়ে একটি হাদীসে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি প্রথম ওহীর সূচনা হয় ঘুমে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। স্বপ্নে যা কিছু দেখতেন তা সকাল বেলার সূর্যের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর নির্জনে থাকতে ভালোবাসতেন। খানাপিনা সঙ্গে নিয়ে হিরা গুহায় চলে যেতেন। সেখানে একাধারে কয়েকদিন ইবাদতে মশগুল থাকতেন। খাবার শেষ হয়ে গেলে আবার খাদীজার কাছে ফিরে আসতেন। খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আবার গুহায় ফিরে যেতেন। এ অবস্থায় একদিন তাঁর কাছে সত্যের আগমন হলো। ফিরিশতা এসে তাঁকে বললেন ঃ আপনি পড়ুন। তিনি বললেন ঃ 'আমি তো পড়া-লেখার লোক নই।' ফিরিশতা তাঁকে এমন জোরে চেপে ধরলেন যে তিনি কষ্ট অনুভব করলেন। ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন ঃ 'পড়ুন'। তিনি আবারো বললেন ঃ 'আমি পড়া-লেখার লোক নই'। ফিরিশতা দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও তাঁর সাথে প্রথমবারের মত আচরণ করলেন। অবশেষে বললেন ঃ 'পড়ুন' আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে.....' রাসূল (সা) ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরলেন। খাদীজাকে ডেকে বললেন ঃ 'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।' তিনি ঢেকে দিলেন। তাঁর ভয় দূর হয়ে গেল। তিনি খাদীজার নিকট পুরো ঘটনা খুলে বললেন এবং নিজের জীবনের আশংকার কথা ব্যক্ত করলেন। খাদীজা বললেন ঃ না, তা কক্ষণো হতে পারে না। আল্লাহর কসম, তিনি আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ়কারী, গরীব-দুঃখীর সাহায্যকারী, অতিথিপরায়ণ ও মানুষের বিপদে সাহায্যকারী।'

অতঃপর খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) সংগে করে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফিলের নিকট নিয়ে যান। সেই জাহিলী যুগে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হিব্রু ভাষায় ইনজীল কিতাব লিখতেন। তিনি বৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন। খাদীজা (রা) বললেন ঃ 'শুনুন তো আপনার ভাতিজা কি বলে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ভাতিজা তোমার

বিষয়টি কি?’ রাসূলুল্লাহ (সা) পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। শুনে ওয়ারাকা বললেন ঃ ‘এতো সেই ‘নামূস’– আল্লাহ যাঁকে মুসার (আ) নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসুস! সে দিন যদি আমি জীবিত ও সুস্থ থাকতাম, যেদিন তোমার দেশবাসী তোমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে।’ রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘এরা আমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো, যখনই কোন ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে, সারা দুনিয়া তাঁর বিরোধী হয়ে গেছে। যদি সে সময় পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি, তোমাকে সব ধরনের সাহায্য করবো। (বুখারী, ১ম খণ্ড) এ ঘটনার অল্প কিছুদিনের মধ্যে ওয়ারাকার মৃত্যু হয়।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খাদীজা তাঁর সকল ধন-সম্পদ তাবলীগে দ্বীনের লক্ষ্যে ওয়াকফ করেন। রাসূল (সা) ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে আল্লাহর ইবাদাত এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সংসারের সকল আয় বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে বাড়তে থাকে খাদীজার দুশ্চিন্তা। তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সব প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলা করেন। আল-ইসতিয়াব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, ‘মুশরিকদের প্রত্যাখান ও অবিশ্বাসের কারণে রাসূল (সা) যে ব্যথা অনুভব করতেন, খাদীজার কাছে এলে তা দূর হয়ে যেত। কারণ, তিনি রাসূলকে (সা) সান্ত্বনা দিতেন, সাহস ও উৎসাহ যোগাতেন। তাঁর সব কথাই তিনি বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতেন। মুশরিকদের সকল অমার্জিত আচরণ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে অত্যন্ত হালকা ও তুচ্ছভাবে তুলে ধরতেন।’ (তাবাকাত-৩/৭৪০)

নবুওয়াতের সপ্তম বছর মুহাররম মাসে কুরাইশরা মুসলমানদের বয়কট করে। তাঁরা ‘শিয়াবে আবু তালিবে’ আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে খাদীজাও সেখানে অন্তরীণ হন। প্রায় তিনটি বছর বনী হাশিম দারুণ দুর্ভিক্ষের মাঝে অতিবাহিত করে। গাছের পাতা ছাড়া জীবন ধারণের আর কোন ব্যবস্থা তাদের ছিল না। স্বামীর সাথে খাদীজাও হাসি মুখে সে কষ্ট সহ্য করেন। এমন দুর্দিনে হযরত খাদীজা (রা) নিজের প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন উপায়ে কিছু খাদ্য খাবারের ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করতেন। তাঁর তিন ভাতিজা– হাকীম ইবন হিযাম, আবুল বুখতারী ও যুময়া ইবনুল আসওয়াদ— তাঁরা সকলে ছিলেন কুরাইশ নেতৃবর্গের অন্যতম। অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ভিন্নভাবে মুসলমানদের কাছে খাদ্যশস্য পাঠানোর ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। একদিন হাকীম ইবন হিযাম তাঁর চাকরের মাধ্যমে ফুফু খাদীজার (রা) কাছে কিছু গম পাঠাচ্ছিলেন। পথে আবু জাহল বাধা দেয়। হঠাৎ আবুল বুখতারী সেখানে উপস্থিত হন। তিনি আবু জাহলকে বললেন, এক ব্যক্তি তাঁর ফুফুকে সামান্য খাদ্য পাঠাচ্ছে, তুমি তা বাধা দিচ্ছ? (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৯২)

নামায ফরয হওয়ার হুকুম নাযিল হয়নি, হযরত খাদীজা (রা) ঘরের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সেই প্রথম থেকেই নামায আদায় করতেন। (তাবাকাত-৮/১০) ইবন ইসহাক উল্লেখ করেছেন, একদিন আলী (রা) দেখতে পেলেন, তাঁরা দু’জন অর্থাৎ নবী (সা) ও খাদীজা (রা) নামায আদায় করছেন। আলী (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ মুহাম্মাদ, এ

কি? রাসূল (সা) তখন নতুন দ্বীনের দাওয়াত আলীর কাছে পেশ করলেন এবং একথা কাউকে বলতে নিষেধ করলেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/৭০) এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, উম্মাতে মুহাম্মাদীর (সা) মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নামায আদায়ের গৌরব অর্জন করেন।

আফীফ আল-কিন্দী নামক এক ব্যক্তি কিছু কেনাকাটার জন্য মক্কায় এসেছিলেন। হযরত আব্বাসের (রা) বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন তিনি। একদিন সকালে লক্ষ্য করলেন, এক যুবক কাবার কাছে এসে আসমানের দিকে তাকালো। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালো। একজন কিশোর এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এলো এক মহিলা। সেও তাদের দু'জনের পেছনে দাঁড়ালো। তারা নামায শেষ করে চলে গেল। দৃশ্যটি আফীফ কিন্দী দেখলেন। আব্বাসকে তিনি বললেন ঃ 'বড় রকমের একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।' আব্বাস বললেন ঃ 'হ্যাঁ' তিনি আরো বললেন ঃ 'এ নওজোয়ান আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ।' কিশোরটি আমার আরেক ভাতিজা আলী এবং মহিলাটি মুহাম্মাদের স্ত্রী।.... আমার জানামতে দুনিয়ায় তারা তিনজনই মাত্র এই নতুন ধর্মের অনুসারী।' (তাবাকাত ঃ ৮/১০-১১)

ইবনুল আসীর বলেন, এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মার ইজমা হয়েছে যে, হযরত খাদীজা রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছর। তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রভাব তাঁর পিতৃকুলের লোকদের ওপরও পড়ে। ইসলামের আবির্ভাবের সময় পিতৃকুল বনু আসাদ ইবন আবদিল উয্যার পনের জন বিখ্যাত ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। তাঁদের দশজনই ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্য পাঁচজন কাফির অবস্থায় বদর যুদ্ধে নিহত হন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে পঁচিশ বছর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করার পর নবুওয়াতের দশম বছরে দশই রামাদান পঁয়ষট্টি বছর বয়সে হযরত খাদীজা মক্কায় ইনতিকাল করেন। জানাযা নামাযের বিধান তখনো প্রচলিত হয়নি। সুতরাং বিনা জানাযায় তাঁকে মক্কার কবরস্তান জান্নাতুল মুয়াল্লায় দাফন করা হয়। হযরত নবী করীম (সা) নিজেই তাঁর লাশ কবরে নামান। (আল-ইসাবা ঃ ৪/২৮৩)

হযরত খাদীজা (রা) ওয়াফাতের অল্পকিছুদিন পর রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ হিতাকাঙ্খী চাচা আবু তালিব মারা যান। অবশ্য আল-ইসতিয়াবের একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, আবু তালিবের মৃত্যুর তিনদিন পর খাদীজা ইনতিকাল করেন। বিপদে-আপদে এ চাচাই রাসূলুল্লাহকে (সা) নানাভাবে সাহায্য করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দুই নিকটআত্মীয়ের ওয়াফাতের কারণে মুসলিম উম্মাহর নিকট এ বছরটি 'আমুল হুযন' বা শোকের বছর নামে অভিহিত হয়েছে।

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন বহু সন্তানের জননী। প্রথম স্বামী আবু হালার ঔরসে হালা ও হিন্দ নামে দু'ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হিন্দ বদর মতান্তরে উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রাঞ্জলভাষী বাগ্মী। উটের যুদ্ধে আলীর (রা) পক্ষে শাহাদাত বরণ করেন। দ্বিতীয় স্বামী 'আতীকের ঔরসে হিন্দা নাম্নী

এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। (শারহুল মাওয়াকিব, আল-ইসতিয়াব, হাশিয়া, সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৭) অবশ্য অন্য একটি বর্ণনা মতে প্রথম পক্ষে তাঁর তিনটি সন্তান জন্মলাভ করেন। দুই ছেলে– হিন্দ ও হারিস। হারিসকে এক কাফির কাবার রুকনে ইয়ামনীর নিকট শহীদ করে ফেলে। এক কন্যা যয়নাব। আর দ্বিতীয় পক্ষের কন্যাটির কুনিয়াত ছিল উম্মু মুহাম্মাদ। (দাখিরা-ই-মা'রিফ-ই-ইসলামিয়া)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পবিত্র ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর ছয় সন্তান। প্রথম সন্তান হযরত কাসিম। অল্প বয়সে মক্কা শরীফে ইনতিকাল করেন। তাঁর নাম অনুসারে রাসূলুল্লাহর (সা) কুনিয়াত হয় আবুল কাসিম। মৃত্যুর পূর্বে তিনি হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটা শিখেছিলেন। দ্বিতীয় সন্তান হযরত যয়নাব। তৃতীয় সন্তান হযরত আবদুল্লাহ। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পর জন্মলাভ করেছিলেন, তাই 'তাইয়্যেব ও তাহির' লকব লাভ করেন। অল্প বয়সে ইনতিকাল করেন। চতুর্থ সন্তান হযরত রুকাইয়া। পঞ্চম সন্তান হযরত উম্মু কুলসুম। ষষ্ঠ সন্তান হযরত ফাতিমা (রা)। উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম ছিলেন হযরত মারিয়ার গর্ভজাত সন্তান।

হযরত খাদীজা (রা) সন্তানদের খুব আদর করতেন। আর্থিক সচ্ছলতাও ছিল। উকবার দাসী সালামাকে মজুরীর বিনিময়ে সন্তানদের দেখাশোনার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন।

হযরত নবী কারীমের (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে হযরত খাদীজার স্থান সর্বোচ্চে। তিনি প্রথম স্ত্রী, চল্লিশ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে হয়। তাঁর জীবদ্দশায় নবী করীম (সা) আর কোন বিয়ে করেননি। হযরত ইবরাহীম ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) সব সন্তানই তার গর্ভে পয়দা হয়েছেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার ফজীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, আরবের সেই ঘোর অন্ধকার দিনে কিভাবে এক মহিলা নিঃসঙ্কোচে রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করছেন। তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ও সংশয় নেই। সেই ওহী নাযিলের প্রথম দিনটি, ওয়ারাকার নিকট গমন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নবী হওয়া সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা– সবকিছুই গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয়। রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের পূর্ব থেকে খাদীজা যেন দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন— তিনি নবী হবেন। তাই জিবরাঈলের আগমনের পর ক্ষণিকের জন্যও তার মনে কোন রকম ইতস্ততঃভাব দেখা দেয়নি। এতে তাঁর গভীর দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবুওয়াত লাভের পূর্বে ও পরে সর্বদাই তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) সম্মান করেছেন, তাঁর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছেন। পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে কোন প্রকার সন্দেহ দানা বাঁধতে পারেনি। সেই জাহিলী যুগেও তিনি ছিলেন পূতঃপবিত্র। কখনো মূর্তিপূজা করেননি। নবী করীম (সা) একদিন তাঁকে বললেন ঃ 'আমি কখনো লাত-উযযার ইবাদত করবো না।' খাদীজা বলেছিলেন ঃ লাত-উয্যার কথা ছেড়ে দিন। তাদের প্রসঙ্গই উত্থাপন করবেন না। (মুসনাদে আহমাদ-৪/২২২)।

নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর (সা) ওপর প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তাঁর সাথে প্রথম সালাত আদায়কারীই শুধু তিনি নন। সেই ঘোর দুর্দিনে ইসলামের জন্য তিনি যে শক্তি যুগিয়েছেন চিরদিন তা অম্লান হয়ে থাকবে। ইসলামের সেই সূচনা লগ্নে প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পরামর্শ দাত্রী। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের পর সমস্ত সম্পদ তিনি স্বামীর হাতে তুলে দেন। যায়িদ বিন হারিসা ছিলেন তাঁর প্রিয় দাস। তাকেও তিনি স্বামীর হাতে তুলে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যায়িদকে বেশী ভালোবাসতেন, তাই তাঁকে খুশী করার জন্য তাকে আযাদ করে দেন।

মক্কার একজন ধনবতী মহিলা হওয়া সত্বেও তিনি নিজ হাতে স্বামীর সেবা করতেন। একবার তিনি বরতনে করে রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য কিছু নিয়ে আসছিলেন। হযরত জিবরীল (আ) রাসূলকে (সা) বললেন,'আপনি তাঁকে আল্লাহ তা'আলা ও আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিন।' (বুখারী)

হযরত রাসূলে করীম (সা) প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজার (রা) স্মৃতি তাঁর মৃত্যুর পরও ভোলেননি। তাঁর মৃত্যুর পর বাড়ীতে যখনই কোন পশু জবেহ হতো, তিনি তালাশ করে তাঁর বান্ধবীদের ঘরে ঘরে গোশত পাঠিয়ে দিতেন। হযরত আয়িশা বলেন ঃ যদিও আমি খাদীজাকে (রা) দেখিনি, তবুও তাঁর প্রতি আমার ইর্ষা হতো। অন্য কারো বেলায় কিন্তু এমনটি হতো না। কারণ, নবী কারীম (সা) সবসময় তাঁর কথা স্মরণ করতেন।' মাঝে মাঝে হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) রাগিয়ে তুলতেন। রাসূল (সা) বলতেন ঃ 'আল্লাহ আমার অন্তরে তাঁর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

হযরত খাদীজার (রা) ওয়াফাতের পর তাঁর বোন হালা একবার রাসূলে কারীমের (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই বলে উঠলেন 'হালা এসেছো'? রাসূলুল্লাহর (সা) মানসপটে তখন খাদীজার স্মৃতি ভেসে উঠেছিল। আয়িশা (রা) বলে ফেললেন, 'আপনি একজন বৃদ্ধার কথা মনে করছেন যিনি মারা গেছেন। আল্লাহ তার চেয়ে অনেক উত্তম স্ত্রী আপনাকে দান করেছেন।' জবাবে নবী কারীম (সা) বললেন ঃ 'কক্ষনো না। মানুষ যখন আমাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, সে তখন আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। সবাই যখন কাফির ছিল, তখন সে মুসলমান। কেউ যখন আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, তখন সে আমাকে সাহায্য করেছে। তাঁর গর্ভেই আমার সন্তান হয়েছে।' আমরা মনে করি হযরত খাদীজার মূল্যায়ন এর চেয়ে আর বেশী কিছু হতে পারে না।

হযরত খাদীজার ফজীলাত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে ঃ ধরাপৃষ্ঠের সর্বোত্তম নারী মরিয়ম বিনতু ইমরান ও খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ। হযরত জিবরাঈল (আ) বসে আছেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে। এমন সময় খাদীজা আসলেন। জিবরাইল (আ) রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন, 'তাঁকে মণি-মুক্তার তৈরী একটি বেহেশতী মহলের সুসংবাদ দিন। (বুখারী)

আবু বকর সিদ্দীক (রা)

আবদুল্লাহ নাম, সিদ্দীক ও আতীক উপাধি, ডাকনাম বা কুনিয়াত আবু বকর। পিতার নাম 'উসমান, কুনিয়াত আবু কুহাফা। মাতার নাম সালমা এবং কুনিয়াত উম্মুল খায়ের। কুরাইশ বংশের উপর দিকে ষষ্ঠ পুরুষ 'মুররা'তে গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহর জন্মের দু'বছরের কিছু বেশী সময় পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং অনুরূপ সময়ের ব্যবধানে তাঁরা উভয়ে ইনতিকাল করেন। তাই মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল রাসূলুল্লাহর (সা) বয়সের সমান।

তিনি ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, পাতলা ছিপছিপে ও প্রশস্ত ললাট বিশিষ্ট। শেষ বয়সে চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। মেহেন্দীর খিজাব লাগাতেন। অত্যন্ত দয়ালু ও সহনশীল ছিলেন।

তিনি ছিলেন সম্মানিত কুরাইশ ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। জ্ঞান, মেধা, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সচ্চরিত্রতার জন্য আপামর মক্কাবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। জাহিলী যুগে মক্কাবাসীদের দিয়াত বা রক্তের ক্ষতিপূরণের সমুদয় অর্থ তাঁর কাছে জমা হতো। আরববাসীর নসব বা বংশ সংক্রান্ত জ্ঞানে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। কাব্য প্রতিভাও ছিল। অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল-ভাষী ছিলেন। বক্তৃতা ও বাগ্মিতায় খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

তিনি ছিলেন তাঁর গোত্রের অত্যন্ত জনপ্রিয়, বন্ধুবৎসল ও অমায়িক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী, দানশীল ও চরিত্রবান। জাহিলী যুগেও কখনো শরাব পান করেননি। তাঁর অমায়িক মেলামেশা, পাণ্ডিত্য ও ব্যবসায়িক দক্ষতার কারণে অনেকেই তাঁর সাথে বন্ধুত্ব ও সখ্যতা স্থাপন করতো। তাঁর বাড়ীতে প্রতিদিন মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়মিত বৈঠক বসতো।

হযরত আবু বকরের পিতা আবু কুহাফা কুরাইশদের মধ্যে যথেষ্ট মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন বয়োঃবৃদ্ধ ও সচ্ছল। তাঁর গৃহ কেবল ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না, সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর মতামত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করা হতো। মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলামের প্রতি তিনি আকৃষ্ট না হলেও পুত্র আবু বকরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন– এমন কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অবশ্য হযরত আলীকে (রা) তিনি দেখলে মাঝে মধ্যে বলতেন ঃ 'এই ছোকরারাই আমার ছেলেটিকে বিগড়ে দিয়েছে।' মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলামের ঘোষণা দেন। হিজরী ১৪ সনে প্রায় এক শ' বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

হযরত আবু বকরের মা উম্মুল খায়ের স্বামীর বহু পূর্বে মক্কায় ইসলামের প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মক্কার 'দারুল আরকামে' ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। স্বামীর মত তিনিও দীর্ঘজীবন লাভ করেন। প্রায় ৯০ বছর বয়সে ছেলেকে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন।

আবু বকর ছিলেন পিতার একমাত্র পুত্র সন্তান। অত্যন্ত আদর যত্ন ও বিলাসিতার মধ্যে পালিত হন। শৈশব থেকে যৌবনের সূচনা পর্যন্ত পিতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বিশ বছর বয়সে পিতার ব্যবসা বাণিজ্যের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন।

শৈশব থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে আবু বকরের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অধিকাংশ বাণিজ্য সফরের সংগী ছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়া যান। তখন তাঁর বয়স প্রায় আঠারো এবং রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স বিশ। তাঁরা যখন সিরিয়া সীমান্তে; বিশ্রামের জন্য রাসূল (সা) একটি গাছের নীচে বসেন। আবু বকর একটু সামনে এগিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। এক খৃষ্টান পাদ্রীর সাথে তাঁর দেখা হয় এবং ধর্ম বিষয়ে কিছু কথাবার্তা হয়। আলাপের মাঝখানে পাদ্রী জিজ্ঞেস করে, ওখানে গাছের নীচে কে? আবু বকর বললেন, এক কুরাইশ যুবক, নাম মুহাম্মাদ বিন আবদিল্লাহ। পাদ্রী বলে উঠলো, এ ব্যক্তি আরবদের নবী হবেন। কথাটি আবু বকরের অন্তরে গেঁথে যায়। তখন থেকেই তাঁর অন্তরে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রকৃত নবী হওয়া সম্পর্কে প্রত্যয় দৃঢ় হতে থাকে। ইতিহাসে এ পাদ্রীর নাম 'বুহাইরা' বা 'নাসতুরা' বলে উল্লেখিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের ঘোষণায় মক্কায় হৈ চৈ পড়ে গেল। মক্কার প্রভাবশালী ধনী নেতৃবৃন্দ তাঁর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে লেগে যায়। কেউবা তাঁকে মাথা খারাপ, কেউবা জীনে ধরা বলতে থাকে। নেতৃবৃন্দের ইংগিতে ও তাদের দেখাদেখি সাধারণ লোকেরাও ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকে। কুরাইশদের ধনবান ও সম্মানী ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র আবু বকর রাসূলুল্লাহকে (সা) সংগ দেন, তাঁকে সাহস দেন এবং বিনা দ্বিধায় তাঁর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনেন। এই প্রসংগে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, একমাত্র আবু বকর ছাড়া প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করেছি।' এভাবে আবু বকর হলেন বয়স্ক আযাদ লোকদের মধ্যে প্রথম মুসলমান।

মুসলমান হওয়ার পর ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মক্কার আশপাশের গোত্রসমূহে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। হজ্জের মওসুমে বিভিন্ন তাঁবুতে গিয়ে লোকদের দাওয়াত দিতেন। বহিরাগত লোকদের কাছে ইসলামের ও রাসূলের (সা) পরিচয় তুলে ধরতেন। এভাবে আরববাসী রাসূলুল্লাহর (সা) প্রচারিত দ্বীন সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁর ওপর ঈমান আনে। তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব ও চেষ্টায় তৎকালীন কুরাইশ বংশের বিশিষ্ট যুবক উসমান, যুবাইর, আবদুর রহমান, সা'দ ও তালহার মত ব্যক্তিরা সহ আরো অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা দিলেন, আবু বকরের নিকট তখন চল্লিশ হাজার দিরহাম। ইসলামের জন্য তিনি তাঁর সকল সম্পদ ওয়াক্ফ করে দেন। কুরাইশদের যেসব দাস-দাসী ইসলাম গ্রহণের কারণে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হচ্ছিল, এ অর্থ দ্বারা তিনি সেই সব দাস-দাসী খরীদ করে আযাদ করেন। তেরো বছর পর যখন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন তখন তাঁর কাছে এ অর্থের মাত্র

আড়াই হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। অল্পদিনের মধ্যে অবশিষ্ট দিরহামগুলিও ইসলামের জন্য ব্যয়িত হয়। বিলাল, খাব্বাব, আম্মার, আম্মারের মা সুমাইয়্যা, সুহাইব, আবু ফুকাইহ প্রমুখ দাস-দাসী তাঁরই অর্থের বিনিময়ে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করেন। তাই পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি প্রতিটি মানুষের ইহসান পরিশোধ করেছি। কিন্তু আবু বকরের ইহসানসমূহ এমন যে, তা পরিশোধ করতে আমি অক্ষম। তার প্রতিদান আল্লাহ দেবেন। তার অর্থ আমার উপকারে যেমন এসেছে, অন্য কারো অর্থ তেমন আসেনি।

রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে মি'রাজের কথা শুনে অনেকেই যখন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে দোল খাচ্ছিল, তখন তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। হযরত হাসান (রা) বলেন ঃ 'মি'রাজের কথা শুনে বহু সংখ্যক মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে। লোকেরা আবু বকরের কাছে গিয়ে বলে ঃ আবু বকর, তোমার বন্ধুকে তুমি বিশ্বাস কর? সে বলেছে, সে নাকি গতরাতে বাইতুল মাকদাসে গিয়েছে, সেখানে সে নামায পড়েছে, অতঃপর মক্কায় ফিরে এসেছে।'

আবু বকর বললেন ঃ তোমরা কি তাকে অবিশ্বাস কর? তারা বলল ঃ হ্যাঁ, ঐতো মসজিদে বসে লোকজনকে একথাই বলছে। আবু বকর বললেন ঃ আল্লাহর কসম, তিনি যদি এ কথা বলে থাকেন তাহলে সত্য কথাই বলেছেন। এতে অবাক হওয়ার কি দেখলে? তিনি তো আমাকে বলে থাকেন, তাঁর কাছে আল্লাহর কাছ থেকে ওহী আসে। আকাশ থেকে ওহী আসে মাত্র এক মুহূর্তের মধ্যে। তাঁর সে কথাও আমি বিশ্বাস করি। তোমরা যে ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করছো এটা তার চেয়েও বিস্ময়কর। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর নবী, আপনি কি জনগণকে বলছেন যে, আপনি গতরাতে বাইতুল মাকদাস ভ্রমণ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবু বকর বললেন ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হে আবু বকর, তুমি সিদ্দীক। এভাবে আবু বকর 'সিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত হন।

মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) অভ্যাস ছিল প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় আবু বকরের বাড়ীতে গমন করা। কোন বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন হলে তাঁর সাথে পরামর্শ করা। রাসূল (সা) দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে কোথাও গেলে তিনিও সাধারণতঃ সংগে থাকতেন।

মুসলমানদের ওপর মুশরিকদের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করলে একবার তিনি হাবশায় হিজরাত করার ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু 'ইবনুদ দাগনাহ' নামক এক গোত্রপতি তাঁকে এ সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রাখে। সে কুরাইশদের হাত থেকে এ শর্তে নিরাপত্তা দেয় যে, আবু বকর প্রকাশ্যে সালাত আদায় করবেন না, কিন্তু দীর্ঘদিন এ শর্ত পালন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ইবনুদ দাগনাহর নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেন এবং অন্যান্য মুসলমান ভাইদের যে অবস্থা হয় সন্তুষ্টচিত্তে তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের সেই কঠিন মুহূর্তে আবু বকরের কুরবানী, বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য ও বন্ধুত্বের কথা ইতিহাসে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। তাঁর সাহচর্যের কথা তো

পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। ইবন ইসহাক বলেন "আবু বকর রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে হিজরাতের অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলতেন ঃ তুমি তাড়াহুড়া করোনা। আল্লাহ হয়তো তোমাকে একজন সহযাত্রী জুটিয়ে দেবেন। আবু বকর একথা শুনে ভাবতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হয়তো নিজের কথাই বলছেন। তাই তিনি তখন থেকেই দুটো উট কিনে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পুষতে থাকেন। এই আশায় যে, হিজরাতের সময় হয়তো কাজে লাগতে পারে।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) দিনে অন্ততঃ একবার আবু বকরের বাড়ীতে আসতেন। যে দিন হিজরাতের অনুমতি পেলেন সেদিন দুপুরে আমাদের বাড়ীতে আসলেন, এমন সময় কখনো তিনি আসতেন না। তাঁকে দেখা মাত্র আবু বকর বলে উঠলেন, নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। তা নাহলে এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আসতেন না। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করলে আবু বকর তাঁর খাটের একধারে সরে বসলেন। আবু বকরের বাড়ীতে তখন আমি আর আমার বোন আসমা ছাড়া আর কেউ ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমার এখানে অন্য যারা আছে তাদেরকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দাও। আবু বকর বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমার দুই মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। আপনার কি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে হিজরাত করার অনুমতি দিয়েছেন। আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, আমিও কি সংগে যেতে পারবো? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ, যেতে পারবে। আয়িশা বলেন ঃ সে দিনের আগে আমি জানতাম না যে, মানুষ আনন্দের আতিশয্যেও এত কাঁদতে পারে। আমি আবু বকরকে (রা) সেদিন কাঁদতে দেখেছি। অতঃপর আবু বকর (রা) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! এই দেখুন, আমি এই উট দুটো এই কাজের জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছি।'

তাঁরা আবদুল্লাহ ইবন উরায়কাতকে পথ দেখিয়ে নেয়ার জন্য ভাড়া করে সাথে নিলেন। সে ছিল মুশরিক, তবে বিশ্বাস ভাজন। রাতের আঁধারে তাঁরা আবু বকরের বাড়ীর পেছন দরজা দিয়ে বের হলেন এবং মক্কার নিম্নভূমিতে 'সাওর' পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। হাসান বসরী (রা) থেকে ইবন হিশাম বর্ণনা করেন ঃ তাঁরা রাতে সাওর পর্বতের গুহায় পৌঁছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রবেশের আগে আবু বকর (রা) গুহায় প্রবেশ করলেন। সেখানে কোন হিংস্র প্রাণী বা সাপ-বিচ্ছু আছে কিনা তা দেখে নিলেন। রাসূলুল্লাহকে (সা) বিপদমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

মক্কায় উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার ওফাতের পর রাসূলকে (সা) যখন আবু বকর (রা) বিমর্ষ দেখলেন, অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আদব সহকারে নিজের অল্পবয়স্কা কন্যা আয়িশাকে (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে দেন। মোহরের অর্থও নিজেই পরিশোধ করেন।

হিজরাতের পর সকল অভিযানেই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। কোন একটি অভিযানেও অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হননি।

তাবুক অভিযানে তিনি ছিলেন মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী। এ অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) আবেদনে সাড়া দিয়ে বাড়ীতে যা কিছু অর্থ-সম্পদ ছিল সবই তিনি

রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেন। আল্লাহর রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেন, 'ছেলে-মেয়েদের জন্য বাড়ীতে কিছু রেখেছো কি?' জবাব দিলেন, 'তাদের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই যথেষ্ট।'

মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে প্রথম ইসলামী হজ্জ আদায় উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বকরকে (রা) 'আমীরুল হজ্জ' নিয়োগ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তিম রোগ শয্যায় তাঁরই নির্দেশে মসজিদে নববীর নামাযের ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। মোটকথা, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় আবু বকর (রা) তাঁর উযীর ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর আবু বকর (রা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। 'খলীফাতু রাসূলিল্লাহ'– এ লকবটি কেবল তাঁকেই দেওয়া হয়। পরবর্তী খলীফাদের 'আমীরুল মু'মিনীন' উপাধি দেওয়া হয়েছে।

ব্যবসায় ছিল তাঁর পেশা। ইসলাম-পূর্ব যুগে কুরাইশদের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরেও জীবিকার প্রয়োজনে এ পেশা চালিয়ে যেতে থাকেন। তবে খলিফা হওয়ার পর খিলাফতের গুরু দায়িত্ব কাঁধে পড়ায় ব্যবসার পাট চুকাতে বাধ্য হন। হযরত 'উমার ও আবু উবাইদার পীড়াপীড়িতে মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত মুতাবিক প্রয়োজন অনুপাতে 'বাইতুল মাল' থেকে ন্যূনতম ভাতা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন। যার পরিমাণ ছিল বাৎসরিক আড়াই হাজার দিরহাম। তবে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে 'বাইতুলমাল' থেকে গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরতদানের নির্দেশ দিয়ে যান।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সংবাদে সাহাবামণ্ডলী যখন সম্পূর্ণ হতভম্ব, তাঁরা যখন চিন্তাই করতে পারছিলেন না, রাসূলের (সা) ওফাত হতে পারে, এমনকি হযরত 'উমার (রা) কোষমুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে ঘোষণা করে বসেন– 'যে বলবে রাসূলের (সা) ওফাত হয়েছে তাঁকে হত্যা করবো।' এমনই এক ভাব-বিহ্বল পরিবেশেও আবু বকর (রা) ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় ও অবিচল। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি ঘোষণা করেন ঃ 'যারা মুহাম্মাদের ইবাদাত করতে তারা জেনে রাখ, মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদত কর তারা জেনে রাখ আল্লাহ চিরঞ্জীব— তাঁর মৃত্যু নেই।' তারপর এ আয়াত পাঠ করেন ঃ 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছে। তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন তাহলে তোমরা কি পেছনে ফিরে যাবে? যারা পেছনে ফিরে যাবে তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শিগগিরই আল্লাহ তাদের প্রতিদান দেবেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৪৪) আবু বকরের মুখে এ আয়াত শুনার সাথে সাথে লোকেরা যেন সম্বিত ফিরে পেল। তাদের কাছে মনে হল এ আয়াত যেন তারা এই প্রথম শুনছে। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের সাথে সাথে প্রথম যে মারাত্মক সমস্যাটি দেখা দেয়, আবু বকরের (রা) দৃঢ় হস্তক্ষেপে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাসূলুল্লাহর (সা) কাফন-দাফন তখনো সম্পন্ন হতে পারেনি। এরই মধ্যে তাঁর স্থলাভিষিক্তির বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করলো। মদীনার জনগণ, বিশেষত আনসাররা

'সাকীফা বনী সায়েদা' নামক স্থানে সমবেত হলো। আনসাররা দাবী করলো, যেহেতু আমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) আশ্রয় দিয়েছি, নিজেদের জান-মালের বিনিময়ে দুর্বল ইসলামকে সবল ও শক্তিশালী করেছি, আমাদের মধ্য থেকে কাউকে রাসূলুল্লাহর (সা) স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। মুহাজিরদের কাছে এ দাবী গ্রহণযোগ্য হলো না। তারা বললো ঃ ইসলামের বীজ আমরা বপন করেছি এবং আমরাই তাতে পানি সিঞ্চন করেছি। সুতরাং আমরাই খিলাফতের অধিকতর হকদার। পরিস্থিতি ভিন্নদিকে মোড় নিল। আবু বকরকে (রা) ডাকা হল। তিনি তখন রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মরদেহের নিকট। তিনি উপস্থিত হয়ে ধীর-স্থিরভাবে কথা বললেন। তাঁর যুক্তি ও প্রমাণের কাছে আনসাররা নতি স্বীকার করলো। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর দ্বিতীয় যে সমস্যাটি দেখা দেয়, আবু বকরের (রা) বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় তারও সুন্দর সমাধান হয়ে যায়।

আবু বকর খলীফা নির্বাচিত হলেন। খলীফা হওয়ার পর সমবেত মুহাজির ও আনসারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন ঃ 'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে খলীফা বানানো হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি চাচ্ছিলাম, আপনাদের মধ্য থেকে অন্য কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনারা যদি চান আমার আচরণ রাসূলুল্লাহর (সা) আচরণের মত হোক, তাহলে আমাকে সেই পর্যায়ে পৌঁছার ব্যাপারে অক্ষম মনে করবেন। তিনি ছিলেন নবী। ভুলত্রুটি থেকে ছিলেন পবিত্র। তাঁর মত আমার কোন বিশেষ মর্যাদা নেই। আমি একজন সাধারণ মানুষ। আপনাদের কোন একজন সাধারণ ব্যক্তি থেকেও উত্তম হওয়ার দাবী আমি করতে পারিনে।... আপনারা যদি দেখেন আমি সঠিক কাজ করছি, আমার সহায়তা করবেন। যদি দেখেন আমি বিপথগামী হচ্ছি, আমাকে সতর্ক করে দেবেন। তাঁর সেই নীতিনির্ধারণী সংক্ষিপ্ত প্রথম ভাষণটি চিরকাল বিশ্বের সকল রাষ্ট্রনায়কদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

তাঁর চরিত্রের সীমাহীন দৃঢ়তার আর এক প্রকাশ ঘটে রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের অব্যবহিত পরে উসামা ইবন যায়িদের বাহিনীকে পাঠানোর মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের অল্প কিছুদিন আগে মুতা অভিযানে শাহাদাত প্রাপ্ত যায়িদ ইবন হারিসা, জাফর ইবন আবী তালিব ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। এ বাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত করেন নওজোয়ান উসামা ইবন যায়িদকে। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে উসামা তাঁর বাহিনীসহ সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁরা মদীনা থেকে বের হতেই রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁরা মদীনার উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করে রাসূলুল্লাহর (সা) রোগমুক্তির প্রতীক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু এ রোগেই রাসূল (সা) ইনতিকাল করেন। আবু বকর (রা) খলীফা হলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সংবাদে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন দিকে নানা অপশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। কেউবা ইসলাম ত্যাগ করে, কেউবা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, আবার কেউবা নবুওয়াত দাবী করে বসে। এমনি এক চরম অবস্থায় অনেকে পরামর্শ দিলেন উসামার বাহিনী পাঠানোর ব্যাপারটি স্থগিত রাখতে। কিন্তু আবু বকর (রা) অত্যন্ত কঠোরভাবে এ পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি যদি এ

বাহিনী পাঠাতে ইতস্ততঃ করতেন বা বিলম্ব করতেন তাহলে খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর এটা হতো রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশের প্রথম বিরুদ্ধাচরণ। কারণ, অন্তিম রোগশয্যায় তিনি উসামার বাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আবু বকর (রা) উসামার বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। তখন আনসারদের একটি দল দাবী করলেন, তাহলে অন্ততঃ উসামাকে কমাণ্ডারের পদ থেকে সরিয়ে অন্য কোন বয়স্ক সাহাবীকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করা হোক। উল্লেখ্য যে, তখন উমাসার বয়স মাত্র বিশ বছর। সকলের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি হযরত উমার উপস্থাপন করলেন। প্রস্তাব শুনে আবু বকর (রা) রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি উমারের (রা) দাড়ি মুট করে ধরে বল্লেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) যাকে নিয়োগ করেছেন আবু বকর তাকে অপসারণ করবে?' এভাবে এ প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

হযরত উমারও ছিলেন উসামার এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একজন সৈনিক। অথচ নতুন খলিফার জন্য তখন তাঁর মদীনায় থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। খলীফা ইচ্ছা করলে তাঁকে নিজেই মদীনায় থেকে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি উসামার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ না করে তাঁর কাছে আবেদন জানালেন উমারকে মদীনায় রেখে যাওয়ার জন্য। উসামা খলীফার আবেদন মঞ্জুর করলেন। কারণ, আবু বকর বুঝেছিলেন উসামার নিয়োগকর্তা খোদ রাসূলুল্লাহ (সা)। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উসামার ক্ষমতা তাঁর ক্ষমতার ওপরে। এভাবে আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেন এবং তাঁর সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণ থেকেও বিরত থাকেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর আবাস ও জুবইয়ান গোত্রদ্বয় যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। বিষয়টি নিয়ে খলীফার দরবারে পরামর্শ হয়। সাহাবীদের অনেকেই তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান না চালানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু আবু বকর (রা) অটল। তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে উটের যে বাচ্চাটি যাকাত পাঠানো হতো এখন যদি কেউ তা দিতে অস্বীকার করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।'

কিছু লোক নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার ছিল। আবু বকর (রা) অসীম সাহস ও দৃঢ়তা সহকারে এসব ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ইসলামের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেন। তাই ইতিহাসবিদরা মন্তব্য করেছেন ঃ আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তার পর যদি আবু বকরের এ দৃঢ়তা না হতো, মুসলিম জাতির ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লেখা হতো।

এমনটি সম্ভব হয়েছে এজন্য যে, হযরত আবু বকরের (রা) স্বভাবে দু'টি পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, সীমাহীন দৃঢ়তা ও কোমলতা। এ কারণে তাঁর চরিত্রে সর্বদা একটা ভারসাম্য বিরাজমান ছিল। কোন ব্যক্তির স্বভাবে যদি এ দু'টি গুণের কেবল একটি বর্তমান থাকে এবং অন্যটি থাকে অনুপস্থিত, তখন তার চরিত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে এ দু'টি গুণ তাঁর চরিত্রে সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। হযরত আবু বকর (রা) যদিও মুসলমানদের নেতা ও খলীফা ছিলেন, তবুও তাঁর জীবন ছিল খুব অনাড়ম্বর। খলীফা হওয়া সত্ত্বেও মদীনার

অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে জনগণের অবস্থা জানতেন এবং তাদের ব্যক্তিগত কাজও সময় সময় নিজ হাতে করে দিতেন। হযরত উমার (রা) বলেন ঃ 'আমি প্রতিদিন সকালে এক বৃদ্ধার বাড়ীতে তার ঘরের কাজ করে দিতাম। প্রতিদিনের মত একদিন তার বাড়ীতে উপস্থিত হলে বৃদ্ধা বললেন ঃ আজ কোন কাজ নেই। এক নেককার ব্যক্তি তোমার আগেই কাজগুলি শেষ করে গেছে। হযরত উমার পরে জানতে পারেন, সেই নেককার লোকটি হযরত আবু বকর (রা)। খলীফা হওয়া সত্বেও এভাবে এক অনাথ বৃদ্ধার কাজ করে দিয়ে যেতেন। হযরত আবু বকর (রা) মাত্র আড়াই বছরের মত খিলাফত পরিচালনা করেন। তবে তাঁর এ সময়টুকু ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান হলো, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা। আরবের বিদ্রোহসমূহ নির্মূল করা। রাষ্ট্রও সরকারকে তিনি এত মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন যে, মুসলমানরা ইরান ও রোমের মত দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে সাহসী হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাদের বহু অঞ্চল দখল করে নেয়।

হযরত আবু বকরের (রা) আরেকটি অবদান পবিত্র কুরআনের সংকলন ও সংরক্ষণ। তাঁর খিলাফতকালের প্রথম অধ্যায়ে আরবের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেইসব বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে কয়েকশত হাফেজে কুরআন শাহাদাত বরণ করেন। শুধুমাত্র মুসায়লামা কাজ্জাবের সাথে যে যুদ্ধ হয় তাতেই সাত শ' হাফেজ শহীদ হন। অতঃপর হযরত উমারের পরামর্শে হযরত আবু বকর (রা) সম্পূর্ণ কুরআন একস্থানে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন এবং কপিটি নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন। ইতিহাসে কুরআনের এই আদি কপিটি 'মাসহাফে সিদ্দীকী' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে হযরত 'উসমানের (রা) যুগে কুরআনের যে কপিগুলি করা হয় তা মূলতঃ 'মাসহাফে সিদ্দীকীর' অনুলিপি মাত্র।

পবিত্র কুরআন ও রাসূলের বাণীতে আবু বকরের সীমাহীন মর্যাদা ও সম্মানের কথা বহুবার বহু স্থানে ঘোষিত হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লামা জাহাবী *'তাজকিরাতুল হুফফাজ'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। অত্যধিক সতর্কতার কারণে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় খুব কম। উমার, উসমান, আবদুর রহমান ইবন আউফ, ইবন মাসউদ, ইবন উমার, ইবন আমর, ইবন আব্বাস, হুজাইফা, যায়িদ ইবন সাবিত, উকবা, মা'কাল, আনাস, আবু হুরাইরা, আবু উমামা, আবু বারাযা, আবু মুসা, তাঁর দু'কন্যা আয়িশা ও আসমা প্রমুখ সাহাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিশিষ্ট তাবেয়ীরাও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৩ হিজরীর ৭ জমাদিউল উখরা হযরত আবু বকর (রা) জ্বরে আক্রান্ত হন। ১৫ দিন রোগাক্রান্ত থাকার পর হিজরী ১৩ সনের ২১ জামাদিউল উখরা মুতাবিক ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইনতিকাল করেন। হযরত আয়িশার (রা) হুজরায় রাসূলুল্লাহর (সা) পাশের একটু পূব দিকে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি দু'বছর তিন মাস দশ দিন খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)

নাম 'উমার, লকব ফারুক এবং কুনিয়াত আবু হাফ্স। পিতা খাত্তাব ও মাতা হান্তামা। কুরাইশ বংশের আ'দী গোত্রের লোক। 'উমারের অষ্টম উর্ধ পুরুষ কা'ব নামক ব্যক্তির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। পিতা খাত্তাব কুরাইশ বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মাতা 'হানতামা' কুরাইশ বংশের বিখ্যাত সেনাপতি হিশাম ইবন মুগীরার কন্যা। ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ এই মুগীরার পৌত্র। মক্কার 'জাবালে 'আকিব'-এর পাদদেশে ছিল জাহিলী যুগে বনী 'আ'দী ইবন কা'বের বসতি। এখানেই ছিল হযরত উমারের বাসস্থান। ইসলামী যুগে 'উমারের নাম অনুসারে পাহাড়টির নাম হয় 'জাবালে 'উমার'– 'উমারের পাহাড়। (তাবাকাতে ইবন সা'দ ৩/৬৬) 'উমারের চাচাত ভাই, যায়িদ বিন নুফাইল। হযরত রাসূলে কারীমের আবির্ভাবের পূর্বে নিজেদের বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে জাহিলী আরবে যাঁরা তাওহীদবাদী হয়েছিলেন, যায়িদ তাঁদেরই একজন।

রাসূলুল্লাহর (সা) জন্মের তের বছর পর তাঁর জন্ম। মৃত্যুকালেও তাঁর বয়স হয়েছিল রাসূলুল্লাহর (সা) বয়সের সমান ৬৩ বছর। তবে তাঁর জন্ম ও ইসলাম গ্রহণের সন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, টাক মাথা, গন্ডদেশ মাংসহীন, ঘন দাড়ি, মোঁচের দু'পাশ লম্বা ও পুরু এবং শরীর দীর্ঘাকৃতির। হাজার মানুষের মধ্যেও তাঁকেই সবার থেকে লম্বা দেখা যেত।

তাঁর জন্ম ও বাল্য সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। ইবন আসাকির তাঁর তারীখে 'আমর ইবন 'আস (রা) হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে জানা যায়, একদিন 'আমর ইবন 'আস কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবসহ বসে আছেন, এমন সময় হৈ চৈ শুনতে পেলেন। সংবাদ নিয়ে জানতে পেলেন, খাত্তাবের একটি ছেলে হয়েছে। এ বর্ণনার ভিত্তিতে মনে হয়, হযরত 'উমারের জন্মের সময় বেশ একটা আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

তাঁর যৌবনের অবস্থাও প্রায় অনেকটা অজ্ঞাত। কে জানতো যে এই সাধারণ একরোখা ধরনের যুবকটি একদিন 'ফারুকে আযমে' পরিণত হবেন। কৈশোরে 'উমারের পিতা তাঁকে উটের রাখালী কাজে লাগিয়ে দেন। তিনি মক্কার নিকটবর্তী 'দাজনান' নামক স্থানে উট চরাতেন। তিনি তাঁর খিলাফতকালে একবার এই মাঠ অতিক্রমকালে সঙ্গীদের কাছে বাল্যের স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবে ঃ 'এমন এক সময় ছিল যখন আমি পশমী জামা পরে এই মাঠে প্রখর রোদে খাত্তাবের উট চরাতাম। খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও নীরস ব্যক্তি। ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিলে পিতার হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হতাম। কিন্তু আজ আমার এমন দিন এসেছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আমার ওপর কর্তৃত্ব করার আর কেউ নেই।' (তাবাকাত ঃ ৩/২৬৬-৬৭)

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি তৎকালীন অভিজাত আরবদের অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যথা ঃ যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশ তালিকা শিক্ষা প্রভৃতি আয়ত্ত করেন। বংশ তালিকা বা নসবনামা বিদ্যা তিনি লাভ করেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়ে ছিলেন এ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর। আরবের 'উকায' মেলায় তিনি কুস্তি লড়তেন। আল্লামা যুবইয়ানী বলেছেন ঃ 'উমার ছিলেন এক মস্তবড় পাহলোয়ান।' তিনি ছিলেন জাহিলী আরবের এক বিখ্যাত ঘোড় সওয়ার। আল্লামা জাহিয বলেছেন ঃ 'উমার ঘোড়ায় চড়লে মনে হত, ঘোড়ার চামড়ার সাথে তাঁর শরীর মিশে গেছে।' (আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন) তাঁর মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। তৎকালীন খ্যাতনামা কবিদের প্রায় সব কবিতাই তাঁর মুখস্থ ছিল। আরবী কাব্য সমালোচনার বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারার প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃতপক্ষে তিনিই। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামতগুলি পাঠ করলে এ বিষয়ে তাঁর যে কতখানি দখল ছিল তা উপলব্ধি করা যায়। বাগ্মিতা ছিল তাঁর সহজাত গুণ। যৌবনে তিনি কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। বালাজুরী লিখেছেন ঃ 'রাসূলে কারীমের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় গোটা কুরাইশ বংশে মাত্র সতের জন লেখা-পড়া জানতেন। তাদের মধ্যে 'উমার একজন।

ব্যবসা বাণিজ্য ছিল জাহিলী যুগের আরব জাতির সম্মানজনক পেশা। 'উমারও ব্যবসা শুরু করেন এবং তাতে যথেষ্ট উন্নতিও করেন। ব্যবসা উপলক্ষে অনেক দূরদেশে গমন এবং বহু জ্ঞানী-গুণী সমাজের সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন। মাসউদী বলেন ঃ 'উমার (রা) জাহিলী যুগে সিরিয়া ও ইরাকে ব্যবসা উপলক্ষে ভ্রমণে যেতেন। ফলে আরব ও আজমের অনেক রাজা-বাদশার সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন।' শিবলী নু'মানী বলেন ঃ 'জাহিলী যুগেই 'উমারের সুনাম সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে কুরাইশরা সর্বদা তাঁকেই দৌত্যগিরিতে নিয়োগ করতো। অন্যান্য গোত্রের সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে নিষ্পত্তির জন্য তাঁকেই দূত হিসেবে পাঠানো হত।' (আল-ফারুক ঃ ১৪)

'উমারের ইসলাম গ্রহণ এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা। তাঁর চাচাত ভাই যায়িদের কল্যাণে তাঁর বংশে তাওহীদের বাণী একেবারে নতুন ছিল না। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যায়িদের পুত্র সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেন। সাঈদ আবার 'উমারের বোন ফাতিমাকে বিয়ে করেন। স্বামীর সাথে ফাতিমাও ইসলাম গ্রহণ করেন। 'উমারের বংশের আর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি নাঈম ইবন আবদুল্লাহও ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত 'উমার ইসলাম সম্পর্কে কোন খবরই রাখতেন না। সর্বপ্রথম যখন ইসলামের কথা শুনলেন, ক্রোধে জ্বলতে লাগলেন। তাঁর বংশে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের তিনি পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। এর মধ্যে জানতে পেলেন, 'লাবীনা' নামে তাঁর এক দাসীও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যাঁদের ওপর তাঁর ক্ষমতা চলতো, নির্মম উৎপীড়ন চালালেন। এক পর্যায়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ইসলামের মূল প্রচারক মুহাম্মাদকেই (সা) দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। যে কথা সেই কাজ।

আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণিত। 'তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে 'উমার চলেছেন। পথে বনি যুহরার এক ব্যক্তির (মতান্তরে নাঈম ইবন আবদুল্লাহ) সাথে দেখা। তিনি জিজ্ঞেস

করলেন ঃ কোন দিকে 'উমার? বললেন ঃ মুহাম্মাদের একটা দফারফা করতে। লোকটি বললেন, মুহাম্মাদের (সা) দফারফা করে বনি হাশিম ও বনি যুহরার হাত থেকে বাঁচবে কিভাবে? একথা শুনে 'উমার বলে উঠলেন ঃ মনে হচ্ছে, তুমিও পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়েছ। লোকটি বললেন ঃ 'উমার, একটি বিস্ময়কর খবর শোন, তোমার বোন-ভগ্নিপতি বিধর্মী হয়ে গেছে। তারা তোমার ধর্ম ত্যাগ করেছে। (আসলে লোকটির উদ্দেশ্য ছিল, 'উমারকে তার লক্ষ্য থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।) একথা শুনে রাগে উন্মত্ত হয়ে 'উমার ছুটলেন তাঁর বোন-ভগ্নিপতির বাড়ীর দিকে। বাড়ীর দরজায় 'উমারের (রা) করাঘাত পড়লো। তাঁরা দু'জন তখন খাব্বাব ইবন আল-আরাত-এর কাছে কুরআন শিখছিলেন। 'উমারের আভাস পেয়ে খাব্বাব বাড়ীর অন্য একটি ঘরে আত্মগোপন করলেন। 'উমার বোন-ভগ্নিপতিকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের এখানে গুন্‌গুন্‌ আওয়ায শুনছিলাম, তা কিসের? তাঁরা তখন কুরআনের সূরা ত্বাহা পাঠ করছিলেন। তাঁরা উত্তর দিলেন ঃ আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলাম। 'উমার বললেন ঃ সম্ভবতঃ তোমরা দু'জন ধর্মত্যাগী হয়েছো। ভগ্নিপতি বললেন ঃ তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য কোথাও যদি সত্য থাকে তুমি কি করবে 'উমার? 'উমার তাঁর ভগ্নিপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দু'পায়ে ভীষণভাবে তাঁকে মাড়াতে লাগলেন। বোন তাঁর স্বামীকে বাঁচাতে এলে 'উমার তাঁকে ধরে এমন মার দিলেন যে, তাঁর মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেল। বোন রাগে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন ঃ সত্য যদি তোমার দ্বীনের বাইরে অন্য কোথাও থেকে থাকে, তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

এ ঘটনার কিছুদিন আগ থেকে 'উমারের মধ্যে একটা ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছিল। কুরাইশরা মক্কায় মুসলমানদের ওপর নির্মম অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়ে একজনকেও ফেরাতে পারেনি। মুসলমানরা নীরবে সবকিছু মাথা পেতে নিয়েছে। প্রয়োজনে বাড়ী-ঘর ছেড়েছে, ইসলাম ত্যাগ করেনি। এতে 'উমারের মনে একটা ধাক্কা লেগেছিল। তিনি একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে দোল খাচ্ছিলেন। আজ তাঁর প্রিয় সহোদরার চোখ-মুখের রক্ত, তার সত্যের সাক্ষ্য তাঁকে এমন একটি ধাক্কা দিল যে, তাঁর সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কর্পূরের মত উড়ে গেল। মুহূর্তে হৃদয় তাঁর সত্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি পাক-সাফ হয়ে বোনের হাত থেকে সূরা ত্বাহার অংশটুকু নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। পড়া শেষ করে বললেন ঃ আমাকে তোমরা মুহাম্মাদের (সা) কাছে নিয়ে চল। 'উমারের একথা শুনে এতক্ষণে খাব্বাব ঘরের গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন ঃ 'সুসংবাদ 'উমার! বৃহস্পতিবার রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) তোমার জন্য দুআ করেছিলেন। আমি আশা করি তা কবুল হয়েছে। তিনি বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ, 'উমার ইবনুল খাত্তাব অথবা 'আমর ইবন হিশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর।' খাব্বাব আরো বললেন ঃ রাসূল (সা) এখন সাফার পাদদেশে 'দারুল আরকামে'।

'উমার চললেন 'দারুল আরকামের' দিকে। হামযা এবং তালহার সাথে আরো কিছু সাহাবী তখন আরকামের বাড়ীর দরজায় পাহারারত। 'উমারকে দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তবে হামযা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ 'উমারের কল্যাণ চাইলে সে

ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলের অনুসারী হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য খুবই সহজ হবে। রাসূল (সা) বাড়ীর ভেতরে। তাঁর উপর তখন ওহী নাযিল হচ্ছে। একটু পরে তিনি বেরিয়ে 'উমারের কাছে এলেন। 'উমারের কাপড় ও তরবারির হাতল মুট করে ধরে বললেন ঃ 'উমার, তুমি কি বিরত হবে না?'...... তারপর দুআ করলেন ঃ হে আল্লাহ্, 'উমার আমার সামনে, হে আল্লাহ, 'উমারের দ্বারা দ্বীনকে শক্তিশালী কর।' 'উমার বলে উঠলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি আহ্বান জানালেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঘর থেকে বের হয়ে পড়ুন।' (তাবাকাতুল কুবরা/ইবন সা'দ ৩/২৬৭-৬৯) এটা নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরের ঘটনা।

ইমাম যুহরী বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) দারুল আরকামে প্রবেশের পর 'উমার ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পূর্বে নারী-পুরুষ সর্বমোট ৪০ অথবা চল্লিশের কিছু বেশী লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। 'উমারের ইসলাম গ্রহণের পর জিবরীল (আ) এসে বলেন ঃ "মুহাম্মাদ, 'উমারের ইসলাম গ্রহণে আসমানের অধিবাসীরা উৎফুল্ল হয়েছে।" (তাবাকাত ঃ ৩/২৬৯)

'উমারের ইসলাম গ্রহণে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। যদিও তখন পর্যন্ত ৪০/৫০ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে হযরত হামযাও ছিলেন, তথাপি মুসলমানদের পক্ষে কা'বায় গিয়ে নামায পড়া তো দূরের কথা নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করাও নিরাপদ ছিল না। হযরত 'উমারের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে এ অবস্থার পরিবর্তন হলো। তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিলেন এবং অন্যদের সংগে নিয়ে কা'বা ঘরে নামায আদায় শুরু করলেন।

'উমার (রা) বলেন ঃ আমি ইসলাম গ্রহণের পর সেই রাতেই চিন্তা করলাম, মক্কাবাসীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে কট্টর দুশমন কে আছে। আমি নিজে গিয়ে তাকে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানাবো। আমি মনে করলাম, আবু জাহলই সবচেয়ে বড় দুশমন। সকাল হতেই আমি তার দরজায় করাঘাত করলাম। আবু জাহল বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কি মনে করে?' আমি বললাম ঃ 'আপনাকে একথা জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের (সা) প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর আনীত বিধান ও বাণীকে মেনে নিয়েছি।' একথা শোনা মাত্র সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল এবং বললো ঃ 'আল্লাহ তোকে কলংকিত করুক এবং যে খবর নিয়ে তুই এসেছিস তাকেও কলংকিত করুক।' (সীরাতু ইবন হিশাম)

এভাবে এই প্রথমবারের মত মক্কার পৌত্তলিক শক্তি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন ঃ 'তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় ইসলাম প্রকাশ্য রূপ নেয়।' আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন ঃ 'উমার ইসলাম গ্রহণ করেই কুরাইশদের সাথে বিবাদ আরম্ভ করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কা'বায় নামায পড়ে ছাড়লেন। আমরাও সকলে তাঁর সাথে নামায পড়েছিলাম।' সুহায়িব ইবন সিনান বলেন ঃ তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর আমরা কা'বার পাশে জটলা করে বসতাম, কা'বার তাওয়াফ করতাম, আমাদের সাথে কেউ রূঢ় ব্যবহার করলে তার প্রতিশোধ নিতাম এবং আমাদের ওপর যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করতাম। (তাবকাত ঃ ৩/২৬৯)। তাই

রাসূল (সা) তাঁকে– 'আল-ফারুক' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কারণ, তাঁরই কারণে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে প্রকাশ্য বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'উমারের জিহ্বা ও অন্তঃকরণে আল্লাহ তাআলা সত্যকে স্থায়ী করে দিয়েছেন। তাই সে 'ফারুক'। আল্লাহ তাঁর দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন। (তাবাকাত ঃ ৩/২৭০)

মক্কায় যাঁরা মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন, রাসূল (সা) তাদেরকে মদীনায় হিজরাতের নির্দেশ দিলেন। আবু সালামা, আবদুল্লাহ বিন আশহাল, বিলাল ও 'আম্মার বিন ইয়াসিরের মদীনায় হিজরাতের পর বিশজন আত্মীয়-বন্ধুসহ 'উমার মদীনার দিকে পা বাড়ালেন। এ বিশজনের মধ্যে তাঁর ভাই যায়িদ, ভাইয়ের ছেলে সাঈদ ও জামাই খুনাইসও ছিলেন। মদীনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে তিনি রিফায়া' ইবন আবদুল মুনজিরের বাড়ীতে আশ্রয় নেন।

'উমারের হিজরাত ও অন্যদের হিজরাতের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল। অন্যদের হিজরাত ছিল চুপে চুপে। সকলের অগোচরে। আর উমারের হিজরাত ছিল প্রকাশ্যে। তার মধ্যে ছিল কুরাইশদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ও বিদ্রোহের সুর। মক্কা থেকে মদীনায় যাত্রার পূর্বে তিনি প্রথমে কা'বা তাওয়াফ করলেন। তারপর কুরাইশদের আড্ডায় গিয়ে ঘোষণা করলেন, আমি মদীনায় চলছি। কেউ যদি তার মাকে পুত্রশোক দিতে চায়, সে যেন এ উপত্যকার অপর প্রান্তে আমার মুখোমুখি হয়। এমন একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তিনি সোজা মদীনার পথ ধরলেন। কিন্তু কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস করলো না। (তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ : খিদরী বেক, ১/১৯৮)

বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সাথে 'উমারের দ্বীনী ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। আবু বকর সিদ্দীক, 'উয়াইস ইবন সায়িদা, ইতবান ইবন মালিক ও মুয়াজ ইবন আফরা (রা) ছিলেন 'উমারের দ্বীনী ভাই। তবে এটা নিশ্চিত যে, মদীনায় হিজরাতের পর বনী সালেমের সরদার ইতবান ইবন মালিকের সাথে তাঁর দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। (তাবাকাত ঃ ৩/২৭২)

হিজরী প্রথম বছর হতে রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকাল পর্যন্ত 'উমারের (রা) কর্মজীবন প্রকৃতপক্ষে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) কর্মময় জীবনেরই একটা অংশবিশেষ। রাসূলকে (সা) যত যুদ্ধ করতে হয়েছিল, যত চুক্তি করতে হয়েছিল, কিংবা সময় সময় যত বিধিবিধান প্রবর্তন করতে হয়েছিল এবং ইসলাম প্রচারের জন্য যত পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল তার এমন একটি ঘটনাও নেই, যা 'উমারের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত সম্পাদিত হয়েছে। এইজন্য এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখতে গেলে তা 'উমারের (রা) জীবনী না হয়ে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনীতে পরিণত হয়। তাঁর কর্মবহুল জীবন ছিল রাসূলে কারীমের (সা) জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

হযরত 'উমার বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া আরো বেশ কিছু 'সারিয়্যা' (যে-সব ছোট অভিযানে রাসূলুল্লাহ সা. নিজে উপস্থিত হননি)-তে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের পরামর্শদান ও

সৈন্যচালনা হতে আরম্ভ করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি রাসূলে কারীমের (সা) সাথে দৃঢ়ভাবে কাজ করেন। বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে তাঁর পরামর্শই আল্লাহর পসন্দসই হয়েছিল। এ যুদ্ধে তাঁর বিশেষ ভূমিকা নিম্নরূপ ঃ

(১) এ যুদ্ধে কুরাইশ বংশের প্রত্যেক শাখা হতে লোক যোগদান করে; কিন্তু বনী আ'দী অর্থাৎ 'উমারের খান্দান হতে একটি লোকও যোগদান করেনি। 'উমারের প্রভাবেই এমনটি হয়েছিল।

(২) এ যুদ্ধে ইসলামের বিপক্ষে 'উমারের সাথে তাঁর গোত্র ও চুক্তিবদ্ধ লোকদের থেকে মোট বারো জন লোক যোগদান করেছিল।

(৩) এ যুদ্ধে হযরত 'উমার তাঁর আপন মামা আ'সী ইবন হিশামকে নিজ হাতে হত্যা করেন। এ হত্যার মাধ্যমে তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, সত্যের পথে আত্মীয় ও প্রিয়জনের প্রভাব প্রাধান্য লাভ করতে পারে না।

উহুদ যুদ্ধেও হযরত 'উমার (রা) ছিলেন একজন অগ্রসৈনিক। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম সৈন্যরা যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন এবং রাসূল (সা) আহত হয়ে মুষ্টিমেয় কিছু সঙ্গী-সাথীসহ পাহাড়ের এক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলেন, তখন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান নিকটবর্তী হয়ে উচ্চস্বরে মুহাম্মাদ (সা), আবু বকর (রা) 'উমার (রা) প্রমুখের নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা বেঁচে আছ কি? রাসূলের (সা) ইঙ্গিতে কেউই আবু সুফিয়ানের জবাব দিল না। কোন সাড়া না পেয়ে আবু সুফিয়ান ঘোষণা করলো ঃ 'নিশ্চয় তারা সকলে নিহত হয়েছে।' এ কথায় 'উমারের পৌরুষে আঘাত লাগলো। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না।' বলে উঠলেন ঃ 'ওরে আল্লাহর দুশমন! আমরা সবাই জীবিত।' আবু সুফিয়ান বললো, 'উ'লু হুবল– হুবলের জয় হোক।' রাসূলুল্লাহর (সা) ইঙ্গিতে 'উমার জবাব দিলেন ঃ 'আল্লাহু আ'লা ও আজাল্লু– আল্লাহ মহান ও সম্মানী।'

খন্দকের যুদ্ধেও 'উমার সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। খন্দকের একটি বিশেষ স্থান রক্ষা করার ভার পড়েছিল 'উমারের ওপর। আজও সেখানে তাঁর নামে একটি মসজিদ বিদ্যমান থেকে তাঁর সেই স্মৃতির ঘোষণা করছে। এ যুদ্ধে একদিন তিনি প্রতিরক্ষায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর আসরের নামায ফউত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। রাসূল (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন ঃ 'ব্যস্ততার কারণে আমিও এখন পর্যন্ত নামায আদায় করতে পারিনি।' (আল-ফারুক ঃ শিবলী নু'মানী ঃ ২৫)

হুদাইবিয়ার শপথের পূর্বেই হযররত 'উমার যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিলেন। পুত্র আবদুল্লাহকে পাঠালেন কোন এক আনসারীর নিকট থেকে ঘোড়া আনার জন্য। তিনি এসে খবর দিলেন, 'লোকেরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করছেন।' 'উমার তখন রণসজ্জায় সজ্জিত। এ অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তগুলি বাহ্য দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য অপমানজনক মনে হলো। 'উমার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। প্রথমে আবু বকর, তারপর খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এ সন্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বল্লেন ঃ 'আমি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোন কাজ আমি করিনে।' 'উমার শান্ত

হলেন। তিনি অনুতপ্ত হলেন। নফল রোযা রেখে, নামায পড়ে, গোলাম আযাদ করে এবং দান খয়রাত করে তিনি এ গোস্‌তাখীর কাফ্‌ফারা আদায় করলেন।

খাইবারে ইহুদীদের অনেকগুলি সুরক্ষিত দুর্গ ছিলো। কয়েকটি সহজেই জয় হলো। কিন্তু দু'টি কিছুতেই জয় করা গেল না। রাসূল (সা) প্রথম দিন আবু বকর, দ্বিতীয় দিন 'উমারকে পাঠালেন দুর্গ দু'টি জয় করার জন্য। তাঁরা দু'জনই ফিরে এলেন অকৃতকার্য হয়ে। তৃতীয় দিন রাসূল (সা) ঘোষণা করলেন ঃ 'আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন।' পর দিন সাহাবায়ে কিরাম অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির। প্রত্যেকেরই অন্তরে এই গৌরব অর্জনের বাসনা। 'উমার বলেন ঃ 'আমি খাইবারে এই ঘটনা ব্যতীত কোনদিনই সেনাপতিত্ব বা সরদারীর জন্য লালায়িত হইনি।' সে দিনের এ গৌরব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন শের-ই-খোদা আলী (রা)।

খাইবারের বিজিত ভূমি মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হলো। হযরত 'উমার (রা) তাঁর ভাগ্যের অংশটুকু আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম ওয়াক্‌ফ। (আল-ফারুক ঃ ৩০)

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত 'উমার (রা) ছায়ার মত রাসূলকে (সা) সঙ্গ দেন। ইসলামের মহাশত্রু আবু সুফিয়ান আত্মসমর্পণ করতে এলে 'উমার রাসূলুল্লাহকে (সা) অনুরোধ করেন ঃ 'অনুমতি দিন এখনই ওর দফা শেষ করে দিই।' এদিন মক্কার পুরুষরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে এবং মহিলারা রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে 'উমারের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করছিলেন।

হুনায়িন অভিযানেও হযরত 'উমার অংশগ্রহণ করে বীরত্ব সহকারে লড়াই করেছিলেন। এ যুদ্ধে কাফিরদের তীব্র আক্রমণে বারো হাজার মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। ইবন ইসহাক বলেন ঃ মুহাজির ও আনসারদের মাত্র কয়েকজন বীরই এই বিপদকালে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দৃঢ়পদ ছিলেন। তাদের মধ্যে আবু বকর, 'উমার ও আব্বাসের (রা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাবুক অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) আবেদনে সাড়া দিয়ে হযরত 'উমার (রা) তাঁর মোট সম্পদের অর্ধেক রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের খবর শুনে হযরত 'উমার কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন। তারপর মসজিদে নববীর সামনে যেয়ে তরবারি কোষমুক্ত করে ঘোষণা করেন, 'যে বলবে রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন, আমি তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবো।' এ ঘটনা থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালোবাসার পরিমাণ সহজেই অনুমান করা যায়।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর 'সাকীফা বনী সায়েদায়' দীর্ঘ আলোচনার পর 'উমার খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে হযরত আবু বকরের হাতে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেন। ফলে খলীফা নির্বাচনের মহা সংকট সহজেই কেটে যায়।

খলীফা হযরত আবু বকর যখন বুঝতে পারলেন তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে,

মৃত্যুর পূর্বেই পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যাওয়াকে তিনি কল্যাণকর মনে করলেন। তাঁর দৃষ্টিতে 'উমার (রা) ছিলেন খিলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তি। তা সত্বেও উঁচু পর্যায়ের সাহাবীদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করা সমীচীন মনে করলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবন আউফকে (রা) ডেকে বললেন, 'উমার সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে জানান।' তিনি বললেন ঃ 'তিনি তো যে কোন লোক থেকে উত্তম; কিন্তু তাঁর চরিত্রে কিছু কঠোরতা আছে।' আবু বকর বললেন ঃ 'তার কারণ, আমাকে তিনি কোমল দেখেছেন, খিলাফতের দায়িত্ব কাঁধে পড়লে এ কঠোরতা অনেকটা কমে যাবে।' তারপর আবু বকর অনুরোধ করলেন, তাঁর সাথে আলোচিত বিষয়টি কারো কাছে ফাঁস না করার জন্য। অতঃপর তিনি 'উসমান ইবন আফ্‌ফানকে ডাকলেন। বললেন, 'আবু আবদিল্লাহ, 'উমার সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে জানান।' 'উসমান বললেন ঃ আমার থেকে আপনিই তাঁকে বেশী জানেন। আবু বকর বললেন ঃ তা সত্বেও আপনার মতামত আমাকে জানান। 'উসমান বললেন ঃ তাঁকে আমি যতটুকু জানি, তাতে তাঁর বাইরের থেকে ভেতরটা বেশী ভালো। তাঁর মত দ্বিতীয় আর কেউ আমাদের মধ্যে নেই। আবু বকর (রা) তাঁদের দু'জনের মধ্যে আলোচিত বিষয়টি গোপন রাখার অনুরোধ করে তাঁকে বিদায় দিলেন।

এভাবে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে মতামত নেওয়া শেষ হলে তিনি উসমান ইবন আফ্‌ফানকে ডেকে ডিক্‌টেশন দিলেন ঃ 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটা আবু বকর ইবন আবী কুহাফার পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি অঙ্গীকার। আম্মা বাদ'– এতটুকু বলার পর তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তারপর 'উসমান ইবন আফ্‌ফান নিজেই সংযোজন করেন– 'আমি তোমাদের জন্য 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে খলীফা মনোনীত করলাম এবং এ ব্যাপারে তোমাদের কল্যাণ চেষ্টায় কোন ত্রুটি করি নাই।' অতঃপর আবু বকর সংজ্ঞা ফিরে পান। লিখিত অংশটুকু তাঁকে পড়ে শোনান হলো।' সবটুকু শুনে তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে ওঠেন এবং বলেন ঃ আমার ভয় হচ্ছিল, আমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মারা গেলে লোকেরা মতভেদ সৃষ্টি করবে। 'উসমানকে লক্ষ্য করে তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে আপনাকে কল্যাণ দান করুন।

তাবারী বলেন ঃ অতঃপর আবু বকর লোকদের দিকে তাকালেন। তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতু উমাইস তখন তাঁকে ধরে রেখেছিলেন। সমবেত লোকদের তিনি বলেন ঃ 'যে ব্যক্তিকে আমি আপনাদের জন্য মনোনীত করে যাচ্ছি তাঁর প্রতি কি আপনারা সন্তুষ্ট? আল্লাহর কসম, মানুষের মতামত নিতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আমার কোন নিকট আত্মীয়কে এ পদে বহাল করিনি। আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে আপনাদের খলীফা মনোনীত করেছি। আপনারা তাঁর কথা শুনুন, তাঁর আনুগত্য করুন।' এভাবে 'উমারের (রা) খিলাফত শুরু হয় হিঃ ১৩ সনের ২২ জামাদিউস সানী মুতাবিক ১৩ আগস্ট ৬৩৪ খৃঃ।

হযরত 'উমারের রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা সম্ভব নয়। দশ বছরের স্বল্প সময়ে গোটা বাইজান্টাইন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটান। তাঁর

যুগে বিভিন্ন অঞ্চলসহ মোট ১০৩৬টি শহর বিজিত হয়। ইসলামী হুকুমাতের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা মূলতঃ তাঁর যুগেই হয়। সরকার বা রাষ্ট্রের সকল শাখা তাঁর যুগেই আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর শাসন ও ইনসাফের কথা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে কিংবদন্তীর মত ছড়িয়ে আছে।

হযরত 'উমার প্রথম খলীফা যিনি 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি লাভ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম হিজরী সন প্রবর্তন করেন, তারাবীর নামায জামাআতে পড়ার ব্যবস্থা করেন, জন শাসনের জন্য দুর্রা বা ছড়ি ব্যবহার করেন, মদপানে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন, বহু রাজ্য জয় করেন, নগর পত্তন করেন, সেনাবাহিনীর স্তরভেদ ও বিভিন্ন ব্যাটালিয়ান নির্দিষ্ট করেন, জাতীয় রেজিস্টার বা নাগরিক তালিকা তৈরী করেন, কাযী নিয়োগ করেন এবং রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেন।

'উমার (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) অন্যতম কাতিব। নিজ কন্যা হযরত হাফসাকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বকরের (রা) মন্ত্রী ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ও পরে ব্যবসা ছিল তাঁর জীবিকার উপায়। খিলাফতের গুরুদায়িত্ব কাঁধে পড়ার পরও কয়েক বছর পর্যন্ত ব্যবসা চালিয়ে যান। কিন্তু পরে তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালে হযরত আলী (রা) সহ উঁচু পর্যায়ের সাহাবীরা পরামর্শ করে বাইতুল মাল থেকে বাৎসরিক মাত্র আট শ' দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন। হিজরী ১৫ সনে বাইতুল মাল থেকে অন্য লোকদের ভাতা নির্ধারিত হলে বিশিষ্ট সাহাবীদের ভাতার সমান তাঁরও ভাতা ধার্য করা হয় পাঁচ হাজার দিরহাম।

বাইতুল মালের অর্থের ব্যাপারে হযরত 'উমারের (রা) দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইয়াতিমের অর্থের মত। ইয়াতিমের অভিভাবক যেমন ইয়াতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে। ইয়াতিমের ও নিজের জন্য প্রয়োজন মত খরচ করতে পারে কিন্তু অপচয় করতে পারে না। প্রয়োজন না হলে ইয়াতিমের সম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে শুধু হিফাজত করে এবং ইয়াতিম বড় হলে তাকে তার সম্পদ ফিরিয়ে দেয়। বাইতুল মালের প্রতি 'উমারের (রা) এ দৃষ্টিভঙ্গিই সর্বদা তাঁর কর্ম ও আচরণে ফুটে উঠেছে।

হযরত 'উমার সব সময় একটি দুর্রা বা ছড়ি হাতে নিয়ে চলতেন। শয়তানও তাঁকে দেখে পালাতো। (তাজকিরাতুল হুফফাজ) তাই বলে তিনি অত্যাচারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কঠোর ন্যায় বিচারক। মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন, মানুষও তাঁকে ভালোবাসতো। তাঁর প্রজাপালনের বহু কাহিনী ইতিহাসে পাওয়া যায়।

হযরত ফারুকে আযমের ফজীলাত ও মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে এত বেশী ইঙ্গিত ও প্রকাশ্য বাণী রয়েছে যে, সংক্ষিপ্ত কোন প্রবন্ধে তা প্রকাশ করা যাবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) নিকট তাঁর স্থান অতি উচ্চে। এজন্য বলা হয়েছে, 'উমারের সব মতের সমর্থনেই সর্বদা কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।' হযরত আলী (রা) মন্তব্য করেছেন ঃ 'খাইরুল উম্মাতি বা'দা নাবিয়্যিহা আবু বকর সুম্মা 'উমার—নবীর (সা) পর উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি আবু বকর, তারপর 'উমার।' হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন ঃ 'উমারের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের বিজয়। তাঁর হিজরাত আল্লাহর

সাহায্য এবং তাঁর খিলাফত আল্লাহর রহমত।' 'উমারের যাবতীয় গুণাবলী লক্ষ্য করেই রাসূলে করীম (সা) বলেছিলেন ঃ 'লাও কানা বা'দী নাবিয়্যুন লাকানা 'উমার– আমার পরে কেউ নবী হলে 'উমারই হতো।' কারণ তাঁর মধ্যে ছিল নবীদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য।

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রে 'উমারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি আরবী কবিতা পঠন-পাঠন ও সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। আরবী ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ; তাঁর সামনে ভাষার ব্যাপারে কেউ ভুল করলে শাসিয়ে দিতেন। বিশুদ্ধভাবে আরবী ভাষা শিক্ষা করাকে তিনি দ্বীনের অঙ্গ বলে বিশ্বাস করতেন। আল্লামা জাহাবী *'তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 'উমার ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, একই হাদীস বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে বর্ণনার প্রতি তিনি তাকিদ দেন।

প্রখ্যাত সাহাবী মুগীরা ইবন শু'বার (রা) অগ্নি উপাসক দাস আবু লু'লু ফিরোজ ফজরের নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় এই মহান খলীফাকে ছুরিকাঘাত করে। আহত হওয়ার তৃতীয় দিনে হিজরী ২৩ সনের ২৭ জিলহজ্জ বুধবার তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে আলী, উসমান, আবদুর রহমান ইবন আউফ, সা'দ, যুবাইর ও তালহা (রা)– এ ছয় জন বিশিষ্ট সাহাবীর ওপর তাদের মধ্য থেকে কোন একজনকে খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে যান। হযরত সুহায়িব (রা) জানাযার নামায পড়ান। রওজায়ে নববীর মধ্যে হযরত সিদ্দীকে আকবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর খিলাফতকাল দশ বছর ছয় মাস চার দিন।

'উসমান ইবন 'আফ্‌ফান (রা)

নাম 'উসমান, কুনিয়াত আবু 'আমর, আবু আবদিল্লাহ, আবু লায়লা এবং লকব যুন-নূরাইন। (তাবাকাত ৩/৫৩, তাহজীবুত তাহজীব) পিতা 'আফ্‌ফান, মাতা আরওরা বিনতু কুরাইয। কুরাইশ বংশের উমাইয়্যা শাখার সন্তান। তাঁর উর্ধ পুরুষ 'আবদে মান্নাফে গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদার তৃতীয় খলীফা। তাঁর নানী বায়দা বিনতু আবদিল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু। জন্ম হস্তীসনের ছ'বছর পরে ৫৭৬ খৃষ্টাব্দে। (আল-ইসতিয়াব) এ হিসাবে রাসূলে করীম (সা) থেকে তিনি ছয় বছর ছোট। তবে তাঁর জন্মসন সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। ফলে শাহাদাতের সময় তাঁর সঠিক বয়স কত ছিল সে সম্পর্কে অনুরূপ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন বর্ণনা মতে, তাঁর জন্ম হয় তায়েফে। (ফিত্‌নাতুল কুবরা, ডঃ তোহা হুসাইন)

হযরত 'উসমান (রা) ছিলেন মধ্যমাকৃতির সুঠাম দেহের অধিকারী। মাংসহীন গণ্ডদেশ, ঘন দাড়ি, উজ্জ্বল ফর্সা, ঘন কেশ, বুক ও কোমর চওড়া, কান পর্যন্ত ঝোলানো যুলফী, পায়ের নলা মোটা, পশম ভরা লম্বা বাহু, মুখে বসন্তের দাগ, মেহেদী রঙের দাড়ি এবং স্বর্ণখচিত দাঁত।

হযরত 'উসমানের জীবনের প্রাথমিক অবস্থা অন্যান্য সাহাবীর মত জাহিলী যুগের অন্ধকারেই রয়ে গেছে। তাঁর ইসলামপূর্ব জীবন এমনভাবে বিলীন হয়েছে যেন ইসলামের সাথেই তাঁর জন্ম। ইসলামপূর্ব জীবনের বিশেষ কোন তথ্য ঐতিহাসিকরা আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারেননি।

হযরত 'উসমান ছিলেন কুরাইশ বংশের অন্যতম কুষ্টিবিদ্যা বিশারদ। কুরাইশদের প্রাচীন ইতিহাসেও ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। তাঁর প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, সৌজন্য ও লৌকিকতাবোধ ইত্যাদি গুণাবলীর জন্য সব সময় তাঁর পাশে মানুষের ভীড় জমে থাকতো। জাহিলী যুগের কোন অপকর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। লজ্জা ও প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাঁর মহান চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যৌবনে তিনি অন্যান্য অভিজাত কুরাইশদের মত ব্যবসা শুরু করেন। সীমাহীন সততা ও বিশ্বস্ততার গুণে ব্যবসায়ে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। মক্কার সমাজে একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী হিসাবে 'গনী' উপাধি লাভ করেন।

হযরত 'উসমানকে 'আস-সাবেকুনাল আওয়ালুন' (প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী), 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারা' এবং সেই ছ'জন শ্রেষ্ঠ সাহাবীর মধ্যে গণ্য করা হয় যাঁদের প্রতি রাসূলে করীম (সা) আমরণ খুশী ছিলেন। আবু বকর সিদ্দীকের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরই তাবলীগ ও উৎসাহে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। (সীরাতে ইবন হিশাম) মক্কার আরো অনেক নেতৃবৃন্দের আচরণের বিপরীত হযরত 'উসমান রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াতের সূচনা পর্বেই তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেন এবং আজীবন জান-মাল ও সহায়

সম্পত্তি দ্বারা মুসলমানদের কল্যাণব্রতী ছিলেন। হযরত 'উসমান বলেন ঃ 'আমি ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ।' (উসুদুল গাবা) ইবন ইসহাকের মতে, আবু বকর, আলী এবং যায়িদ বিন হারিসের পরে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি হযরত উসমান।

হযরত 'উসমানের ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সীরাত লেখক ও মুহাদ্দীসগণ যেসব বর্ণনা দিয়েছেন তার সারকথা নিম্নরূপ ঃ

কেউ কেউ বলেন, তাঁর খালা সু'দা ছিলেন সে যুগের একজন বিশিষ্ট 'কাহিন' বা ভবিষ্যদ্বক্তা। তিনি নবী করীম (সা) সম্পর্কে উসমানকে কিছু কথা বলেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য উৎসাহ দেন। তারই উৎসাহে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। (আল ফিত্‌নাতুল কুবরা) পক্ষান্তরে ইবন সা'দ সহ আরো অনেকে বর্ণনা করেন ঃ হযরত উসমান সিরিয়া সফরে ছিলেন। যখন তিনি 'মুয়ান ও যারকার' মধ্যবর্তী স্থানে বিশ্রাম করছিলেন তখন তন্দ্রালু অবস্থায় এক আহবানকারীকে বলতে শুনলেন ঃ ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা, তাড়াতাড়ি কর। আহমাদ নামের রাসূল মক্কায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। মক্কায় ফিরে এসে শুনতে পেলেন ব্যাপারটি সত্য। অতঃপর আবু বকরের আহবানে ইসলাম গ্রহণ করেন। (তাবাকাত ঃ ৩/৫৫)

হযরত 'উসমান যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁর বয়স তিরিশের উপরে। ইসলামপূর্ব যুগেও আবু বকরের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রায় প্রতিদিনই তাঁর আবু বকরের বাড়ীতে যাতায়াত ছিল। একদিন হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সামনে ইসলাম পেশ করলেন। ঘটনাক্রমে রাসূল (সা)ও তখন সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ 'উসমান, জান্নাতের প্রবেশকে মেনে নাও। আমি তোমাদের এবং আল্লাহর সকল মাখলুকের প্রতি তাঁর রাসূল হিসেবে এসেছি। একথা শুনার সাথে সাথে তিনি ইসলাম কবুল করেন। হযরত 'উসমানের ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর খালা সু'দা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি কাসীদা রচনা করেছিলেন।

হযরত 'উসমানের সহোদরা আমীনা, বৈপিত্রীয় ভাই বোন ওয়ালীদ, খালিদ, আম্মারা, উম্মু কুলসুম সবাই মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁদের পিতা উকবা ইবন আবী মুয়ীত। দারু কুত্‌নী বর্ণনা করেছেন, উম্মু কুলসুম প্রথম পর্বের একজন মুহাজির। বলা হয়েছে তিনিই প্রথম কুরাইশ বধূ যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেন। হযরত 'উসমানের অন্য ভাই-বোন মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের একজন সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ইসলামের শত্রুদের লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। তাঁর চাচা হাকাম ইবন আবিল 'আস তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে বেদম মার দিত। সে বলতো, একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তুমি আমাদের বাপ-দাদার মুখে কালি দিয়েছ। এ ধর্ম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়া হবে না। এতে হযরত 'উসমানের ঈমান একটুও টলেনি। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের যা ইচ্ছে কর, এ দ্বীন আমি কক্ষণো ছাড়তে পারবো না। (তাবাকাত ঃ ৩/৫৫)

হযরত উসমান ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ কন্যা 'রুকাইয়্যাকে' তাঁর সাথে বিয়ে দেন। হিজরী দ্বিতীয় সনে মদীনায় রুকাইয়্যার ইনতিকাল হলে রাসূলুল্লাহ

(সা) তাঁর দ্বিতীয় কন্যা উম্মু কুলসুমকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। এ কারণে তিনি 'যুন-নূরাইন'— দুই জ্যোতির অধিকারী উপাধি লাভ করেন।

রুকাইয়্যা ছিলেন হযরত খাদীজার (রা) গর্ভজাত সন্তান। তাঁর প্রথম শাদী হয় উতবা ইবন আবী লাহাবের সাথে এবং উম্মু কুলসুমের শাদী হয় আবু লাহাবের দ্বিতীয় পুত্র 'উতাইবার সাথে। আবু লাহাব ছিল আল্লাহর নবীর কট্টর দুশমন। পবিত্র কুরআনের সূরা লাহাব নাযিলের পর আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মু জামীল (হাম্মা লাতাল হাতাব) তাদের পুত্রদ্বয়কে নির্দেশ দিল মুহাম্মাদের কন্যাদ্বয়কে তালাক দেওয়ার জন্য। তারা তালাক দিল। অবশ্য ইমাম সুয়ূতী মনে করেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই রুকাইয়্যার সাথে উসমানের শাদী হয়। উপরোক্ত ঘটনার আলোকে সুয়ূতীর মতটি গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে মক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথম যে দলটি হাবশায় হিজরাত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'উসমান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যাও ছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ 'হাবশার মাটিতে প্রথম হিজরাতকারী উসমান ও তাঁর স্ত্রী নবী দুহিতা রুকাইয়্যা।' রাসূল (সা) দীর্ঘদিন তাঁদের কোন খোঁজ-খবর না পেয়ে ভীষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। সেই সময় এক কুরাইশ মহিলা হাবশা থেকে মক্কায় এলো। তার কাছে রাসূল (সা) তাঁদের দু'জনের কুশল জিজ্ঞেস করেন। সে সংবাদ দেয়, 'আমি দেখেছি, রুকাইয়্যা গাধার ওপর সওয়ার হয়ে আছে এবং 'উসমান গাধাটি তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করেন ঃ আল্লাহ তার সহায় হোন। লূতের (আ) পর 'উসমান আল্লাহর রাস্তায় পরিবার পরিজনসহ প্রথম হিজরাতকারী। (আল-ইসাবা) হাবশা অবস্থানকালে তাঁদের সন্তান আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে এবং এ ছেলের নাম অনুসারে তাঁর কুনিয়াত হয় আবু আবদিল্লাহ। হিজরী ৪র্থ সনে আবদুল্লাহ মারা যান। রুকাইয়্যার সাথে তাঁর দাম্পত্য জীবন খুব সুখের হয়েছিল। লোকেরা বলাবলি করতো কেউ যদি সর্বোত্তম জুটি দেখতে চায়, সে যেন উসমান ও রুকাইয়্যাকে দেখে।

হযরত উসমান বেশ কিছু দিন হাবশায় অবস্থান করেন। অতঃপর মক্কায় ফিরে আসেন এই গুজব শুনে যে, মক্কার নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পর আবার তিনি মদীনায় হিজরত করেন। এভাবে তিনি 'যুল হিজরাতাইন'— দুই হিজরাতের অধিকারী হন।

একমাত্র বদর ছাড়া সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূল (সা) যখন বদর যুদ্ধে রওয়ানা হন, হযরত রুকাইয়্যা তখন রোগ শয্যায়। রাসূলের (সা) নির্দেশে হযরত 'উসমান পীড়িত স্ত্রীর সেবার জন্য মদীনায় থেকে যান। বদরের বিজয়ের খবর যেদিন মদীনায় এসে পৌঁছুলো সেদিনই হযরত রুকাইয়্যা ইনতিকাল করেন। রাসূল (সা) উসমানের জন্য বদরের যোদ্ধাদের মত সওয়াব ও গনীমতের অংশ ঘোষণা করেন। (তাবাকাত ঃ ৩/৫৬) এ হিসেবে পরোক্ষভাবে তিনিও বদরী সাহাবী।

রুকাইয়্যার ইনতিকালের পর রাসূল (সা) রুকাইয়্যার ছোট বোন উম্মু কুলসুমকে উসমানের সাথে বিয়ে দেন হিজরী তৃতীয় সনে। একটি বর্ণনায় জানা যায়, আল্লাহর নির্দেশেই রাসূল (সা) উম্মু কুলসুমকে 'উসমানের সাথে বিয়ে দেন। হিজরী নবম সনে

উম্মু কুলসুমও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। উম্মু কুলসুমের মৃত্যুর পর রাসূল (সা) বলেন ঃ 'আমার যদি তৃতীয় কোন মেয়ে থাকতো তাকেও আমি 'উসমানের সাথে বিয়ে দিতাম।' (হায়াতু 'উসমান ঃ রিজা মিসরী)

হযরত উসমান উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় কিছু যোদ্ধাদের মত রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অটল থাকতে পারেননি। অধিকাংশ মুজাহিদদের সাথে তিনিও ময়দান ছেড়ে চলে যান। অবশ্য আল্লাহ্ তায়ালা তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী সকল যুদ্ধেই অন্যসব বিশিষ্ট সাহাবীদের মত অংশগ্রহণ করেছেন।

রাসূল (সা) তাবুক অভিযানের প্রস্তুতির ঘোষণা দিলেন। মক্কা ও অন্যান্য আরব গোত্রসমূহেও ঘোষণা দিলেন এ অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য। ইসলামী ফৌজের সংগঠন ও ব্যয় নির্বাহের সাহায্যের আবেদন জানালেন। সাহাবীরা ব্যাপকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবু বকর তাঁর সকল অর্থ রাসূলের হাতে তুলে দিলেন। 'উমার তাঁর মোট অর্থের অর্ধেক নিয়ে হাজির হলেন। আর এ যুদ্ধের এক তৃতীয়াংশ সৈন্যের যাবতীয় ব্যয়ভার উসমান নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি সাড়ে নয় শ' উট ও পঞ্চাশটি ঘোড়া সরবরাহ করেন। ইবন ইসহাক বলেন, তাবুকের বাহিনীর পেছনে হযরত উসমান এত বিপুল অর্থ ব্যয় করেন যে, তাঁর সমপরিমাণ আর কেউ ব্যয় করতে পারেনি। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাবুকের প্রস্তুতির জন্য উসমান কোরচে করে এক হাজার দীনার নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহর (সা) কোলে ঢেলে দেন। রাসূল (সা) খুশীতে দীনারগুলি উল্টে পাল্টে দেখেন এবং বলেন ঃ 'আজ থেকে 'উসমান যা কিছুই করবে, কোন কিছুই তার জন্য ক্ষতিকর হবেনা।' এভাবে অধিকাংশ যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় তিনি প্রাণ খুলে চাঁদা দিতেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, তাবুকের যুদ্ধে তাঁর দানে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (সা) তাঁর আগে-পিছের সকল গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করেন এবং তাঁকে জান্নাতের ওয়াদা করেন। (আল-ফিতনাতুল কুবরা)

হুদাইবিয়ার ঘটনা। রাসূল (সা) 'উমারকে ডেকে বললেন ঃ তুমি মক্কায় যাও। মক্কার নেতৃবৃন্দকে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য অবহিত কর। 'উমার বিনীতভাবে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরাইশদের কাছ থেকে আমার জীবনের আশঙ্কা করছি। আপনি জানেন তাদের সাথে আমার দুমশনি কতখানি। আমি মনে করি উসমানই এ কাজের উপযুক্ত। রাসূল (সা) 'উসমানকে ডাকলেন। আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিকট এ পয়গামসহ উসমানকে পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধ নয়, বরং 'বাইতুল্লাহর' যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছি।

রাসূলুল্লাহর (সা) পয়গাম নিয়ে উসমান মক্কায় পৌঁছলেন। সর্ব প্রথম আবান ইবন সাঈদ ইবন আস-এর সাথে তাঁর দেখা হয়। আবান তাঁকে নিরাপত্তা দেন। আবানকে সঙ্গে করে তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করে রাসূলুল্লাহর (সা) পয়গাম পৌঁছে দেন। তারা 'উসমানকে বলে, তুমি ইচ্ছে করলে 'তাওয়াফ' করতে পার। কিন্তু 'উসমান তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন. আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) যতক্ষণ 'তাওয়াফ' না করেন, আমি 'তাওয়াফ' করতে পারিনে। কুরাইশরা তাঁর এ কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে আটক করে।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, 'উসমানকে তারা তিনদিন আটক করে রাখে। এ দিকে হুদাইবিয়ায় মুসলিম শিবিরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে উসমানকে শহীদ করা হয়েছে। রাসূল (সা) ঘোষণা করলেন 'উসমানের রক্তের বদলা না নিয়ে আমরা প্রত্যাবর্তন করবো না। রাসূল (সা) নিজের ডান হাতটি বাম হাতের ওপরে রেখে বলেন ঃ হে আল্লাহ, এ বাইয়াত 'উসমানের পক্ষ থেকে। সে তোমার ও তোমার রাসূলের কাজে মক্কায় গেছে। হযরত 'উসমান মক্কা থেকে ফিরে এসে বাইয়াতের কথা জানতে পারেন। তিনি নিজেও রাসূলুল্লাহর হাতে বাইয়াত করেন। ইতিহাসে এ ঘটনা বাইয়াতু রিদওয়ান, বাইয়াতুশ শাজারা ইত্যাদি নামে খ্যাত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এ বাইয়াতের প্রশংসা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর যখন আবু বকরের হাতে বাইয়াত নেওয়া হচ্ছিল উসমান সংবাদ পেয়ে খুব দ্রুত সেখানে যান এবং আবু বকরের হাতে বাইয়াত করেন। মৃত্যুকালে আবু বকর 'উমারকে (রা) খলীফা মনোনীত করে যে অঙ্গীকার পত্রটি লিখে যান, তার লিখক ছিলেন 'উসমান। খলীফা 'উমারের (রা) হাতে তিনিই সর্বপ্রথম বাইয়াত করেন।

হযরত 'উমার (রা) ছুরিকাহত হয়ে যখন মৃত্যু শয্যায়, তাঁর কাছে দাবী করা হলো পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য। কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ করে বললেন ঃ আমি যদি খলিফা বানিয়ে যাই, তবে তার দৃষ্টান্ত অবশ্য আছে, যেমনটি করেছেন আমার থেকেও এক উত্তম ব্যক্তি, অর্থাৎ আবু বকর (রা) আর যদি না-ও বানিয়ে যাই তারও দৃষ্টান্ত আছে। যেমনটি করেছিলেন আমার থেকেও এক উত্তম ব্যক্তি, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)। তিনি আরো বললেন ঃ আবু 'উবাইদা জীবিত থাকলে তাকেই খলীফা বানিয়ে যেতাম। আমার রব আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আপনার নবীকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি এই উম্মাতের আমীন বা পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি। যদি আবু হুজাইফার আযাদকৃত দাস সালেমও আজ জীবিত থাকতো, তাকেও খলীফা বানিয়ে যেতে পারতাম, আমার রব জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আপনার নবীকে আমি বলতে শুনেছি, সালেম বড় আল্লাহ-প্রেমিক। এক ব্যক্তি তখন বললো, আবদুল্লাহ ইবন উমার তো আছে। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুন। কসম আল্লাহর, আমি আল্লাহর কাছে এমনটি চাই না।... খিলাফতের এ দায়িত্বের মধ্যে যদি ভালো কিছু থাকে, আমার বংশের থেকে আমি তা লাভ করেছি। আর যদি তা মন্দ হয় তাও আমরা পেয়েছি। উমারের বংশের এক ব্যক্তির হিসাব নিকাশই এজন্য যথেষ্ট। আমি আমার নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, আমার পরিবারবর্গকে মাহরূম করেছি। কোন পুরস্কারও নয় এবং কোন তিরস্কারও নয় এমনভাবে যদি আমি কোন মতে রেহাই পাই, নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো।

যখন একই কথা তাঁর কাছে আবার বলা হলো, তিনি আলীর (রা) দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তোমাদেরকে হকের ওপর পরিচালনার তিনিই যোগ্য। তবে আমি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় এ দায়িত্ব বহন করতে রাজী নই। তোমাদের সামনে এই একটি দল আছেন, যাঁদের সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন, তাঁরা জান্নাতের অধিবাসী। তাঁরা হলেন–

আবদে মান্নাফের দুই পুত্র আলী ও উসমান, রাসূলের (সা) দুই মাতুল আবদুর রাহমান ও সা'দ, রাসূলের (সা) হাওয়ারী ও ফুফাতো ভাই যুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং তালহা। তাঁদের যে কোন একজনকে খলীফা নির্বাচিত করবে। তাঁদের যে কেউ খলীফা নির্বাচিত হলে তোমরা তাঁকে সাহায্য করবে, তাঁর সাথে সুন্দর আচরণ করবে। তিনি যদি তোমাদের কারো ওপর কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন, যথাযথভাবে তোমরা তা পালন করবে।

হযরত 'উমার উল্লেখিত দলটির সদস্যদের ডেকে বললেন, আপনাদের ব্যাপারে আমি ভেবে দেখেছি। আপনারা জনগণের নেতা ও পরিচালক। খিলাফতের দায়িত্বটি আপনাদের মধ্যেই থাকা উচিত। আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় রাসূল (সা) ইনতিকাল করেছেন। আপনারা ঠিক থাকলে জনগণের ব্যাপারে আমার কোন ভয় নেই। তবে আপনাদের পারস্পরিক বিবাদকে আমি ভয় করি। জনগণ তাতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বে।

তারপর তিনি নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তিন দিন তিন রাত্রি। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে বললেন, আমাকে কবরে শায়িত করার পর এই দলটিকে একত্র করবে এবং তাঁরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করবে। সুহায়িবকে বললেন ঃ তিন দিন তুমি নামাযের জামায়াতের ইমামতি করবে। আলী, উসমান, সা'দ, 'আবদুর রাহমান, যুবাইর ও তালহার কাছে যাবে, যদি তালহা মদীনায় থাকে (তালহা তখন মদীনার বাইরে ছিলেন)। তাদেরকে এক স্থানে সমবেত করবে। আবদুল্লাহ ইবন উমারকেও হাজির করবে। তবে খিলাফতের কোন হক তার নেই। তাঁদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। তাঁদের পাঁচজন যদি কোন একজনের ব্যাপারে একমত হয় এবং একজন দ্বিমত পোষণ করে, তরবারি দিয়ে তার কল্লা কেটে ফেলবে। আর যদি চারজন একমত হয় এবং দু'জন অস্বীকার করে, তবে সে দু'জনের কল্লা উড়িয়ে দেবে। আর যদি তিনজন করে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়, আবদুল্লাহ বিন 'উমার যে পক্ষ সমর্থন করবে তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করবে। অন্য পক্ষ যদি আবদুল্লাহ বিন 'উমারের সিদ্ধান্ত না মানে, তাহলে আবদুর রাহমান বিন 'আউফ যে দিকে থাকবে তোমরা সে'দিকে যাবে। বিরোধীরা যদি জনগণের সিদ্ধান্ত না মানে তাহলে তাদেরকে মানাতে বাধ্য করবে।

হযরত 'উমারকে দাফন করার পর মিকদাদ বিন আসওয়াদ শূরার সদস্যদের মিসওয়ার ইবনুল মাখরামা মতান্তরে হযরত আয়িশার হুজরায় একত্র করলেন। তাঁরা পাঁচজন। তালহা তখনো মদীনার বাইরে। তাঁদের সাথে যুক্ত হলেন আবদুল্লাহ বিন 'উমার। বাড়ীর দরজায় প্রহরী নিয়োগ করা হলো আবু তালহাকে। বিয়ষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও তুমুল বাক-বিতণ্ডা হলো। এক পর্যায়ে আবদুর রাহমান বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে তার দাবী ত্যাগ করতে পার এবং তোমাদের উত্তম বক্তিকে নির্বাচনের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করতে পার? আমি আমার খিলাফতের দাবী ত্যাগ করছি। হযরত 'উসমান সর্বপ্রথম এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে আবদুর রাহমানের হাতে তাঁর ক্ষমতা ন্যস্ত করলেন। তারপর অন্য সকলে তাঁর অনুসরণ করলেন। এভাবে খলীফা নির্বাচনের গোটা দায়িত্বটি আবদুর রাহমানের ওপর এসে বর্তায়।

হযরত আবদুর রাহমান দিনরাত রাসূলুল্লাহর (সা) অন্যসব সাহাবী, মদীনায় অবস্থানরত সকল সেনা-অফিসার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গসহ সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করলেন। কখনো ব্যক্তিগতভাবে, কখনো সম্মিলিতভাবে। প্রায় সকলেই হযরত উসমানের পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করলেন।

যেদিন সকালে 'উমার-নির্ধারিত সময় সীমা শেষ হবে, সে রাতে আবদুর রাহমান এলেন মাখরামার বাড়ীতে। তিনি প্রথমে যুবাইর ও সা'দকে ডেকে মসজিদে নববীর সুফ্‌ফায় বসে এক এক করে তাঁদের সাথে কথা বললেন, এভাবে 'উসমান ও আলীর সাথেও সুবহে সাদিক পর্যন্ত একান্তে আলাপ করেন।

এদিকে মসজিদে নববী লোকে পরিপূর্ণ। শেষ সিদ্ধান্তটি শোনার জন্য সবাই ব্যাকুল। ফজরের নামাযের পর সমবেত মদীনাবাসীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত এক ভাষণের পর আবদুর রাহমান খলীফা হিসেবে হযরত 'উসমানের নামটি ঘোষণা করেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত করেন। তারপরই হযরত আলীও বাইয়াত করেন। অতঃপর সমবেত জনমণ্ডলী হযরত 'উসমানের হাতে বাইয়াত করেন। হিজরী ২৪ সনের ১লা মুহাররম সোমবার সকালে তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। (তারীখুল উম্মাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ, খিদরী বেক)

হযরত 'উসমান অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। খিলাফতের প্রথম পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ শোনা যায়না। তবে শেষের দিকে বসরা, কুফা, মিসর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। মূলতঃ এ অসন্তোষ সৃষ্টির পশ্চাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে পরাজিত ইয়াহুদী শক্তি। ধীরে ধীরে তারা সংঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং মদীনায় খলীফার বাসভবন ঘেরাও করে। এই বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিল না। তারা খলীফাকে হত্যার হুমকি দিয়ে পদত্যাগ দাবী করে। খলীফার বাসগৃহের খাদ্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। মসজিদে নামায আদায়ে বাধা সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে তারা খলীফার বাড়ীতে ঢুকে পড়ে এবং রোযা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতরত বয়োবৃদ্ধ খলীফাকে হত্যা করে। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) এ ঘটনা সংঘটিত হয় হিজরী ৩৫ সনের ১৮ জিলহজ্জ, শুক্রবার আসর নামাযের পর। রাসূলের (সা) ওফাত ও হযরত উসমানের শাহাদাতের মধ্যে ২৫ বছরের ব্যবধান। বারো দিন কম বারো বছর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

জান্নাতুল বাকীর 'হাশশে কাওকাব' নামক অংশে তাঁকে দাফন করা হয়। মাগরিব ও ঈশার মাঝামাঝি সময়ে তাঁর দাফন কার্য সমাধা হয়। যুবাইর ইবন মুতঈম (রা) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। কাবুল থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিশাল খিলাফতের কর্ণধারের জানাযায় মাত্র সত্তরজন লোক অংশগ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স কত হয়েছিল সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ৮২ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ছিল। (আল-ফিত্‌নাতুল কুবরা)

খলীফা উসমান বিদ্রোহীদের দ্বারা ঘেরাও হওয়ার পর ইচ্ছা করলে তাদের নির্মূল করতে পারতেন। অন্য সাহাবীরা সেজন্য প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু হযরত উসমান নিজের

জন্য কোন মুসলমানের রক্ত ঝরাতে চাননি। তিনি চাননি মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাতের সূচনাকারী হতে। প্রকৃতপক্ষে এমন এক নাজুক মুহূর্তে হযরত উসমান (রা) যে কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা একজন খলীফা ও একজন বাদশার মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্ট করে তোলে। তাঁর স্থলে যদি কোন বাদশাহ্ হতো, নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে যেকোন কৌশল প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করতো না। তাতে যত ক্ষতি বা ধ্বংসই হোক না কেন। কিন্তু তিনি ছিলেন খলীফা রাশেদ। নিজের জীবন দেওয়াকে তুচ্ছ মনে করেছেন। তবুও যেন এমন সম্মান বিনষ্ট না হতে পারে যা একজন মুসলমানের সবকিছু থেকে প্রিয় হওয়া উচিত।' (খিলাফত ও মুলুকিয়্যাত ঃ আবুল আ'লা মওদূদী)

ইসলামের জন্য হযরত 'উসমানের অবদান মুসলিম জাতি কোন দিন ভুলতে পারবে না। ইসলামের সেই সংকটকালে আল্লাহর রাস্তায় তিনি যেভাবে খরচ করেছেন, অন্য কোন ধনাঢ্য মুসলমানের মধ্যে তার কোন নজীর নেই। তিনি বিস্তর অর্থের বিনিময়ে ইয়াহুদী মালীকানাধীন 'বীরে রুমা'– কূপটি খরীদ করে মদীনার মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করেন। বিনিময়ে রাসূল (স) তাঁকে জান্নাতের অঙ্গীকার করেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! যিনি একদিন 'বীরে রুমা' ওয়াক্ফ করে মদীনাবাসীদের পানি-কষ্ট দূর করেছিলেন, তাঁর বাড়ীতেই সেই কূপের পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘেরাও অবস্থায় একদিন তিনি জানালা দিয়ে মাথা বের করে মদীনাবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে আমিই বীরে রুমা খরীদ করে সর্বসাধারণের জন্য ওয়াক্ফ করেছি। আজ সেই কূপের পানি থেকেই তোমরা আমাকে বঞ্চিত করছো। আমি আজ পানির অভাবে ময়লা পানি দিয়ে ইফতার করছি।

হযরত উসমানের ফজীলাত ও মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (সা) হতে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সারকথা ঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর বিশেষ স্থান ছিল। রাসূল (সা) বার বার তাঁকে জান্নাতের খোশখবর দিয়েছেন। নবী (সা) বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবে উসমান।' (তিরমিযী) হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার বলেন ঃ নবীর (সা) সময়ে মুসলমানরা আবু বকর, 'উমার ও উসমানকে সকলের থেকে অধিক মর্যাদাবান মনে করতেন। তা ছাড়া অন্য কোন সাহাবীকে বিশেষ কোন মর্যাদা দেওয়া হতো না।

হযরত উসমান (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে 'কাতিবে অহী'– অহী লিখক ছিলেন। সিদ্দীকী ও ফারুকী যুগে ছিলেন পরামর্শদাতা। প্রতিবছরই তিনি হজ্জ আদায় করতেন। তবে যে বছর শহীদ হন, ঘেরাও থাকার কারণে হজ্জ আদায় করতে পারেননি। সারা বছরই রোযা রাখতেন। সারা রাত ইবাদতে কাটতো। এক রাকআতে একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন। রাতে কারও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতেন না। রাতে চাকরদের খিদমাত গ্রহণ করতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে উসমান সর্বাধিক লজ্জাশীল। তিনি আরো বলেছেন ঃ উসমানকে দেখে ফিরিশতারাও লজ্জা পায়। আত্মীয়-বন্ধুদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সদয়। তাঁর গুণাবলী ও মর্যাদা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে প্রকাশ করা যাবে না।

'আলী ইবন আবী তালিব (রা)

নাম আলী, লকব আসাদুল্লাহ, হায়দার ও মুরতাজা, কুনিয়াত আবুল হাসান ও আবু তুরাব। পিতা আবু তালিব আবদু মান্নাফ, মাতা ফাতিমা। পিতা-মাতা উভয়ে কুরাইশ বংশের হাশিমী শাখার সন্তান। আলী রাসূলুল্লাহর (সা) আপন চাচাতো ভাই।

রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম। আবু তালিব ছিলেন ছাপোষা মানুষ। চাচাকে একটু সাহায্য করার উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন আলীকে। এভাবে নবী পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে তিঁনি বেড়ে ওঠেন। রাসূল (সা) যখন নবুওয়াত লাভ করেন, আলীর বয়স তখন নয় থেকে এগারো বছরের মধ্যে। একদিন ঘরের মধ্যে দেখলেন, রাসূলে কারীম (সা) ও উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা) সিজদাবনত। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি? উত্তর পেলেন, এক আল্লাহর ইবাদাত করছি। তোমাকেও এর দাওয়াত দিচ্ছি। আলী তাঁর মুরব্বির দাওয়াত বিনা দ্বিধায় কবুল করেন। মুসলমান হয়ে যান। কুফর, শিরক ও জাহিলিয়্যাতের কোন অপকর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সর্ব প্রথম হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) নামায আদায় করেন। এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। অবশ্য আবু বকর, আলী ও যায়িদ বিন হারিসা—এ তিন জনের কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। (তাবাকাত ঃ ৩/২১) ইবন 'আব্বাস ও সালমান ফারেসীর (রা) বর্ণনা মতে, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার (রা) পর আলী (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে এ সম্পর্কে সবাই একমত যে, মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা, বয়স্ক আযাদ পুরুষদের মধ্যে আবু বকর, দাসদের মধ্যে যায়িদ বিন হারিসা ও কিশোরদের মধ্যে আলী (রা) প্রথম মুসলমান।

নবুওয়াতের তৃতীয় বছরে রাসূলে কারীম (সা) হুকুম দিলেন আলীকে, কিছু লোকের আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর। আবদুল মুত্তালিব খান্দানের সব মানুষ উপস্থিত হল। আহার পর্ব শেষ হলে রাসূল (সা) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি এমন এক জিনিস নিয়ে এসেছি, যা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য কল্যাণকর। আপনাদের মধ্যে কে আমার সঙ্গী হবে? সকলেই নিরব। হঠাৎ আলী (রা) বলে উঠলেন ঃ 'যদিও আমি অল্পবয়স্ক, চোখের রোগে আক্রান্ত, দুর্বল দেহ, আমি সাহায্য করবো আপনাকে।'

হিজরাতের সময় হল। অধিকাংশ মুসলমান মক্কা ছেড়ে মদীনা চলে গেছেন। রাসূলে কারীম (সা) আল্লাহর হুকুমের প্রতীক্ষায় আছেন। এ দিকে মক্কার ইসলাম বিরোধী শক্তি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাসূলে কারীমকে (সা) দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সা) এ খবর জানিয়ে দেন। তিনি মদীনায় হিজরাতের অনুমতি লাভ করেন। কাফিরদের সন্দেহ না হয়, এ জন্য আলীকে রাসূল (সা) নিজের বিছানায় ঘুমাবার নির্দেশ দেন এবং সিদ্দীকে আকবরকে সঙ্গে করে রাতের অন্ধকারে মদীনা রওয়ানা হন। আলী (রা) রাসূলে কারীমের (সা) চাদর মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে অত্যন্ত

আনন্দ সহকারে ঘুমালেন। তিনি জানতেন, এ অবস্থায় তার জীবন চলে যেতে পারে। কিন্তু তাঁর প্রত্যয় ছিল, এভাবে জীবন গেলে তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছু হবে না। সুবহে সাদিকের সময় মক্কার পাষণ্ডরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পেল, রাসূলে কারীমের (সা) স্থানে তাঁরই এক ভক্ত জীবন কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে শুয়ে আছে। তারা ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ তাআলা আলীকে (রা) হিফাজত করেন।

এ হিজরাত প্রসঙ্গে হযরত আলী (সা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা রওয়ানার পূর্বে আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি মক্কায় থেকে যাব এবং লোকদের যেসব আমানত তাঁর কাছে আছে তা ফেরত দেব। এ জন্যই তো তাঁকে 'আল-আমীন' বলা হতো। আমি তিনদিন মক্কায় থাকলাম। তারপর রাসূলুল্লাহর (সা) পথ ধরে মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়লাম। অবশেষে বনী 'আমর ইবন আওফ– যেখানে রাসূল (সা) অবস্থান করছিলেন, আমি উপস্থিত হলাম। কুলসুম ইবন হিদ্‌মের বাড়ীতে আমার আশ্রয় হল।' অন্য একটি বর্ণনায়, আলী (রা) রবীউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি কুবায় উপস্থিত হন। রাসূল (সা) তখনো কুবায় ছিলেন। (তাবাকাত ঃ ৩/২২)

মাদানী জীবনের সূচনাতে রাসূল (সা) যখন মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে 'মুয়াখাত' বা দ্বীনী-ভ্রাতৃ সম্পর্ক কায়েম করছিলেন, তিনি নিজের একটি হাত আলীর (রা) কাঁধে রেখে বলেছিলেন, 'আলী তুমি আমার ভাই। তুমি হবে আমার এবং আমি হব তোমার উত্তরাধিকারী।' (তাবাকাত ঃ ৩/২২) পরে রাসূল (সা) আলী ও সাহল বিন হুনাইফের মধ্যে ভ্রাতৃসম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন। (তাবাকাত ঃ ৩/২৩)

হিজরী দ্বিতীয় সনে হযরত আলী (রা) রাসূলে কারীমের (সা) জামাই হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়তমা কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমার (রা) সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

ইসলামের জন্য হযরত আলীর (রা) অবদান অবিস্মরণীয়। রাসূলে কারীমের (সা) যুগের সকল যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় তিনি দেন। এ কারণে হুজুর (সা) তাঁকে 'হায়দার' উপাধিসহ 'যুল-ফিকার' নামক একখানি তরবারি দান করেন।

একমাত্র তাবুক অভিযান ছাড়া সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। বদরে তাঁর সাদা পশমী রুমালের জন্য তিনি ছিলেন চিহ্নিত। কাতাদা থেকে বর্ণিত। বদরসহ প্রতিটি যুদ্ধে আলী ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পতাকাবাহী। (তাবাকাত ঃ ৩/২৩) উহুদে যখন অন্যসব মুজাহিদ পরাজিত হয়ে পলায়নরত ছিলেন, তখন যে ক'জন মুষ্টিমেয় সৈনিক রাসূলুল্লাহকে (সা) কেন্দ্র করে ব্যূহ রচনা করেছিলেন, আলী (রা) তাঁদের একজন। অবশ্য পলায়নকারীদের প্রতি আল্লাহর ক্ষমা ঘোষিত হয়েছে।

ইবন ইসহাক থেকে বর্ণিত। খন্দকের দিনে 'আমর ইবন আবদে উদ্দ বর্ম পরে বের হল। সে হুংকার ছেড়ে বললো ঃ কে আমার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে? আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী, আমি প্রস্তুত। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'এ হচ্ছে 'আমর তুমি বস।' 'আমর আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিল ঃ আমার সাথে লড়বার মত কেউ নেই? তোমাদের সেই জান্নাত এখন কোথায়, যাতে তোমাদের নিহতরা প্রবেশ করবে বলে

তোমাদের ধারণা? তোমাদের কেউই এখন আমার সাথে লড়তে সাহসী নয়? আলী (রা) উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি প্রস্তুত। রাসূল (সা) বললেন ঃ বস। তৃতীয় বারের মত আহ্বান জানিয়ে 'আমর তার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো। আলী (রা) আবারো উঠে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি প্রস্তুত। রাসূল (সা) বললেন ঃ সে তো 'আমর। আলী (রা) বললেন ঃ তা হোক। এবার আলী (রা) অনুমতি পেলেন। আলী (রা) তাঁর একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আমরের দিকে এগিয়ে গেলেন। 'আমর জিজ্ঞেস করলো ঃ তুমি কে? বললেন ঃ আলী (রা)। সে বললো ঃ আবদে মান্নাফের ছেলে? আলী বললেন ঃ আমি আবু তালিবের ছেলে আলী। সে বললো ঃ ভাতিজা, তোমার রক্ত ঝরানো আমি পছন্দ করিনে। আলী বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি কিন্তু তোমার রক্ত ঝরানো অপসন্দ করিনে। এ কথা শুনে 'আমর ক্ষেপে গেল। নিচে নেমে এসে তরবারি টেনে বের করে ফেললো। সে তরবারি যেন আগুনের শিখা। সে এগিয়ে আলীর ঢালে আঘাত করে ফেঁড়ে ফেললো। আলী পাল্টা এক আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠেন। তারপর আলী নিজের একটি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ফিরে আসেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবন কাসীর ৪/১০৬)।

সপ্তম হিজরীতে খাইবার অভিযান চালানো হয়। সেখানে ইয়াহুদীদের কয়েকটি সুদৃঢ় কিল্লা ছিল। প্রথমে সিদ্দীকে আকবর, পরে ফারুকে আজমকে কিল্লাগুলি পদানত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তারা কেউই সফলকাম হতে পারলেন না। নবী (সা) ঘোষণা করলেন ঃ 'কাল আমি এমন এক বীরের হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়পাত্র। তারই হাতে কিল্লাগুলির পতন হবে।' পরদিন সকালে সাহাবীদের সকলেই আশা করছিলেন এই গৌরবটি অর্জন করার। হঠাৎ আলীর ডাক পড়লো। তাঁরই হাতে খাইবারের সেই দুর্জয় কিল্লাগুলির পতন হয়।

তাবুক অভিযানে রওয়ানা হওয়ার সময় রাসূল (সা) আলীকে (রা) মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। আলী (রা) আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যাচ্ছেন, আর আমাকে নারী ও শিশুদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছেন? উত্তরে রাসূল (সা) বললেন ঃ হারুন যেমন ছিলেন মূসার, তেমনি তুমি হচ্ছো আমার প্রতিনিধি। তবে আমার পরে কোন নবী নেই। (তাবাকাত ঃ ৩/২৪)

নবম হিজরীতে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে প্রথম ইসলামী হজ্জ্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ছিলেন 'আমীরুল হজ্জ্ব। তবে কাফিরদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল ঘোষণার জন্য রাসূল (সা) আলীকে (রা) বিশেষ দূত হিসেবে পাঠান।

দশম হিজরীতে ইয়ামনে ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত খালিদ সাইফুল্লাহকে পাঠানো হয়। ছ'মাস চেষ্টার পরও তিনি সকলকাম হতে পারলেন না। ফিরে এলেন। রাসূলে করীম (সা) আলীকে (রা) পাঠানোর কথা ঘোষণা করলেন। আলী (সা) রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ আপনি আমাকে এমন লোকদের কাছে পাঠাচ্ছেন যেখানে নতুন নতুন ঘটনা ঘটবে অথচ বিচার ক্ষেত্রে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। উত্তরে রাসূল

(সা) বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে সঠিক রায় এবং তোমার অন্তরে শক্তিদান করবেন। তিনি আলীর (সা) মুখে হাত রাখলেন। আলী বলেন ঃ 'অতঃপর আমি কক্ষনো কোন বিচারে দ্বিধাগ্রস্ত হইনি।' যাওয়ার আগে রাসূল (সা) নিজ হাতে আলীর (রা) মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দুআ করেন। আলী ইয়ামনে পৌঁছে তাবলীগ শুরু করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সকল ইয়ামনবাসী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং হামাদান গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে যায়। রাসূল (সা) আলীকে (রা) দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তিনি দুআ করেন ঃ আল্লাহ, আলীকে না দেখে যেন আমার মৃত্যু না হয়। হযরত আলী বিদায় হজ্জের সময় ইয়ামন থেকে হাজির হয়ে যান।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর তাঁর নিকট-আত্মীয়রাই কাফন দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আলী (রা) গোসল দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মুহাজির ও আনসাররা তখন দরযার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন।

হযরত আবু বকর, হযরত উমার ও হযরত উসমানের (রা) খিলাফত মেনে নিয়ে তাঁদের হাতে বাইয়াত করেন এবং তাঁদের যুগের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে শরীক থাকেন। অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতেও হযরত উসমানকে পরামর্শ দিয়েছেন। যেভাবে আবু বকরকে 'সিদ্দীক', উমারকে 'ফারুক' এবং উসমানকে 'গণী' বলা হয়, তেমনিভাবে তাঁকেও 'আলী মুরতাজা' বলা হয়। হযরত আবু বকর ও উমারের যুগে তিনি মন্ত্রী ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। হযরত 'উসমানও সব সময় তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। (মরুজুজ জাহাব ঃ ২/২)

বিদ্রোহীদের দ্বারা হযরত উসমান ঘেরাও হলে তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে আলীই (৯রা) সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করেন। সেই ঘেরাও অবস্থায় হযররত উসমানের (রা) বাড়ীর নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইনকে (রা) নিয়োগ করেন। (আল-ফিত্নাতুল কুবরা ঃ ডঃ ত্বাহা হুসাইন)

হযরত উমার (রা) ইনতিকালের পূর্বে ছ'জন বিশিষ্ট সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের অসীয়াত করে যান। আলীও ছিলেন তাঁদের একজন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আলীর (রা) সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ লোকেরা যদি আলীকে খলীফা বানায়, তবে সে তাদেরকে ঠিক রাস্তায় পরিচালিত করতে পারবে। (আল-ফিত্নাতুল কুবরা) হযরত 'উমার তাঁর বাইতুল মাকদাস' সফরের সময় আলীকে (রা) মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান।

হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাতের পর বিদ্রোহীরা হযরত তালহা, যুবাইর ও আলীকে (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য চাপ দেয়। প্রত্যেকেই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানান। বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, হযরত আলী (রা) বার বার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন। অবশেষে মদীনাবাসীরা হযরত আলীর (রা) কাছে গিয়ে বলে, খিলাফতের এ পদ এভাবে শূন্য থাকতে পারে না। বর্তমানে এ পদের জন্য আপনার চেয়ে অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি নেই। আপনিই এর হকদার। মানুষের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন। তবে শর্ত আরোপ করেন যে, আমার বাইয়াত গোপনে হতে পারবে না। এজন্য সর্বশ্রেণীর মুসলমানের সম্মতি

প্রয়োজন। মসজিদে নববীতে সাধারণ সভা হলো। মাত্র ষোল অথবা সতেরো জন সাহাবা ছাড়া সকল মুহাজির ও আনসার আলীর (রা) হাতে বাইয়াত করেন।

অত্যন্ত জটিল এক পরিস্থিতির মধ্যে হযরত আলীর (রা) খিলাফতের সূচনা হয়। খলীফা হওয়ার পর তাঁর প্রথম কাজ ছিল হযরত উসমানের (রা) হত্যাকারীদের শাস্তি বিধান করা। কিন্তু কাজটি সহজ ছিল না। প্রথমতঃ হত্যাকারীদের কেউ চিনতে পারেনি। হযরত উসমানের স্ত্রী হযরত নায়িলা হত্যাকারীদের দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের কাউকে চিনতে পারেননি। মুহাম্মাদ বিন আবু বকর হত্যার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত উসমানের এক ক্ষোভ-উক্তির মুখে তিনি পিছটান দেন। মুহাম্মাদ বিন আবু বকরও হত্যাকারীদের চিনতে পারেননি। দ্বিতীয়তঃ মদীনা তখন হাজার হাজার বিদ্রোহীদের কব্জায়। তারা হযরত আলীর (রা) সেনাবাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু তাঁর এই অসহায় অবস্থা তৎকালীন অনেক মুসলমানই উপলব্ধি করেননি। তাঁরা হযরত আলীর (রা) নিকট তক্ষুণি হযরত উসমানের (রা) 'কিসাস' দাবী করেন। এই দাবী উত্থাপনকারীদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা) সহ তাল্হা ও যুবাইরের (রা) মত বিশিষ্ট সাহাবীরাও ছিলেন। তাঁরা হযরত আয়িশার (রা) নেতৃত্বে সেনাবাহিনী সহ মক্কা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁদের সমর্থকদের সংখ্যা ছিল বেশী। আলীও (রা) তাঁর বাহিনীসহ সেখানে পৌছেন। বসরার উপকণ্ঠে বিরোধী দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। হযরত আয়িশা (রা) আলীর (রা) কাছে তাঁর দাবী পেশ করেন। আলীও (রা) তাঁর সমস্যাসমূহ তুলে ধরেন। যেহেতু উভয় পক্ষেই ছিল সততা ও নিষ্ঠা তাই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। হযরত তালহা ও যুবাইর ফিরে চললেন। আয়িশাও ফেরার প্রস্তুতি শুরু করলেন। কিন্তু হাংগামা ও অশান্তি সৃষ্টিকারীরা উভয় বাহিনীতেই ছিল। তাই আপোষ মীমাংসায় তারা ভীত হয়ে পড়ে। তারা সুপরিকল্পিতভাবে রাতের অন্ধকারে এক পক্ষ অন্য পক্ষের শিবিরে হামলা চালিয়ে দেয়। ফল এই দাঁড়ায়, উভয় পক্ষের মনে এই ধারণা জন্মালো যে, আপোষ মীমাংসার নামে ধোঁকা দিয়ে প্রতিপক্ষ তাঁদের ওপর হামলা করে বসেছে। পরিপূর্ণ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আলীর (রা) জয় হয়। তিনি বিষয়টি হযরত আয়িশাকে (রা) বুঝাতে সক্ষম হন। আয়িশা (রা) বসরা থেকে মদীনায় ফিরে যান।

যুদ্ধের সময় আয়িশা উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। ইতিহাসে তাই এ যুদ্ধ 'উটের যুদ্ধ' নামে খ্যাত। হিজরী ৩৬ সনের জামাদিউস-সানী মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আশারায়ে মুবাশ্শারার সদস্য হযরত তাল্হা ও যুবাইরসহ উভয় পক্ষে মোট তের হাজার মুসলমান শহীদ হন। অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। হযরত আলী (রা) পনের দিন বসরায় অবস্থানের পর কুফায় চলে যান। রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত হয়।

এই উটের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের প্রথম আত্মঘাতী সংঘর্ষ। অনেক সাহাবী এ যুদ্ধে কোন পক্ষেই যোগদান করেননি। এই আত্মঘাতী সংঘর্ষের জন্য তাঁরা ব্যথিতও হয়েছিলেন। আলীর (রা) বাহিনী যখন মদীনা থেকে রওয়ানা হয়, মদীনাবাসীরা তখন কান্নায় ভেংগে পড়েছিলেন।

হযরত আয়িশার (রা) সাথে তো একটা আপোষরফায় আসা গেল। কিন্তু সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়ার (রা) সাথে কোন মীমাংসায় পৌছা গেল না। হযরত আলী (রা) তাঁকে

সিরিয়ার গভর্ণর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) বেঁকে বসলেন। আলীর (রা) নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলেন। তাঁর বক্তব্যের মূলকথা ছিল, 'উসমান (রা) হত্যার কিসাস না হওয়া পর্যন্ত তিনি আলীকে (রা) খলীফা বলে মানবেন না।'

হিজরী ৩৭ সনের সফর মাসে 'সিফ্‌ফীন' নামক স্থানে হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীর মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটে যায়। এ সংঘর্ষ ছিল উটের যুদ্ধ থেকেও ভয়াবহ। উভয় পক্ষে মোট ৯০,০০০ (নব্বই হাজার) মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আম্মার বিন ইয়াসীর, খুযাইমা ইবন সাবিত, ও আবু আম্মারা আল-মাযিনীও ছিলেন। তাঁরা সকলেই আলীর (রা) পক্ষে মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীর হাতে শহীদ হন। উল্লেখ্য যে, আম্মার বিন ইয়াসির সম্পর্কে রাসূল (রা) বলেছিলেন ঃ 'আফসুস, একটি বিদ্রোহী দল আম্মারকে হত্যা করবে।' (সহীহুল বুখারী) সাতাশ জন প্রখ্যাত সাহাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হযরত মুয়াবিয়াও হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী। অবশ্য হযরত মুয়াবিয়া (রা) হাদীসটির ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এত কিছুর পরেও বিষয়টির ফায়সালা হলো না।

সিফ্‌ফীনের সর্বশেষ সংঘর্ষে, যাকে 'লাইলাতুল হার' বলা হয়, হযরত আলীর (রা) জয় হতে চলেছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা) পরাজয়ের ভাব বুঝতে পেরে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মীমাংসার আহ্বান জানালেন। তাঁর সৈন্যরা বর্শার মাথায় কুরআন ঝুলিয়ে উঁচু করে ধরে বলতে থাকে, এই কুরআন আমাদের এ দ্বন্দ্বের ফায়সালা করবে। যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলো। হযরত আলীর (রা) পক্ষে আবু মুসা আশয়ারী (রা) এবং হযরত মুয়াবিয়ার (রা) পক্ষে হযরত 'আমর ইবনুল 'আস হাকাম বা সালিশ নিযুক্ত হলেন। সিদ্ধান্ত হলো, এই দুইজনের সম্মিলিত ফায়সালা বিরোধী দু'পক্ষই মেনে নেবেন। 'দুমাতুল জান্দাল' নামক স্থানে মুসলমানদের বড় আকারের এক সম্মেলন হয়। কিন্তু সব ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে যে সিদ্ধান্তটি পাওয়া যায় তা হলো, হযরত 'আমর ইবনুল আস (রা) হযরত আবু মুসা আশয়ারীর (রা) সাথে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, শেষ মুহূর্তে তা থেকে সরে আসায় এ সালিশী বোর্ড শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়। দুমাতুল জান্দাল থেকে হতাশ হয়ে মুসলমানরা ফিরে গেল। অতঃপর আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা) অনর্থক রক্তপাত বন্ধ করার লক্ষ্যে সন্ধি করলেন। এ দিন থেকে মূলতঃ মুসলিম খিলাফত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

এ সময় 'খারেজী' নামে নতুন একটি দলের জন্ম হয়। প্রথমে তারা ছিল আলী সমর্থক। কিন্তু পরে তারা এ বিশ্বাস প্রচার করতে থাকে যে, দ্বীনের ব্যাপারে কোন মানুষকে 'হাকাম' বা সালিশ নিযুক্ত করা কুফরী কাজ। আলী (রা) আবু মুসা আশয়ারীকে (রা) 'হাকাম' মেনে নিয়ে কুরআনের খেলাফ কাজ করেছেন। সুতরাং হযরত আলী তাঁর আনুগত্য দাবী করার বৈধতা হারিয়ে ফেলেছেন। তারা হযরত আলী থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা ছিল অত্যন্ত চরমপন্থী। তাদের সাথে আলীর (রা) একটি যুদ্ধ হয় এবং তাতে বহু লোক হতাহত হয়।

এই খারেজী সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি আবদুর রহমান মুলজিম, আল-বারাক ইবন আবদিল্লাহ ও 'আমর ইবন বকর আত-তামীমী, নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর এক গোপন

বৈঠকে মিলিত হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মুসলিম উম্মার অন্তর্কলহের জন্য দায়ী মূলতঃ আলী, মুয়াবিয়া ও 'আমর ইবনুল আস (রা)। সুতরাং এ তিন ব্যক্তিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। সিদ্ধান্ত মুতাবিক ইবন মুলজিম দায়িত্ব নিল আলীর (রা) এবং আল-বারাক ও 'আমর দায়িত্ব নিল যথাক্রমে মুয়াবিয়া ও 'আমর ইবনুল আসের (রা)। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, মারবে নয় তো মরবে। হিজরী ৪০ সনের ১৭ রমজান ফজরের নামাযের সময়টি এ কাজের জন্য নির্ধারিত হয়। অতঃপর ইবন মুলজিম কুফা, আল-বারাক দিমাশ্‌ক ও 'আমর মিসরে চলে যায়।

হিজরী ৪০ সনের ১৬ রমজান শুক্রবার দিবাগত রাতে আততায়ীরা আপন আপন স্থানে ওৎ পেতে থাকে। ফজরের সময় হযরত আলী (রা) অভ্যাসমত আস-সালাত বলে মানুষকে নামাযের জন্য ডাকতে ডাকতে যখন মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, পাপাত্মা ইবন মুলজিম শাণিত তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে আহত করে। আহত অবস্থায় আততায়ীকে ধরার নির্দেশ দিলেন। সন্তানদের ডেকে অসীয়াত করলেন। চার বছর নয় মাস খিলাফত পরিচালনার পর ১৭ রমজান ৪০ হিজরী শনিবার কুফায় শাহাদাত বরণ করেন।

একই দিন একই সময় হযরত মুয়াবিয়া যখন মসজিদে যাচ্ছিলেন, তাঁরও ওপর হামলা হয়। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। তিনি সামান্য আহত হন। অন্য দিকে 'আমর ইবনুল আস অসুস্থতার কারণে সেদিন মসজিদে যাননি। তার পরিবর্তে পুলিশ বাহিনী প্রধান খারেজ ইবন হুজাফা ইমামতির দায়িত্ব পালনের জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন। তাঁকেই 'আমর ইবনুল আস মনে করে হত্যা করা হয়। এভাবে মুয়াবিয়া ও 'আমর ইবনুল 'আস (রা) প্রাণে রক্ষা পান। (তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যা ঃ খিদরী বেক)

হযরত আলীর (রা) নামাযে জানাযার ইমামতি করেন হযরত হাসান ইবন আলী (রা)। কুফা জামে' মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তবে অন্য একটি বর্ণনা মতে নাজফে আশরাফে তাঁকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

আততায়ী ইবন মুলজিমকে ধরে আনা হলে আলী (রা) নির্দেশ দেন ঃ 'সে কয়েদী। তার থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা কর। আমি বেঁচে গেলে তাঁকে হত্যা অথবা ক্ষমা করতে পারি। যদি আমি মারা যাই, তোমরা তাকে ঠিক ততটুকু আঘাত করবে যতটুকু সে আমাকে করেছে। তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন না।' (তাবাকাত ঃ ৩/৩৫)

হযরত আলী (রা) পাঁচ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। একমাত্র সিরিয়া ও মিসর ছাড়া মক্কা ও মদীনাসহ সব এলাকা তাঁর অধীনে ছিল। তাঁর সময়টি যেহেতু গৃহযুদ্ধে অতিবাহিত হয়েছে, এ কারণে নতুন কোন অঞ্চল বিজিত হয়নি।

হযরত আলী (রা) তাঁর পরে অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যাননি। লোকেরা যখন তাঁর পুত্র হযরত হাসানকে (রা) খলীফা নির্বাচিত করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল; তিনি বলেছিলেন, এ ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশ অথবা নিষেধ কোনটাই করছিনা। অন্য এক ব্যক্তি যখন জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি আপনার প্রতিনিধি নির্বাচন করে যাচ্ছেন না কেন?

বললেন ঃ আমি মুসলিম উম্মাহকে এমনভাবে ছেড়ে যেতে চাই যেমন গিয়েছিলেন **রাসূলুল্লাহ** (সা)।

হযরত আলীর (রা) ওফাতের পর 'দারুল খিলাফা'– রাজধানী কুফার জনগণ হযরত হাসানকে (রা) খলীফা নির্বাচন করে। তিনি মুসলিম উম্মার আন্তঃকলহ ও রক্তপাত পছন্দ করলেন না। এ কারণে, হযরত মুয়াবিয়া (রা) ইরাক আক্রমণ করলে তিনি যুদ্ধের পরিবর্তে মুয়াবিয়ার (রা) হাতে খিলাফতের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া সমীচীন মনে করলেন। এভাবে হযরত হাসানের (রা) নজীরবিহীন কুরবানী মুসলিম জাতিকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে মুক্তি দেয়। খিলাফত থেকে তাঁর পদত্যাগের বছরকে ইসলামের ইতিহাসে 'আমুল জামায়াহ'— ঐক্য ও সংহতির বছর নামে অভিহিত করা হয়। পদত্যাগের পর হযরত হাসান কুফা ত্যাগ করে মদীনা চলে আসেন এবং নয় বছর পর হিজরী পঞ্চাশ সনে মদীনায় ইনতিকাল করেন। মাত্র ছয়টি মাস তিনি খিলাফত পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন।

হযরত উমার (রা) আলী (রা) সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফায়সালাকারী আলী।' এমন কি রাসূল (সা)ও বলেছিলেন, 'আকদাহুম আলী– তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিচারক আলী।' তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করে হযরত উমার (রা) একাধিকবার বলেছেন ঃ 'লাওলা আলী লাহালাকা উমার– আলী না হলে 'উমার হালাক হয়ে যেত।'

আলী (রা) নিজেকে একজন সাধারণ মুসলমানের সমান মনে করতেন এবং যে কোন ভুলের কৈফিয়তের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। একবার এক ইয়াহুদী তাঁর বর্ম চুরি করে নেয়। আলী বাজারে বর্মটি বিক্রি করতে দেখে চিনে ফেলেন। তিনি ইচ্ছা করলে জোর করে তা নিতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। আইন অনুযায়ী ইয়াহুদীর বিরুদ্ধে কাজীর আদালতে মামলা দায়ের করেন। কাজীও ছিলেন কঠোর ন্যায় বিচারক। তিনি আলীর (রা) দাবীর সমর্থনে প্রমাণ চাইলেন। আলী (রা) তা দিতে পারলেন না। কাজী ইয়াহুদীর পক্ষে মামলার রায় দিলেন। এই ফায়সালার প্রভাব ইয়াহুদীর ওপর এতখানি পড়েছিল যে, সে মুসলমান হয়ে যায়। সে মন্তব্য করেছিল, 'এতো নবীদের মত ইনসাফ। আলী (রা) আমীরুল মুমিনীন হয়ে আমাকে কাজীর সামনে উপস্থিত করেছেন এবং তাঁরই নিযুক্ত কাজী তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন।' তিনি ফাতিমার (রা) সাথে বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলে করীমের (সা) পরিবারের সাথেই থাকতেন। বিয়ের পর পৃথক বাড়ীতে বসবাস শুরু করেন। জীবিকার প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু পুঁজি ও উপকরণ কোথায়? গতরে খেটে এবং গনীমতের হিস্‌সা থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হযরত উমারের (রা) যুগে ভাতা চালু হলে তাঁর ভাতা নির্ধারিত হয় বছরে পাঁচ হাজার দিরহাম। হযরত হাসান বলেন, মৃত্যুকালে একটি গোলাম খরীদ করার জন্য জমা করা মাত্র সাত শ' দিরহাম রেখে যান। (তাবাকাত ঃ ৩/৩৯)

জীবিকার অনটন আলীর (রা) ভাগ্য থেকে কোন দিন দূর হয়নি। একবার স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে থেকেছি। (হায়াতুস সাহাবা ঃ ৩/৩১২) খলীফা হওয়ার পরেও ক্ষুধা ও দারিদ্রের সাথে তাকে লড়তে

হয়েছে। তবে তাঁর অন্তরটি ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত। কোন অভাবীকে তিনি ফেরাতেন না। এজন্য তাঁকে অনেক সময় সপরিবারে অভুক্ত থাকতে হয়েছে। তিনি ছিলেন দারুণ বিনয়ী। নিজের হাতেই ঘর-গৃহস্থালীর সব কাজ করতেন। সর্বদা মোটা পোশাক পরতেন। তাও ছেঁড়া, তালি লাগানো। তিনি ছিলেন জ্ঞানের দরজা। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর কাছে এসে দেখতে পেত তিনি উটের রাখালী করছেন, ভূমি কুপিয়ে ক্ষেত তৈরী করছেন। তিনি এতই অনাড়ম্বর ছিলেন যে, সময় সময় শুধু মাটির ওপর শুয়ে যেতেন। একবার তাঁকে রাসূল (সা) এ অবস্থায় দেখে সম্বোধন করেছিলেন, 'ইয়া আবা তুরাব'– ওহে মাটির অধিবাসী প্রাকৃতজন। তাই তিনি পেয়েছিলেন, 'আবু তুরাব' লকবটি। খলীফা হওয়ার পরও তাঁর এ সরল জীবন অব্যাহত থাকে। হযরত 'উমারের (রা) মত সবসময় একটি দুররা বা ছড়ি হাতে নিয়ে চলতেন, লোকদের উপদেশ দিতেন। (আল-ফিতনাতুল কুবরা)

হযরত আলী (রা) ছিলেন নবী খান্দানের সদস্য, যিনি নবীর (সা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'আনা মাদীনাতুল ইল্‌ম ওয়া আলী বাবুহা'– আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী সেই নগরীর প্রবেশদ্বার। (তিরমিযী) তিনি ছিলেন কুরআনের হাফিজ এবং একজন শ্রেষ্ঠ মুফাসসির। কিছু হাদীসও সংগ্রহ করেছিলেন। তবে হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। কেউ তাঁর কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করলে, বর্ণনাকারীর নিকট থেকে শপথ নিতেন। (তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ ঃ ১/১০) তিনি রাসূলুল্লাহর (রা) বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে বহু বিখ্যাত সাহাবী এবং তাবে'ঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী খলীফাদের যুগে মুহাজিরদের তিনজন ও আনসারদের তিনজন ফাতওয়া দিতেন। যথা ঃ 'উমার, উসমান, আলী, উবাই বিন কা'ব, মুয়াজ বিন জাবাল ও যায়িদ বিন সাবিত। মাসরুক থেকে অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলুল্লাহর (রা) সাহাবীদের মধ্যে ফাতওয়া দিতেন ঃ আলী, ইবন মাসউদ, যায়িদ, উবাই বিন কা'ব, আবু মূসা আল-আশয়ারী। (তাবাকাত ঃ ৪/১৬৭, ১৭৫)

আলী ছিলেন একজন সুবক্তা ও ভালো কবি। (কিতাবুল উমদা ঃ ইবন রশীক ঃ ১/২১) তাঁর কবিতার একটি 'দিওয়ান' আমরা পেয়ে থাকি। তাতে অনেকগুলি কবিতায় মোট ১৪০০ শ্লোক আছে। গবেষকদের ধারণা, তাঁর নামে প্রচলিত অনেকগুলি কবিতা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। তবে তিনি যে তৎকালীন আরবী কাব্য জগতের একজন বিশিষ্ট দিকপাল, তাতে পণ্ডিতদের কোন সংশয় নেই। 'নাহজুল বালাগা' নামে তাঁর বক্তৃতার একটি সংকলন আছে যা তাঁর অতুলনীয় বাগ্মিতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। (তারীখুল আদাব আল-আরাবী ঃ ডঃ উমার ফাররুখ, ১/৩০৯)

খাতুনে জান্নাত নবী কন্যা হযরত ফাতিমার (রা) সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। যতদিন ফাতিমা জীবিত ছিলেন, দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। ফাতিমার মৃত্যুর পর একাধিক বিয়ে করেছেন। তাবারীর বর্ণনা মতে, তার চৌদ্দটি ছেলে ও সতেরটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। হযরত ফাতিমার গর্ভে তিন পুত্র হাসান, হুসাইন, মুহসিন এবং দু'কন্যা যয়নাব ও উম্মু কুলসুম জন্মলাভ করেন। শৈশবেই মুহসীন মারা যায়। ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে, মাত্র পাঁচ

ছেলে হাসান, হুসাইন, মুহাম্মাদ (ইবনুল হানাফিয়্যা), আব্বাস এবং উমার থেকে তাঁর বংশ ধারা চলছে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আলীর (রা) মর্যাদা ও ফজীলাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে যত কথা বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোন, সাহাবী সম্পর্কে তা হয়নি। (আল-ইসাবা ঃ ২/৫০৮) ইতিহাসে তাঁর যত গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তার কিয়দংশও তুলে ধরা সম্ভব নয়। রাসূল (সা) অসংখ্যবার তাঁর জন্য ও তাঁর সন্তানদের জন্য দুআ করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ একমাত্র মুমিনরা ছাড়া তোমাকে কেউ ভালোবাসবে না এবং একমাত্র মুনাফিকরা ছাড়া কেউ তোমাকে হিংসা করবে না।

হযরত আলীর এক সাথী হযরত দুরার ইবন দামরা আল কিনানী একদিন হযরত মুয়াবিয়ার কাছে এলেন। মুয়াবিয়া তাঁকে আলীর (রা) গুণাবলী বর্ণনা করতে অনুরোধ করেন। প্রথমে তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার চাপাচাপিতে দীর্ঘ এক বর্ণনা দান করেন। তাতে আলীর (রা) গুণাবলী চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। ঐতিকহাসিকরা বলছেন এ বর্ণনা শুনে মুয়াবিয়া সহ তার সাথে বৈঠকে উপস্থিত সকলেই কান্নায় ভেংগে পড়েছিলেন। অতঃপর মুয়াবিয়া মন্তব্য করেন ঃ 'আল্লাহর কসম, আবুল হাসান (হাসানের পিতা) এমনই ছিলেন।' (আল-ইসতিয়াব ঃ ৩/৪৪)

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)

নাম যুবাইর, কুনিয়াত আবু আবদিল্লাহ এবং 'হাওয়ারিয়্যু রাসূলিল্লাহ' লকব। পিতার নাম 'আওয়াম' এবং মাতা 'সাফিয়্যা বিনতু আবদিল মুত্তালিব।' মা হযরত সাফিয়্যা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু। সুতরাং যুবাইর ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো ভাই। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা ছিলেন তাঁর ফুফু। অন্যদিকে হযরত সিদ্দিকে আকবরের কন্যা হযরত আসমাকে বিয়ে করায় রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন তাঁর ভায়রা। হযরত আসমা (রা) ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশার (রা) বোন। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিল তাঁর একাধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক।

হযরত যুবাইর (রা) হিজরাতের আটাশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবকালীন জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে প্রথম থেকেই তাঁর মা তাঁকে এমনভাবে প্রতিপালন করেছিলেন, যাতে বড় হয়ে তিনি একজন দুঃসাহসী, দৃঢ়-সংকল্প ও আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ হন। এ কারণে প্রায়ই মা তাঁকে মারধোর করতেন এবং কঠোর অভ্যাসে অভ্যস্ত করতেন। একদিন তাঁর চাচা নাওফিল বিন খুওয়াইলিদ তাঁর মা হযরত সাফিয়্যার ওপর ভীষণভাবে ক্ষেপে গিয়ে বলেন, 'এভাবে মারতে মারতে ছেলেটাকে তুমি মেরেই ফেলবে।' তাছাড়া বনু হাশিমের লোকদের ডেকে বলেন, 'তোমরা সাফিয়্যাকে বুঝাওনা কেন?' জবাবে সাফিয়্যা বলেন, 'যারা বলে আমি তাকে দেখতে পারিনা, তারা মিথ্যা বলে। আমি তাকে এজন্য মারধোর করি যাতে সে বুদ্ধিমান হয় এবং পরবর্তী জীবনে শত্রুসৈন্য পরাজিত করে গনিমাতের মাল লাভে সক্ষম হয়।

এমন প্রতিপালনের প্রভাব অবশ্যই তাঁর ওপর পড়েছিলো। অল্প বয়স থেকেই তিনি বড় বড় পাহলোয়ান ও শক্তিশালী লোকেদের সাথে কুস্তি লড়তেন। একবার মক্কায় একজন তাগড়া জোয়ানের সাথে তাঁর ধরাধরি হয়ে গেল। তাকে এমন মারই না মারলেন যে, লোকটির হাত ভেঙ্গে গেল। লোকেরা তাঁকে ধরে হযরত সাফিয়্যার নিকট নিয়ে এসে অভিযোগ করলো। তিনি পুত্রের কাজে অনুতপ্ত হওয়া বা ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে সর্বপ্রথম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা যুবাইরকে কেমন দেখলে সাহসী না ভীরু?'

যুবাইর (রা) মাত্র ষোল বছর বয়সেই ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অনন্য ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

যদিও তাঁর বয়স ছিল কম তবুও দৃঢ়তা ও জীবনকে বাজি রাখার ক্ষেত্রে কারো থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর একবার কেউ রটিয়ে দিয়েছিলো, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহকে (সা) বন্দী অথবা হত্যা করে ফেলেছে। একথা শুনে তিনি আবেগ ও উত্তেজনায় এতই আত্মভোলা হয়ে পড়েছিলেন যে তক্ষুণি একটানে তরবারি কোষমুক্ত করে মানুষের ভিড় ঠেলে আল্লাহর রাসূলের (সা) দরবারে গিয়ে হাজির হন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে যুবাইর?' তিনি বললেন,

'শুনেছিলাম, আপনি বন্দী অথবা নিহত হয়েছেন।' রাসূল কারীম (সা) অত্যন্ত খুশী হয়ে তাঁর জন্যে দুআ করেন। সীরাত লেখকদের বর্ণনা, এটাই হচ্ছে প্রথম তলোয়ার যা আত্মোৎসর্গের উদ্দেশ্যে একজন বালক উন্মুক্ত করেছিলো।

প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কার অন্যান্য মুসলমানদের মত তিনিও অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হন। তাঁর চাচা তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরানোর জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু তাওহীদের ছাপ যার অন্তরে একবার লেগে যায় তা কি আর মুছে ফেলা যায়? ক্ষেপে গিয়ে চাচা আরো কঠোরতা শুরু করে দেন। উত্তপ্ত পাথরের উপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে এমন মারই না মারতেন যে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যেত। তবুও তিনি বলতেন, 'যত কিছুই করুন না কেন আমি আবার কাফির হতে পারিনা।' অবশেষে নিরুপায় হয়ে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে হাবশায় হিজরাত করেন। হাবশায় কিছুকাল অবস্থানের পর মক্কায় ফিরে এলেন। এদিকে রাসূল (সা)ও মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করলেন। তিনিও মদীনায় গেলেন।

রাসূল (সা) মক্কায় তালহা ও যুবাইরের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু মদীনায় আসার পর নতুন করে হযরত সালামা ইবন সালামা আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপিত হয়। সালামা ছিলেন মদীনার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব এবং আকাবায় বাইয়াত গ্রহণকারীদের অন্যতম।

যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি বদর যুদ্ধে অত্যন্ত সাহস ও নিপুণতার পরিচয় দেন। মুশরিকদের প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙ্গে তছনছ করে দেন। একজন মুশরিক সৈনিক একটি টিলার ওপর উঠে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানালে যুবাইর তাকে মুহূর্তের মধ্যে এমনভাবে জাপ্টে ধরেন যে, দু'জনেই গড়িয়ে নীচের দিকে আসতে থাকেন। তা দেখে রাসূল (সা) বলেন, 'এদের মধ্যে যে প্রথম ভূমিতে পড়বে, সে নিহত হবে।' সত্যি তাই হয়েছিলো। মুশরিকটি প্রথম মাটিতে পড়ে এবং যুবাইর (রা) তরবারির এক আঘাতে তাকে হত্যা করেন। এমনিভাবে তিনি 'উবাইদা ইবন সাঈদের মুখোমুখি হলেন। সে ছিল আপাদ-মস্তক এমনভাবে বর্মাচ্ছাদিত যে কেবল দু'টি চোখই তার দেখা যাচ্ছিলো। তিনি খুব তাক করে তার চোখ লক্ষ্য করে তীর ছুড়লেন। নিশানা নির্ভুল হলো। তীরের ফলা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। অতি কষ্টে তিনি তার লাশের উপর বসে ফলাটি বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে তা কিছুটা বেঁকে গিয়েছিলো। স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাসূল (সা) এ তীরটি নিজেই নিয়ে নেন এবং তাঁর ইনতিকালের পর তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান পর্যন্ত এ তীরটি বিভিন্ন খলীফার নিকট রক্ষিত ছিল। হযরত উসমানের শাহাদাতের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর তীরটি গ্রহণ করেন এবং তাঁর শাহাদাত পর্যন্ত এটি তাঁর নিকট ছিল।

বদরে তিনি এত সাংঘাতিকভাবে লড়েছিলেন যে তাঁর তরবারি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো এবং আঘাতে আঘাতে তাঁর সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো। এ দিনের একটি ক্ষত এত গভীর ছিল যে চিরদিনের জন্যে তা একটি গর্তের মত হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর পুত্র হযরত উরওয়া বলেন, 'আমরা সেই গর্তে আংগুল ঢুকি খেলা

করতাম।' এ যুদ্ধে তিনি হলুদ রঙের পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। তা দেখে রাসূল (সা) বলেন, 'আজ ফিরিশতাগণও এ বেশে এসেছে।'

উহুদের ময়দানে সত্য ও মিথ্যার লড়াই যখন চরম পর্যায়ে, তখন রাসূল (সা) স্বীয় তরবারি কোষমুক্ত করে বললেন, 'আজ কে এর হক আদায় করবে?' সকল সাহাবীই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে নিজ নিজ হাত বাড়ালেন। যুবাইর (রা)ও তিনবার নিজের হাত বাড়ালেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা লাভের গৌরব অর্জন করেন হযরত আবু দুজানা আনসারী (রা)। উহুদের যুদ্ধে তীরন্দাজ সৈনিকদের অসতর্কতার ফলে যখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল এবং মুসলিমদের সুনিশ্চিত বিজয় পরাজয়ের রূপ নিল তখন যে চৌদ্দজন সাহাবী নিজেদের জীবনের বিনিময়ে রাসূলে পাককে কেন্দ্র করে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করেন যুবাইর (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

খন্দকের যুদ্ধে মুসলিম নারীরা যেদিকে অবস্থান করেছিলেন, সে দিকটির প্রতিরক্ষার দায়িত্বভার লাভ করেন যুবাইর (রা)। এ যুদ্ধের সময় মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনু কুরাইজা মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি ভঙ্গ করে। রাসূল (সা) তাদের অবস্থা জানার জন্যে কাউকে তাদের কাছে পাঠাতে চাইলেন। তিনবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তাদের সংবাদ নিয়ে আসতে পার?' প্রত্যেকবারই হযরত যুবাইর বলেন, 'আমি'। রাসূল (সা) তাঁর আগ্রহে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, 'প্রত্যেক নবীরই থাকে হাওয়ারী। আমার হাওয়ারী যুবাইর।'

খন্দকের পর বনু কুরাইজার যুদ্ধ এবং বাইয়াতে রিদওয়ানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। খাইবারের যুদ্ধে তিনি অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন। খাইবারের ইয়াহুদী নেতা মুরাহহিব নিহত হলে বিশাল দেহ ও বিপুল শক্তির অধিকারী তার ভাই ইয়াসির ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে হুঙ্কার ছেড়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানায়। হযরত যুবাইর (রা) লাফিয়ে পড়লেন। তখন তাঁর মা হযরত সাফিয়্যা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, নিশ্চয় আজ আমার কলিজার টুকরা শহীদ হবে।' রাসূল (সা) বললেন, 'না। যুবাইরই তাকে হত্যা করবে।' সত্যি সত্যি অল্পক্ষণের মধ্যে যুবাইর তাকে হত্যা করেন।

খাইবার বিজয়ের পর মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি চলছে। মানবীয় কিছু দুর্বলতার কারণে প্রখ্যাত সাহাবী হাতিব বিন আবী বালতায়া (সা) সব খবর জানিয়ে মক্কার কুরাইশদের নিকট একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিসহ গোপনে একজন মহিলাকে তিনি মক্কায় পাঠান। এদিকে ওহীর মাধ্যমে সব খবর রাসূল (সা) অবগত হলেন। তিনি চিঠিসহ মহিলাটিকে গ্রেফতারের জন্যে যে দলটি পাঠান, হযরত যুবাইরও ছিলেন সে দলের একজন। চিঠিসহ মহিলাকে গ্রেফতার করে মদীনায় নিয়ে আসা হলো। হাতিব বিন বালতায়া লজ্জিত হয়ে তওবাহ করেন। রাসূলও (সা) তাঁকে ক্ষমা করেন।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা) মুসলিম সেনাবাহিনীকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করেন। সর্বশেষ ও ক্ষুদ্রতম দলটিতে ছিলেন রাসূল (সা) নিজে। আর এ দলটির পতাকাবাহী ছিলেন যুবাইর (রা)। রাসূল (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন। চারদিকে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এলে হযরত মিকদাদ ও হযরত যুবাইর (রা) নিজ নিজ ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে

রাসূলে পাকের নিকট উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) উঠে দাঁড়িয়ে নিজ হাতে তাঁদের উভয়ের মুখমণ্ডলের ধুলোবালি ঝেড়ে দেন।

হুনাইন যুদ্ধের সময় হযরত যুবাইর কাফিরদের একটি গোপন ঘাঁটির নিকট পৌঁছলে তারা তাঁকে অতর্কিত আক্রমণ করে। অত্যন্ত সাহসের সাথে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ঘাঁটিটি সাফ করে ফেলেন। তায়িফ ও তাবুকের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে সিরিয়ার ইয়ারমুক প্রান্তরে বিশাল রোমান বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটা ছিল সিরিয়ার ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধ। হযরত যুবাইর এ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের এক চরম পর্যায়ে মুসলিম সৈনিকদের এক দল সিদ্ধান্ত নিল, হযরত যুবাইর রোমান বাহিনীর মধ্যভাগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাবেন এবং অন্যরা তাঁর সমর্থনে পাশে পাশে থাকবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত যুবাইর (রা) ক্ষিপ্রতার সাথে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালিয়ে রোমান বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে অপর প্রান্তে চলে যান কিন্তু অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করতে সক্ষম হলেন না। একাকী আবার রোমান বাহিনী ভেদ করে ফিরে আসার সময় প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হয়ে ঘাড়ে দারুণভাবে আঘাত পান। হযরত 'উরওয়া বলেন, বদরের পর এটা ছিল দ্বিতীয় যখম যার মধ্যে আংগুল ঢুকিয়ে ছেলে বেলায় আমরা খেলতাম। তাঁর এ দুঃসাহসী আক্রমণের ফলে রোমান বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

হযরত আমর ইবনুল 'আস মিসরে আক্রমণ চালিয়ে ফুসতাতের কিল্লা অবরোধ করে রেখেছেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত 'উমার তাঁর সাহায্যে দশ হাজার সিপাহী ও চার হাজার অফিসার পাঠালেন। আর চিঠিতে লিখলেন, এসব অফিসারের এক একজন এক হাজার অশ্বারোহীর সমান। হযরত যুবাইর ছিলেন এ চার হাজার অফিসারের একজন। মুসলিম সৈন্যরা সাত মাস ধরে কিল্লা অবরোধ করে আছে। জয়-পরাজয়ের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে হযরত যুবাইর একদিন বললেন, 'আজ আমি মুসলিমদের জন্য আমার জীবন কুরবান করবো।' এ কথা বলে উন্মুক্ত তরবারি হাতে সিঁড়ি লাগিয়ে কিল্লা প্রাচীরের মাথার ওপর উঠে পড়লেন। আরো কিছু সাহাবীও তাঁর সঙ্গী হলেন। প্রাচীরের ওপর থেকে অকস্মাৎ তাঁরা 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে শুরু করেন। এ দিকে নিচ থেকে সকল মুসলিম সৈনিক এক যোগে আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলেন। খৃষ্টান সৈন্যরা মনে করলো, মুসলিমগণ কিল্লায় ঢুকে পড়েছে। তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে হযরত যুবাইর কিল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ফটক উন্মুক্ত করে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। উপায়ান্তর না দেখে মিসরের শাসক মাকুকাস সন্ধির প্রস্তাব দেয় এবং তা গৃহীত হয়। সকলকে আমান দেওয়া হয়।

হিজরী ২৩ সনে দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা) এক অগ্নি উপাসকের ছুরিকাঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ছয়জন প্রখ্যাত সাহাবীর সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করে তাদের ওপর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে যান। তিনি বলেন, 'জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাসূল (সা) এদের প্রতি সন্তুষ্ট

ছিলেন।' হযরত যুবাইর ছিলেন এ বোর্ডের অন্যতম সদস্য।

তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমানের খিলাফতকালে হযরত যুবাইর (রা) নিরিবিলি জীবন যাপন করছিলেন। কোন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। আসলে বয়সও বেড়ে গিয়েছিলো। ৩৫ হিজরীতে বিদ্রোহীদের দ্বারা হযরত 'উসমান অবরুদ্ধ হলে তাঁর নিরাপত্তার জন্য হযরত যুবাইর স্বীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহকে নিয়োগ করেন। হযরত 'উসমান শহীদ হলে রাতের অন্ধকারে গোপনে তিনি তাঁর জানাযার নামায আদায় করে দাফন করেন।

হযরত আলীর (রা) শাসনকালে তিনি এবং হযরত তালহা মক্কায় যেয়ে হযরত আয়িশার (রা) সাথে মিলিত হন। সেখানে তাঁরা মুসলিম উম্মাহর তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেন এবং মদীনায় না গিয়ে বসরার দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিপুল সংখ্যক লোক তাঁদের সহযোগী হয়। এদিকে হযরত আলী (রা) তাঁদেরকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীসহ অগ্রসর হন এবং হিজরী ৩৬ সনের ১০ই জমাদিউল উখরা বসরার অনতিদূরে 'যীকার' নামক স্থানে দুই মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হয়। ইতিহাসে এটি উটের যুদ্ধ নামে পরিচিতি।

ইসলামী ইতিহাসের এ দুঃখজনক অধ্যায়ের বিশ্লেষণ আমাদের এ প্রবন্ধের মুখ্য বিষয় নয়। তবে একদিন যাঁরা ছিলেন ভাই ভাই, আজ তাঁরা একে অপরের খুনের পিপাসায় কাতর। ব্যাপারটি যাই হোক না কেন, এটা যে তাঁদের ব্যক্তিগত ঝগড়া ও আক্রোশের কারণে নয়, তা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। সত্য ও সততার আবেগ-উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তাঁরা এমনটি করেছিলেন। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, একই গোত্রের লোক তখন দু'দিকে বিভক্ত। তাছাড়া দু'পক্ষের নেতৃবৃন্দের মূল লক্ষ্যই ছিল একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়া। আর এ কারণেই দু'পক্ষের মধ্যে দূত বিনিময়ের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো। আর একই কারণে আমরা দেখতে পাই, হযরত আলী একাকী ঘোড়ায় চড়ে রণাঙ্গণের মাঝখানে এসে হযরত যুবাইরকে ডেকে বলছেন, 'আবু আবদুল্লাহ! তোমার কি সে দিনটির কথা মনে আছে, যে দিন আমরা দু'জন হাত ধরাধরি করে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাসূল (সা) তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ তুমি কি আলীকে মুহাব্বত কর? বলেছিলে ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্মরণ কর, তখন রাসূল (সা) বলেছিলেন ঃ 'একদিন তুমি অন্যায়ভাবে তার সাথে লড়বে।' হযরত যুবাইর জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, এখন আমার স্মরণ হচ্ছে।'

একটি মাত্র কথা। কথাটি বলে হযরত আলী (রা) তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এ দিকে যুবাইরের অন্তরে ঘটে গেল এক বিপ্লব। তাঁর সকল সংকল্প ও দৃঢ়তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশার (রা) কাছে এসে বললেন ঃ আমি সম্পূর্ণ ভুলের ওপর ছিলাম। আলী আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি বাণী স্মরণ করে দিয়েছে। আয়িশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে এখন ইচ্ছা কি?' তিনি বললেন ঃ 'আমি এ ঝগড়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।' তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বললেন, 'আব্বা আপনি আমাদেরকে গর্তে ফেলে আলীর ভয়ে এখন পালিয়ে যাচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'আমি কসম করেছি, আলীর সাথে আর লড়বো না।' আবদুল্লাহ বললেন 'কসমের কাফ্‌ফারা সম্ভব।' এই বলে তিনি

স্বীয় গোলাম মাকহুলকে ডেকে আযাদ করে দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী যুবাইর বললেন ঃ 'বেটা, আলী আমাকে এমন কথা স্মরণ করে দিয়েছে যাতে আমার সকল উদ্যম-উৎসাহ স্তিমিত হয়ে পড়েছে। আমি সুনিশ্চিত যে, আমরা হকের ওপর নেই। এসো তুমিও আমার অনুগামী হও।' হযরত আবদুল্লাহ অস্বীকার করলেন। হযরত যুবাইর একাকী বসরার দিকে রওয়ানা হলেন।

হযরত যুবাইরকে যেতে দেখে আহনাফ বিন কায়েস বললেন ঃ 'কেউ জেনে এসো তো তিনি যাচ্ছেন কেন।' আমর ইবন জারমুয বললো, 'আমি যাচ্ছি।' এই বলে সে অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে হযরত যুবাইরের সঙ্গে মিলিত হলো। তখন তিনি বসরা ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে পৌঁছেছেন। কাছে এসে ইবনে জারমুয বললেন ঃ

– আবু আবদুল্লাহ! জাতিকে আপনি কি অবস্থায় ছেড়ে এলেন?

– তারা সবাই একে অপরের গলা কাটছে।

– এখন কোথায় যাচ্ছেন ?

– আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। এ কারণে এ ঝগড়া থেকে দূরে থাকার জন্যে অন্য কোথাও যেতে চাই।

ইবন জারমুয বললো ঃ 'চলুন, আমাকেও এ দিকে কিছুদূর যেতে হবে।' দু'জন এক সংগে চললেন। জুহরের নামাযের সময় হযরত যুবাইর থামলেন। ইবনে জারমুয বললো, 'আমিও আপনার সাথে নামায আদায় করবো। দু'জন নামাযে দাঁড়ালেন। হযরত যুবাইর যেই তাঁর মা'বুদের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়েছেন, বিশ্বাসগাতক ইবন জারমুয অমনি তরবারির এক আঘাতে রাসূলুল্লাহ (সা) হাওয়ারীর দেহ থেকে তাঁর শির বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইবন জারমুয হযরত যুবাইরের তরবারি, বর্ম ইত্যাদিসহ হযরত আলীর (রা) নিকট উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত গর্বের সাথে তার কৃতিত্বের বর্ণনা দিল। আলী (রা) তলোয়ার খানির প্রতি অনুশোচনার দৃষ্টিতে এক নজর তাকিয়ে বললেন, 'তিনি অসংখ্যবার রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মুখ থেকে মুসিবতের মেঘমালা অপসারণ করেছেন। ওরে ইবন সাফিয়্যার হন্তা, শুনে রাখ, জাহান্নাম তোর জন্যে প্রতীক্ষা করছে।' এভাবে হযরত যুবাইর (রা) হিজরী ৩৬ সনে শাহাদাত বরণ করেন এবং 'আস-সিবা' উপত্যকায় সমাহিত হন। তিনি ৬৪ বছর জীবন লাভ করেছিলেন।

হযরত যুবাইর ছিলেন অত্যন্ত মহৎ চরিত্রের অধিকারী। তাকওয়া, সত্য-প্রীতি, দানশীলতা, উদারতা ও বেপরোয়াভাব ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শিশুদের মত তাঁর অন্তর ছিল কোমল। সামান্য ব্যাপারেই তিনি মোমের মত বিগলিত হয়ে যেতেন। যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো ঃ

'তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করবে।' (যুমার/৩১)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমাদের এ ঝগড়ার কি পুনরাবৃত্তি হবে?' রাসূল (সা) বললেন, 'হ্যাঁ। অণু-পরমাণুর হিসাব করে প্রত্যেক হকদারকে তার

হক দেওয়া হবে।' এ কথা শুনে তার অন্তর কেঁপে ওঠে। তিনি বলে উঠলেন, 'আল্লাহু আকবর। কেমন কঠিন অবস্থা হবে।'

একবার তাঁর দাস ইবরাহীমের দাদী উম্মু আতার কাছে গিয়ে তিনি দেখলেন, আইয়্যামে তাশরীকের পরেও তাদের নিকট কুরবানীদের গোশত অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি বললেন, 'উম্মু আতা! রাসূল (সা) মুসলমানদেরকে তিনদিনের বেশী কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।' উম্মু 'আতা বললেন, 'আমি কি করবো। লোকেরা এত হাদীয়া পাঠায় যে তা শেষই হয়না।' (মুসনাদে ইমাম আহমাদ ১/১৬৬)

হযরত যুবাইর যদিও রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী ও সার্বক্ষণিক সহচর ছিলেন, তবুও আল্লাহ-ভীতি ও সতর্কতার কারণে খুব কমই হাদীস বর্ণনা করতেন। একদিন পুত্র আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'আব্বা, অন্যদের মত আপনি বেশী বেশী হাদীস বর্ণনা করেন না– এর কারণ কি?' তিনি বললেন, 'বেটা, অন্যদের থেকে রাসূলের (সা) সাহচর্য ও বন্ধুত্ব আমার কোন অংশে কম ছিল না। যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছি, সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য হতে বিচ্ছিন্ন হইনি কিন্তু তাঁর এ সতর্কবাণীটি আমাকে দারুণভাবে সতর্ক করেছে– 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার আবাসস্থল নির্ধারণ করে নেয়।

ইসলামী সাম্যের প্রতি তিনি এতবেশী সতর্ক ছিলেন যে, দু'জন মুসলিম মৃতের মধ্যেও একজনকে সামান্য প্রাধান্য দান তিনি বৈধ মনে করেননি। উহুদের যুদ্ধে তাঁর মামা হযরত হামযা (রা) শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মা হযরত সাফিয়্যা (রা) ভাইয়ের কাফনের জন্যে দু'প্রস্থ কাপড় নিয়ে আসেন। কিন্তু মামার পাশেই একজন আনসারী ব্যক্তির লাশ ছিলো। একটি লাশের জন্যে দু'টি কাপড় হবে আর অন্যটি থাকবে কাফনহীন– ব্যাপারটি তিনি মেনে নিতে পারেননি। উভয়ের মধ্যে ভাগ করার জন্যে কাপড় দু'টিকে মাপলেন। ঘটনাক্রমে কাপড় দু'খানা ছিল ছোট-বড়। যাতে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না হয়, সে জন্য লটারীর মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন।

হযরত যুবাইর যে কোন ধরনের বিপদ-আপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। মৃত্যু-ভয় তাঁর দৃঢ় সংকল্পে কোনদিন বিন্দুমাত্র ফাটল ধরাতে পারেনি। ইসকান্দারিয়া অবরোধের সময় তিনি সিঁড়ি লাগিয়ে কিল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চাইলেন। সঙ্গীরা বললেন, 'ভেতরে মারাত্মক প্লেগ।' জবাবে বললেন 'আমরা তো যখম ও প্লেগের জন্যেই এসেছি। সুতরাং মৃত্যুভয় কেন?' সেদিন তিনি ভীষণ সাহসিকতার সঙ্গে সিঁড়ি লাগিয়ে কিল্লায় প্রবেশ করেছিলেন।

হযরত যুবাইরের সততা, আমানতদারী, পরিচালন ক্ষমতা ও সংগঠন যোগ্যতা ছিল অসাধারণ। মৃত্যুকালে লোকেরা তাঁকে আপন আপন সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের মুহাফিজ বানাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করতো। মুতী ইবনুল আসওয়াদ তাঁকে অসী বানাতে চাইলে তিনি অস্বীকৃতি জানান। তখন তিনি কাতর কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'আমি আপনাকে আল্লাহ, রাসূল ও নিকট- আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বলছি। আমি ফারুকে আজম উমারকে বলতে শুনেছি, যুবাইর দ্বীনের একটি রুকন বা স্তম্ভ। হযরত উসমান, মিকদাদ, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, আবদুর রহমান ইবন আউফ প্রমুখ সাহাবী মৃত্যুকালে

তাঁকে অসী নিযুক্ত করেছিলেন। অত্যন্ত সততার সাথে তিনি তাঁদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে তাঁদের সন্তান ও পরিবার-পরিজনদের জন্য ব্যয় করেন।

হযরত যুবাইর স্ত্রী ও ছেলে-সন্তানদের গভীরভাবে ভালোবাসতেন। বিশেষত ঃ পুত্র আবদুল্লাহ ও তাঁর সন্তানদেরকে অতিমাত্রায় স্নেহ করতেন। মৃত্যুর পূর্বে সন্তানদের তা'লীম ও তারবিয়্যাতের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন দারুণ সচেতন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি পুত্র আবদুল্লাহকে সংগে নিয়ে যান। তখন তার বয়স মাত্র দশ বছর। হযরত যুবাইর তাকে একটি ঘোড়ার ওপর বসিয়ে একজন সিপাহীর তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেন, যাতে সে যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্যগুলি দেখিয়ে তাকে বীরত্ব ও সাহসিকতার শিক্ষা দেয়।

বদান্যতা, দানশীলতা ও আল্লাহর রাস্তায় খরচের ব্যাপারে তিনি অন্য কারো থেকে কখনো পিছিয়ে থাকেননি। তাঁর এক হাজার দাস ছিল। প্রতিদিন তিনি তাদের ভাড়া খাটিয়ে মোটা অংকের অর্থ লাভ করতেন। কিন্তু তার একটি পয়সাও নিজের বা পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করা সমীচীন মনে করতেন না। সবই বিলিয়ে দিতেন। মোটকথা, নবীর একজন হাওয়ারীর মধ্যে যত রকমের গুণ থাকা সম্ভব, সবই হযরত যুবাইরের মধ্যে ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল হযরত যুবাইরের প্রধান পেশা। আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো, যে ব্যবসায়ে তিনি হাত দিয়েছেন, কখনো তাতে লোকসান হয়নি।

আল্লাহর রাহে সংগ্রামে দুশমনদের তীর-বর্শার অসংখ্য আঘাত তিনি খেয়েছেন। আলী ইবনে খালিদ বলেন, আমাদের কাছে মুসেল থেকে একটি লোক এসেছিলো। সে বর্ণনা করলো ঃ 'আমি যুবাইর ইবনুল আওয়ামের একজন সফর-সঙ্গী ছিলাম। সফরের এক পর্যায়ে আমি তাঁর দেহের এমন সব ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেলাম যা অন্য কারো দেহে আর কখনো দেখিনি। জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এ সবই ঘটেছে রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে ও আল্লাহর রাহে।'

আলী ইবনে যায়িদ বলেন, 'যুবাইরকে দেখেছে এমন এক ব্যক্তি আমাকে বলেছে, 'তাঁর (যুবাইরের) বুকে ঝরণার মত দেখতে তীর বর্শার অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন ছিল।'

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে। তবে তাঁর তরবারিটি ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। তরবারির হাতলটি ছিল চমৎকার নকশা অংকিত।

হযরত মুআবিয়া (রা) আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'তালহা ও যুবাইর সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাদের দু'জনের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহর কসম, তাঁরা দু'জনই ছিলেন অত্যন্ত সংযমী, পুণ্যবান, সৎকর্মশীল, আত্মসমর্পণকারী, পূত-পবিত্র, পবিত্রতা অর্জনকারী ও শাহাদাত বরণকারী।'

হযরত যুবাইর বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) আমার জন্য এবং আমার সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রীদের জন জন্য দু'আ করেছেন।'

হযরত যুবাইরের সবচেয়ে বড় পরিচয় ও সৌভাগ্য এই যে, তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারা অর্থাৎ দুনিয়াতে জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন।

তাল্‌হা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা)

আবু মুহাম্মাদ তাল্‌হা তাঁর নাম। পিতা উবাইদুল্লাহ এবং মাতা সা'বা। কুরাইশ গোত্রের তাইম শাখার সন্তান। হযরত আবু বকর (রা)ও ছিলেন এই তাইম কবীলার লোক। তাঁর মা সা'বা ছিলেন প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী হযরত 'আলা ইবনুল হাদরামীর বোন।

হযরত তালহা ইসলামের সূচনা পর্বেই মাত্র পনেরো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) দাওয়াতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। জাহিলী যুগে আবু বকরের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত বৈঠকের তিনি ছিলেন নিয়মিত সদস্য।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি বড় চমকপ্রদ। তিনি গেছেন কুরাইশদের বাণিজ্য কাফিলার সাথে সিরিয়া। তাঁরা যখন বসরা শহরে পৌঁছলেন, দলের অন্য কুরাইশ ব্যবসায়ীরা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাজারের বিভিন্ন স্থানে কেনা-বেচায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তিনি বাজারের মধ্যে ঘুরাফেরা করছেন, এমন সময় যে ঘটনাটি ঘটলো তা তালহার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। তিনি বলেন ঃ

'আমি তখন বসরার বাজারে। একজন খৃস্টান পাদরীকে ঘোষণা করতে শুনলাম ঃ ওহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! আপনারা এ বাজারে আগত লোকদের জিজ্ঞেস করুন, তাদের মধ্যে মক্কাবাসী কোন লোক আছে কিনা। আমি নিকটেই ছিলাম। দ্রুত তার কাছে গিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি মক্কার লোক।' জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে আহমাদ কি আত্মপ্রকাশ করেছেন?' বললাম 'কোন আহমাদ?' বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবন আবদিল মুত্তালিবের পুত্র। যে মাসে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন, এটা সেই মাস। তিনি হবেন শেষ নবী। মক্কায় আত্মপ্রকাশ করে কালো পাথর ও খেজুর উদ্যান বিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরাত করবেন। যুবক, খুব তাড়াতাড়ি তোমার তাঁর কাছে যাওয়া উচিত।' তালহা বলেন, 'তাঁর এ কথা আমার অন্তরে দারুণ প্রভাব সৃষ্টি করলো। আমি আমার কাফিলা ফেলে রেখে বাহনে সওয়ার হলাম। বাড়ীতে পৌঁছেই পরিবারের লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমার যাওয়ার পর মক্কায় নতুন কিছু ঘটেছে কি? তারা বললো ঃ 'হাঁ, মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে এবং আবু কুহাফার ছেলে আবু বকর তাঁর অনুসারী হয়েছে।'

তাল্‌হা বলেন, আমি আবু বকরের কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ কথাকি সত্যি যে, মুহাম্মাদ নবুওয়াত দাবী করেছেন এবং আপনি তাঁর অনুসারী হয়েছেন? বললেন ঃ হাঁ, তারপর তিনি আমাকেও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি তখন খৃস্টান পাদরীর ঘটনা তাঁর কাছে খুলে বললাম। অতঃপর তিনি আমাকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাদরীর কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। শুনে তিনি দারুণ খুশী হলেন। এভাবে আমি হলাম আবু বকরের হাতে ইসলাম গ্রহণকারী চতুর্থ ব্যক্তি।

তাল্‌হার ইসলাম গ্রহণে তাঁর মা বড় বেশী হৈ চৈ শুরু করলেন। কারণ, তাঁর বাসনা ছিল, ছেলে হবে গোত্রের নেতা। গোত্রীয় লোকেরা তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপাচাপি করে দেখলো তিনি পাহাড়ের মত অটল। সোজা আংগুলে ঘি উঠবে না ভেবে তারা নির্যাতনের পথ বেছে নিল। মাসুদ ইবন খারাশ বলেন ঃ 'একদিন আমি সাফা-মারওয়ার মাঝখানে দৌড়াচ্ছি, এমন সময় দেখলাম, একদল লোক হাত বাঁধা একটি যুবককে ধরে টেনে নিয়ে আসছে। তারপর তাকে উপুড় করে শুইয়ে তার পিঠে ও মাথায় বেদম মার শুরু করলো। তাদের পেছনে একজন বৃদ্ধ মহিলা চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে তাকে গালাগালি দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ছেলেটির এ অবস্থা কেন? তারা বললো ঃ এ হচ্ছে তাল্‌হা ইবন উবাইদুল্লাহ। পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে বনী হাশিমের সেই লোকটির অনুসারী হয়েছে। এ মহিলাটি কে? তারা বললো ঃ সা'বা বিনতু আল-হাদরামী— যুবকটির মা।'

কুরাইশদের সিংহ বলে পরিচিত নাওফিল ইবন খুয়াইলিদ তালহার কাছে এলো। তাঁকে একটি রশি দিয়ে বাঁধলো এবং সেই একই রশি দিয়ে বাঁধলো আবু বকরকেও। তারপর তাদের দু'জনকে সোপর্দ করলো মক্কার গোঁয়ার লোকদের হাতে নির্যাতন চালানোর জন্য। একই রশিতে তাঁদের দু'জনকে বাঁধা হয়েছে, তাই তাঁদেরকে বলা হয় 'কারীনান'।

ইসলাম গ্রহণের পর এভাবে তিনি আপনজন ও কুরাইশদের যুল্‌ম অত্যাচারের শিকার হন। দীর্ঘ তেরো বছর অসীম ধৈর্যের সাথে সবকিছু সহ্য করেন এবং একনিষ্ঠভাবে ইসলামের তাবলীগ ও প্রচারের কাজ চালিয়ে যান। তিনি মক্কার আশ পাশের উপত্যকায় বিদেশী অভ্যাগতদের সন্ধান করতেন, বেদুঈনদের তাঁবু এবং শহরের পরিচিত অংশীবাদীদের গৃহে চুপিসারে উপস্থিত হয়ে তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতেন। মক্কার 'দারুল আরকামে' অন্যদের মত তিনিও নিয়মিত যেতেন। ইসলাম ও মুসলমানদের এ দুঃসময়ে আল্লাহর দ্বীনের জন্য তিনি সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টা ও সাধনা করেছেন।

৬২২ সনের অক্‌টোবর মাসে আবু বকরকে সংগে করে রাসূল (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। তাঁদের এ দুর্গম সফরের পথ প্রদর্শক ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন উরায়কাত। তিনি তাঁদেরকে মদীনায় পৌঁছে দিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন এবং আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহর নিকট তাঁদের সফরের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন। হযরত আবু বকরের পরিবার-পরিজন মদীনায় হিজরাতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় হযরত তালহা ও সুহায়েব ইবন সিনান তাঁদের সাথে যোগ দেন। তালহা হলেন সেই কাফিলার আমীর। মদীনায় উপস্থিত হয়ে তালহা ও সুহায়েব হযরত আসয়াদ ইবন যারারার বাড়ীতে অবস্থান করতে থাকেন। ইবন হাজার বলেন ঃ হিজরাতের পূর্বে মক্কায় তালহা ও যুবাইরের মধ্যে রাসূল (সা) ভ্রাতৃ-সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন এবং হিজরাতের পর মদীনার প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী আবু আইউব আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অবশ্য অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায়, রাসূল (সা) কা'ব বিন মালিকের সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন এবং আপন ভায়ের মত আমরণ তাঁদের এ সম্পর্ক অটুট ছিল।

বদর যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও পরোক্ষভাবে করেছিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে গণীমতের হিস্সা দিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় একদল কাফির মদীনার মুসলিম জনপদের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছিল। রাসূল (সা) তাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য তালহাকে পাঠিয়েছিলেন। তালহা ছাড়াও সাত ব্যক্তিকে রাসূল (সা) বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছিলেন। এ কারণে প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তবে তাঁদেরকে বদরী হিসাবে গণ্য করা হয়।

হিজরী তৃতীয় সনে মক্কার মুশরিকদের সাথে সংঘটিত হয় উহুদের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে হযরত তালহা বীরত্ব ও সাহসিকতার নজীরবিহনী রেকর্ড স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন উহুদ যুদ্ধের হিরো। তীরন্দাজ বাহিনীর ভুলের কারণে মুসলিম বাহিনী যখন দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখন যে ক'জন মুষ্টিমেয় সৈনিক আল্লাহর রাসূলকে ঘিরে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন, তালহা তাদের অন্যতম। এ সময় হযরত আম্মার বিন ইয়াযিদ শহীদ হন। কাতাদা বিন নু'মানের চোখে কাফিরের নিক্ষিপ্ত তীর লাগলে চক্ষু কোটর থেকে মণিটি বের হয়ে তাঁর গণ্ডের ওপর ঝুলতে থাকে। 'আবু দুজানা রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তাঁর পুরো দেহটি ঢাল বানিয়ে নেন। এ সময় সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তীর ছুড়ছিলেন। আর তালহা এক হাতে তলোয়ার ও অন্যহাতে বর্শা নিয়ে কাফিরদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে আনসারদের বারোজন এবং মুহাজিরদের এক তালহা ছাড়া আর সকলে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাসূল (সা) পাহাড়ের একটি চূড়ায় উঠলেন, এমন সময় একদল শত্রুসৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেললো। রাসূল (সা) তাঁর সংগের লোকদের বললেন ঃ 'যে এদের হটিয়ে দিতে পারবে, জান্নাতে সে হবে আমার সাথী।' তালহা বললেন ঃ আমি যাব ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূল (সা) বললেন ঃ না, তুমি থাম। একজন আনসারী বললো ঃ আমি যাব। বললেন ঃ হাঁ, যাও। আনসারী গেলেন এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। এভাবে বার বার রাসূল (সা) আহ্বান জানালেন এবং প্রত্যেক বারই, তালহা যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, কিন্তু রাসূল (সা) তাঁকে নিবৃত্ত করে একজন আনসারীকে পাঠালেন। এভাবে এক এক করে যখন আনসারীদের সকলে শাহাদাৎ বরণ করলেন, তখন রাসূল (সা) তালহাকে বললেন ঃ এবার তোমার পালা, যাও।

হযরত তালহা আক্রমণ চালালেন। রাসূল (সা) আহত হলেন, তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হলো এবং তিনি রক্ত রঞ্জিত হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় তালহা একাকী একবার মুশরিকদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে একটু দূরে তাড়িয়ে দেন, আবার রাসূলের (সা) দিকে ছুটে এসে তাকে কাঁধে করে পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠতে থাকেন এবং এক স্থানে রাসূলকে (রা) রেখে আবার নতুন করে হামলা চালান। এভাবে সেদিন তিনি মুশরিকদের প্রতিহত করেন। হযরত আবু বকর বলেন ঃ এ সময় আমি ও আবু উবাইদা রাসূল (সা) থেকে দূরে সরে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা রাসূলের (সা) নিকট ফিরে এসে তাঁকে সেবার জন্য এগিয়ে গেলে তিনি বললেন ঃ 'আমাকে ছাড়, তোমাদের

বন্ধু তালহাকে দেখো'। আমরা তাকিয়ে দেখি, তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় একটি গর্তে অজ্ঞান হয়ে আছেন। তাঁর একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রায় এবং সারা দেহে তরবারী ও তীর বর্শার সত্তরটির বেশী আঘাত। তাই পরবর্তীকালে রাসূল (সা) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন ঃ যদি কেউ কোন মৃত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াতে দেখে আনন্দ পেতে চায়, সে যেন তালহা ইবন উবাইদুল্লাহকে দেখে। এ কারণে তাঁকে জীবিত শহীদ বলা হতো। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) উহুদ যুদ্ধের প্রসংগ উঠলেই বলতেন ঃ 'সে দিনটির সবটুকুই তালহার।' এ যুদ্ধে হযরত তালহার কাজে আল্লাহর রাসূল (সা) এত প্রীত হন যে তিনি তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুসংবাদ দান করেন।

পঞ্চম হিজরী সনের যিলকাদ মাসে আরবের বিভিন্ন গোত্র ও ইহুদীদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা আক্রমণের তোড়জোড় শুরু করে। এদিকে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে সালা পর্বতের পাশ দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে পাঁচ হাত গভীর খন্দক খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ খন্দক খননের কাজে হযরত তালহাকেও ব্যস্ত দেখা যায়। খন্দক খননের কাজ শেষ হতে না হতেই মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা অবরোধ করে। এদিকে মদীনার অভ্যন্তরে ইহুদী গোত্রগুলি, বিশেষতঃ বনু কুরাইজা চুক্তি ভংগ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ সময় মুসলমানরা ভিতর ও বাইরের শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতে কিছু সংখ্যক মুসলমান স্ত্রী-পুত্র পরিজনের নিরাপত্তার চিন্তায় স্বাভাবিকভাবেই একটু অস্থির হয়ে পড়েন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানের মনোবল এবং আল্লাহর প্রতি তাঁদের ঈমান অটল থাকে। তাঁরা নিজেদের জান-মাল সবকিছু আল্লাহর পথে কুরবানী করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। হযরত তালহা ছিলেন শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা সূরা আহযাবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকুতে মুসলমানদের এ সময়কার মানসিক চিত্র সুন্দরভাবে অংকন করেছেন।

খন্দকের ধারে দাঁড়িয়ে কতিপয় মুসলমান আলাপ-আলোচনা করছে। হযরত তালহা যাচ্ছেন পাশ দিয়ে। তাঁর কানে ভেসে এলো, একজন বলছে ঃ আমাদের স্ত্রী পরিজনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত। হযরত তালহা একটু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ 'আল্লাহু খায়রুন হাফিজান'— আল্লাহ সর্বোত্তম নিরাপত্তা বিধানকারী। যারা নিজেদের শক্তি ও বাহুবলের ওপর ভরসা করেছে, ব্যর্থ হয়েছে। লোকেরা বললো ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। তারা তাদের উদ্দেশ্য থেকে বিরত থাকলো।

বাইয়াতে রিদওয়ান, খাইবার ও মুতাসহ সব অভিযানেই তিনি অংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। মক্কা বিজয়ের দিন মুহাজিরদের যে ক্ষুদ্র দলটির সাথে রাসূল (সা) মক্কায় প্রবেশ করেন, তালহা ছিলেন সেই দলে এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথেই তিনি পবিত্র কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

দশম হিজরী সনের ২৫শে যুলকা'দা রাসূল (সা) হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা শুরু করেন। এটাই ছিল ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জ। রাসূলুল্লাহর (সা) সফর সংগী হন তালহাও। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যুলহুলায়ফা পৌঁছে ইহরাম বাঁধেন। এ সফরে একমাত্র রাসূল (সা) ও তালহা ছাড়া আর কারও সংগে কুরবানীর পশু ছিলনা। (সহীহুল বুখারী ঃ কিতাবুল হজ্জ)।

প্রিয় নবীর ইন্তিকালে হযরত তালহা দারুণ আঘাত পান। রাসূলুল্লাহর (সা) শোকে তিনি কাতর হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে বলতেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা সকল মুসীবতে ধৈর্য ধরার হুকুম দিয়েছেন, তাই তাঁর বিচ্ছেদে 'সবরে জামীল' অবলম্বনের চেষ্টা করি এবং সংগে সংগে আল্লাহর কাছে তাওফীকও কামনা করি।'

হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে তিনি তাঁর বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। চিন্তা, পরামর্শ ও কাজের মাধ্যমে সব ব্যাপারে তিনি তাঁকে সাহায্য করেন। রিদ্দার যুদ্ধের সময় অনেক বিশিষ্ট সাহাবী যাকাত আদায় করতে অস্বীকারকারী বেদুইনদের সাথে কিছুটা কোমল আচরণ করার জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা না করার জন্য প্রথমতঃ খলীফাকে পরামর্শ দেন। কিন্তু হযরত তালহা স্পষ্ট করে বলে দেন ঃ 'যে দ্বীনে যাকাত থাকবে না তা সত্য ও সঠিক হতে পারে না।'

হিজরী ১৩ সনের জামাদিউস সানী মাসে হযরত আবু বকর (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে লাগলো। একদিন হযরত তালহা গেলেন তাঁকে দেখতে। তিনি উপস্থিত হলে কিছুক্ষণ নিরবতার পর উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত কথা হয় ঃ

– উমারকে কি স্থলাভিষিক্ত করবো? আবু মুহাম্মাদ (তালহা), আপনার মত কি?

– সাহাবীদের মধ্যে উমার সর্বোত্তম গুণের অধিকারী, তিনি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী।

– তাঁকে আমার স্থলাভিষিক্ত করার ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ চেয়েছি।

– তাঁর স্বভাবে কিছুটা কঠোরতা আছে এবং তিনি একটু বেশী কড়াকড়ি আরোপ করে থাকেন।

– তাঁর মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে?

– আপনার সময়ে তিনি যখন এত কঠোর, আপনার পরে স্বীয় দায়িত্বানুভূতিতে না জানি কত বেশী কঠোর হয়ে পড়েন।

– তাঁর ওপর যখন খিলাফতের গুরু দায়িত্ব এসে পড়বে, তিনি নরম হয়ে যাবেন।

সবশেষে তালহা বললেন ঃ তাঁর গুণাবলী ও যোগ্যতা যে সকলের থেকে বেশী, সে ব্যাপারে আমার দ্বিমত নেই। তাঁর স্বভাবের একটি দিক সম্পর্কে আমার যা প্রতিক্রিয়া তা ব্যক্ত করতে আমি কার্পণ্য করিনি।

হিজরী ১৩ সনে হযরত 'উমার খলীফা হলেন। তিনিও হযরত তালহাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিলেন এবং সর্বদা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে উপকৃত হলেন।

ইরাক বিজয়ের পর সেখানকার কৃষি জমি গণীমতের মালের মত মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করা হবে কি হবে না, এ প্রশ্নে সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। একদল বললেন, ভাগ করাই উচিত হবে। কিন্তু খলীফা সহ অন্য একটি দল ছিলেন ভাগের বিরোধী। অতঃপর মজলিসে শূরার বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর খলীফার মতই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এ ব্যাপারে হযরত তালহা শূরার বৈঠকে দ্ব্যর্থহীনভাবে খলীফার মতকে সমর্থন করে জোরালো বক্তব্য রাখেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমারের (রা) ওফাতের পূর্বে যে ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীর ওপর তাঁদের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে যান, তার মধ্যে হযরত তালহাও ছিলেন। কিন্তু তিনি আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নিজে খিলাফাতের দাবী থেকে সরে দাঁড়ান এবং হযরত উসমানের সমর্থনে নিজের ভোটটি প্রদান করেন।

হযরত উসমান (রা) বিদ্রোহীদের দ্বারা গৃহবন্দী হলেন। একদিন তিনি ঘরের জানালা দিয়ে মাথা বের করে বিদ্রোহী গ্রুপ ও মদীনার সমবেত লোকদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখলেন। এক পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কি তালহা আছেন? কেউ কোন উত্তর দিল না। এভাবে যখন তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তখন হযরত তালহা উঠে দাঁড়ালেন। হযরত উসমান তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ এ জনতার মধ্যে আপনার উপস্থিতি এবং তিনবার জিজ্ঞেস করার পর সাড়া দেবেন, এমন আশা আমি করিনি। আমি আপনাকে আল্লাহর নামে জিজ্ঞেস করছি, একদিন অমুক স্থানে, যখন রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে আমি ও আপনি ছাড়া আর কেউ ছিল না, রাসূল (সা) আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ তালহা, প্রত্যেক নবীরই তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে জান্নাতে একজন সংগী থাকবে। উসমান ইবন আফফানই হবে জান্নাতে আমার সংগী। সে কথা আপনার স্মরণ আছে? তালহা সায় দিলেন, হাঁ। তারপর তিনি জনতার ভেতর থেকে উঠে চলে গেলেন।

হযরত উসমান শহীদ হলেন। মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে কিসাস দাবী করলেন। হযরত তালহা ও যুবাইর মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে হযরত আয়িশার (রা) সাথে মিলিত হলেন। উসমানের হত্যাকারীদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে তারা বসরায় উপনীত হলেন। বসরার উপকণ্ঠেই তারা হযরত আলীর (রা) সেনাবাহিনীর মুখোমুখী হলেন। হযরত কা'কা ইবন 'আমরের মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হলো। হযরত আলী, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা, তালহা ও যুবাইর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছলেন। উভয় পক্ষ তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললো। কিন্তু চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকারী ইহুদী ইবন সাবার লোকেরা এতে প্রমাদ গুণলো। মূলতঃ তারাই ছিল হযরত উসমানের হত্যাকারী। তারা হযরত আলীর সেনাবাহিনীর মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। রাতের অন্ধকারে তারা একদিকে হযরত আয়িশার এবং অন্য দিকে হযরত আলীর সেনাবাহিনীর ওপর তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। উভয় পক্ষের সৈন্যরা শান্তিচুক্তির সিদ্ধান্ত হওয়ায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অতর্কিত এ আক্রমণে ঘুম থেকে জেগে তারা মনে করলো প্রতিপক্ষ আক্রমণ শুরু করেছে। ইহুদী ইবন সাবার চক্রান্ত সফল হলো। সকাল হতে না হতে তুমুল লড়াই বেঁধে গেল এবং ইতিহাসে এ লড়াই 'উটের যুদ্ধ' নামে খ্যাত হলো। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় দশ মতান্তরে তের হাজার লোক নিহত হলেন। এ যুদ্ধের সূচনা লগ্নেই সাবায়ীদের নিক্ষিপ্ত একটি তীর হযরত তালহার পায়ে বিঁধে। ক্ষত স্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না দেখে হযরত কা'কা ইবন আমর তাঁকে অনুরোধ করলেন বসরার 'দারুল ইলাজে' (হাসপাতাল) চলে যাওয়ার জন্য। তাঁরই অনুরোধে তিনি একটি

চাকরকে সংগে করে 'দারুল ইলাজে' চলে যান। কিন্তু ইত্যবসরে তাঁর দেহ রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। সেখানে পৌঁছার কিছুক্ষণ পরেই তিনি ইনতিকাল করেন। বসরাতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

ইবন আসাকির বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, উটের যুদ্ধের দিন মারওয়ান ইবনুল হিকামের নিক্ষিপ্ত তীরে হযরত তালহা আহত হন। হিজরী ৩৬ সনের জামাদিউল আউয়াল মতান্তরে ১০ই জামাদিউস সানী ৬৪ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

হযরত তালহা ছিলেন একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী। কিন্তু সম্পদ পুঞ্জিভূত করার লালসা তাঁর ছিলনা। তাঁর দানশীলতার বহু কাহিনী ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইতিহাসে তাঁকে 'দানশীল তালহা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একবার হাদরামাউত থেকে সত্তর হাজার দিরহাম তাঁর হাতে এলো। রাতে তিনি বিমর্ষ ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী হযরত আবু বকরের (রা) কন্যা উম্মু কুলসুম স্বামীর এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

– আবু মুহাম্মদ, আপনার কী হয়েছে? মনে হয় আমার কোন আচরণে আপনি কষ্ঠ পেয়েছেন।

– না, একজন মুসলমান পুরুষের স্ত্রী হিসেবে তুমি বড় চমৎকার। কিন্তু সেই সন্ধ্যা থেকে আমি চিন্তা করছি, এত অর্থ ঘরে রেখে ঘুমালে একজন মানুষের তার পরওয়ারদিগারের প্রতি কিরূপ ধারণা হবে?

– এতে আপনার বিষণ্ন ও চিন্তিত হওয়ার কি আছে? এত রাতে গরীব-দুঃখী ও আপনার আত্মীয় পরিজনদের কোথায় পাবেন? সকাল হলেই বন্টন করে দেবেন।

– আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন! একেই বলে, বাপ কি বেটী।

পরদিন সকাল বেলা ভিন্ন ভিন্ন থলি ও পাত্রে সকল দিরহাম ভাগ করে মুহাজির ও আনসারদের গরীব মিসকীনদের মধ্যে তিনি বন্টন করে দেন। তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে অপর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি হযরত তালহার নিকট এসে তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে কিছু সাহায্য চাইলো। তালহা বললেন ঃ অমুক স্থানে আমার একখণ্ড জমি আছে। উসমান ইবন আফফান উক্ত জমির বিনিময়ে আমাকে তিন লাখ দিরহাম দিতে চান। তুমি ইচ্ছে করলে সেই জমিটুকু নিতে পার বা আমি তা বিক্রি করে তিন লাখ দিরহাম তোমাকে দিতে পারি। লোকটি মূল্যই নিতে চাইলো। তিনি তাঁকে বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ দান করেন।

আবদুর রহমান ইবন 'আউফ (রা)

ইমাম বুখারীর মতে জাহিলী যুগে আবদুর রহমান ইবন 'আউফের নাম ছিল 'আবদু 'আমর। ইবন সা'দ তাঁর *'তাবাকাতে'* উল্লেখ করেছেন, জাহিলী যুগে তাঁর নাম ছিল 'আবদু কা'বা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা) তাঁর নাম রাখেন 'আবদুর রহমান'। তাঁর মাতা-পিতা উভয়ে ছিলেন 'যুহরা' গোত্রের লোক। মাতার নাম শিফা বিনতু 'আউফ। দাদা ও নানা উভয়ের নাম 'আউফ।

ইবন সা'দ ওয়াকিদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি 'আমুল ফীলের (হস্তীর বৎসর) দশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। এ বর্ণনার ভিত্তিতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বয়সে দশ বছর ছোট। রাসূল (সা) 'আমুল ফীলের ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ইবন হাজার তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) তের বছর ছোট বলে উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর প্রথম পর্যায়ে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি তাঁদেরই একজন। মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রায় প্রতিদিনই হযরত আবু বকরের বাড়ীতে বৈঠকে মিলিত হতেন। আবদুর রহমানও ছিলেন এ বৈঠকের একজন নিয়মিত সদস্য। আবু বকরের সাথে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। আবু বকরের দাওয়াতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বকরের বাড়ীর এ বৈঠকের নিয়মিত পাঁচজন সদস্যের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন ঃ উসমান, সা'দ, তালহা, যুবাইর এবং আবদুর রহমান। তাঁদের সকলেই আবু বকরের দাওয়াতে প্রথম পর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের জন্য অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেন।

নবুওয়াতের পঞ্চম বছর রজব মাসে, যে এগারজন পুরুষ ও চারজন নারীর প্রথম কাফিলাটি মক্কা থেকে হাবশায় হিজরাত করে তার মধ্যে আবদুর রহমানও ছিলেন। আবার রাসূলের (সা) মদীনায় হিজরাতের পর তিনিও মদীনায় হিজরাত করেন। যাঁরা হাবশা ও মদীনা দু'স্থানেই হিজরাত করেছিলেন তাঁদেরকে বলা হয় 'সাহিবুল হিজরাতাইন'। মদীনায় তিনি হযরত সা'দ ইবন রাবী' আল-খাযরাজীর গৃহে আশ্রয় নেন এবং তাঁর সাথেই রাসূল (সা) ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করে দেন। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী একাধিক সনদের মাধ্যমে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ হিজরাত করে মদীনায় এলে রাসূল (সা) সা'দ ইবন রাবী'র সাথে তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্ক কায়েম করে দেন। সা'দ ছিলেন মদীনার খাযরাজ গোত্রের নেতা ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি আবদুর রহমানকে বললেন, 'আনসারদের সকলে জানে আমি একজন ধনী ব্যক্তি। আমি আমার সকল সম্পদ সমান দু'ভাগে ভাগ করে দিতে চাই। আমার দু'জন স্ত্রী আছেন। আমি চাই, আপনি তাদের দু'জনকে দেখে একজনকে পছন্দ করুন। আমি তাকে তালাক দেব। তারপর আপনি তাকে বিয়ে করে নেবেন।' আবদুর রহমান বললেন ঃ 'আল্লাহ্ আপনার পরিজনের মধ্যে বরকত ও কল্যাণ দান করুন! ভাই, এসব কোন কিছুর প্রয়োজন আমার নেই। আমাকে শুধু বাজারের পথটি দেখিয়ে দিন।'

ইসলামী ভ্রাতৃত্বে হযরত সা'দের এ দৃঢ় আস্থা ও অতুলনীয় উদারতার দৃষ্টান্ত ইসলামী উম্মাহ তথা মানব জাতির ইতিহাসে বিরল। অন্যদিকে হযরত আবদুর রহমানের মহত্ত্ব, আত্মনির্ভরতা ও নিজ পায়ে দাঁড়ানোর দৃঢ় সংকল্পও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মদীনায় অবস্থানের দ্বিতীয় দিন আবদুর রহমান তাঁর আনসারী ভাই সা'দকে জিজ্ঞেস করলেন, "বেচাকেনা হয় এমন কোন বাজার কি এখানে আছে?" বললেন ঃ "হাঁ, ইয়াসরিবে (মদীনায়) কায়নুকার বাজার তো আছে।" হযরত আবদুর রহমান এক স্থান থেকে কিছু ঘি ও পনির খরিদ করে বাজারে যান। দ্বিতীয় দিনও তিনি এমনটি করলেন। এভাবে তিনি বেচাকেনা জারি রাখেন। কিছু পয়সা হাতে জমা হলে তিনি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেন।

বিয়ের পর তিনি একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। তাঁর কাপড়ে হলুদের দাগ দেখে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বিয়ে করেছ?' বললেন, 'হাঁ'। জিজ্ঞেস করলেন কাকে?' তিনি বললেন, 'এক আনসারী মহিলাকে।' রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'মোহর কত নির্ধারণ করেছ?' তিনি বললেন, 'কিছু সোনা।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'একটি ছাগল দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করে নাও।'

তিনি ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকলেন। কিছুদিন পর তার হাতে আরও কিছু অর্থ জমা হলে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশমত ওয়ালিমার কাজটি সেরে নেন। ধীরে ধীরে তাঁর ব্যবসা আরও সম্প্রসারিত হয়। মক্কার উমাইয়া ইবন খালফের সাথে একটি ব্যবসায়িক চুক্তিও সম্পাদন করেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবন 'আউফ বদর, উহুদ ও খন্দক সহ সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন। ইমাম বুখারী 'কিতাবুল মাগাযী'তে বদর যুদ্ধের একটি ঘটনা তাঁরই যবানে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "বদর যুদ্ধে, আমি সারিতে দাঁড়িয়ে। তুমুল লড়াই চলছে। আমি ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে আমার দু'পাশে দুই নওজোয়ানকে দেখলাম। তাদের ওপর আমার খুব একটা আস্থা হলো না। তাদের একজন ফিসফিস করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ "চাচা, বলুন তো আবু জাহল কোন দিকে?" বললাম, "ভাতিজা, তাকে দিয়ে কি করবে?" সে বলল, "আমি আল্লাহর সাথে অংগীকার করেছি, হয় আমি তাকে কতল করবো, না হয় এ উদ্দেশ্যে আমার নিজের জীবন কুরবান করবো।" একই কথা ফিসফিস করে আমাকে বলল অন্যজনও। আবদুর রহমান বলেন, "তাদের কথা শোনার পর আমার আনন্দ হলো এই ভেবে যে, কত মহান দু'ব্যক্তির মাঝখানেই না আমি দাঁড়িয়ে। আমি ইশারা করে আবু জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। অকস্মাৎ তারা দু'জন একসাথে বাজপাখীর মত আবু জাহলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যেই তাকে কতল করে। এ দু'নওজোয়ান ছিল 'আফরার দু'পুত্র মুয়ায ও মু'য়াওবিয।' বদর যুদ্ধে আবদুর রহমান পায়ে আঘাত পান।

উহুদের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধেও তিনি অসম সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। রাসূল (সা) উহুদ পর্বতের এক কোণে আশ্রয় নিয়েছেন, উবাই ইবন খালফ এগিয়ে এলো আল্লাহর রাসূলকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে। আবদুর রহমান তাকে জাহান্নামে পাঠাবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলে রাসূল (সা) তাঁকে বাধা দেন। অতঃপর রাসূল

(সা) নিজেই হারিস ইবন সাম্মার নিকট থেকে বর্শা নিয়ে উবাই ইবন খালফের গর্দানে ছুড়ে মারেন। সামান্য আহত হয়ে সে চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে যায় এবং মক্কার পথে 'সারফ' নামক স্থানে নরক যাত্রা করে।

ইবন সা'দ *'তাবাকাতুল কুবরা'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, উহুদের যুদ্ধে আবদুর রহমান অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। বালাযুরী তাঁর ফুতুহুল বুলদান, ইবনে হাজার তাঁর আল-ইসাবা এবং ইবন খালদুন তাঁর তারীখে বর্ণনা করেছেন, এ যুদ্ধে তিনি সারা দেহে মোট একত্রিশটি আঘাত পান।

ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে রাসূল (সা) মদীনা থেকে প্রায় তিন শো মাইল উত্তরে 'দুমাতুল জান্দালে' একটি অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব দেন আবদুর রহমানকে। যাত্রার পূর্বে তিনি উপস্থিত হলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট। রাসূল (সা) নিজ হাতে আবদুর রহমানের মাথার পাগড়ীটি খুলে রেখে দিয়ে অন্য একটি কালো পাগড়ী তার মাথায় বেঁধে দেন। তারপর যুদ্ধের পলিসি সংক্রান্ত কিছু হিদায়াত দিয়ে তিনি আবদুর রহমানকে (রা) বিদায় দেন।

মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাজিরদের যে ছোট্ট দলটির সংগে ছিলেন, আবদুর রহমানও ছিলেন সেই দলে।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সা) আরব উপদ্বীপে দাওয়াতী কাজের জন্য কতকগুলি তাবলীগী গ্রুপ বিভিন্ন দিকে পাঠান। তখনও আরব গোত্রগুলি মূর্খতা ও আসাবিয়্যাতের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এ কারণে রাসূল (সা) তাবলীগী গ্রুপগুলিকে সশস্ত্র অবস্থায় পাঠালেন। যাতে প্রয়োজনে তারা আত্মরক্ষা করতে পারে। এরকম তিরিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি দলকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে বনু খুযায়মার লোকদের নিকট পাঠানো হলো। কিন্তু হযরত খালিদ ও বনু খুযায়মার মধ্যে ভুল বুঝা-বুঝি সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে হযরত খালিদ বনু খুযায়মার ওপর হামলা করে তাদের বহু লোককে হতাহত করেন। এ ঘটনা অবগত হয়ে রাসূল (সা) হযরত খালিদকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাঁর ভুলের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করেন। রাসূল (সা) নিহত ব্যক্তিদের দিয়াত আদায় করেন। এমন কি কারও একটি কুকুরও মারা গিয়ে থাকলে তারও বিনিময় মূল্য আদায় করা হয়।

বনু খুযায়মার এ দুর্ঘটনা নিয়ে খালিদ ও আবদুর রহমানের মধ্যে বচসা ও বিতর্ক হয়। এ কথা রাসূল (সা) অবগত হয়ে খালিদকে ডেকে তিরস্কার করেন। তিনি বলেন, 'তুমি সাবেকীনে আওয়ালীন' (প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী) একজন সাহাবীর সাথে ঝগড়া ও তর্ক করেছ। এমনটি করা তোমার শোভন হয়নি। আল্লাহর কসম, যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনার মালিকও তুমি হও এবং তার সবই আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দাও, তবুও তুমি আমার সেসব প্রবীণ সাহাবীর একজনেরও সমকক্ষ হতে পারবে না।' উল্লেখ থাকে যে, হযরত খালিদ আহযাবের যুদ্ধের পর ষষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

নবম হিজরীতে তাবুক অভিযানের সময় মুসলমানগণ যে ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হয় সে পরীক্ষায়ও তিনি কৃতকার্য হন। রাসূলুল্লাহর (সা) আবেদনে সাড়া দিয়ে এ অভিযানের জন্য হযরত আবু বকর, উসমান ও আবদুর রহমান (রা) রেকর্ড পরিমাণ অর্থ প্রদান

করেন। আবদুর রহমান আট হাজার দিনার রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দিলে মুনাফিকরা কানাঘুষা শুরু করে দেয়। তারা বলতে থাকে, 'সে একজন রিয়াকার– লোক দেখানোই তার উদ্দেশ্য।' তাদের জবাবে আল্লাহ বলেন, 'এ তো সেই ব্যক্তি যার ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হতে থাকবে।' (সূরা তাওবাহ-৭১) অন্য একটি বর্ণনায় আছে, উমার (রা) তাঁর এ দান দেখে বলে ফেলেন, 'আমার মনে হচ্ছে আবদুর রহমান গুনাহগার হয়ে যাচ্ছে। কারণ, সে তার পরিবারের লোকদের জন্য কিছুই রাখেনি।' একথা শুনে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেন, 'আবদুর রহমান, পরিবারের জন্য কিছু রেখেছ কি?' তিনি বলেন, 'হাঁ। আমি যা দান করেছি তার থেকেও বেশী ও উৎকৃষ্ট জিনিস তাদের জন্য রেখেছি।' রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'কত?' বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে রিযিক, কল্যাণ ও প্রতিদানের অংগীকার করেছেন, তাই।'

এ তাবুক অভিযানকালে একদিন ফজরের নামাযের সময় রাসূল (সা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে যান। ফিরতে একটু দেরী হয়। এদিকে নামাযের সময়ও হয়ে যায়। তখন সমবেত মুসল্লীদের অনুরোধে আবদুর রহমান ইমাম হিসাবে নামাযে দাঁড়িয়ে যান। এদিকে রাসূল (সা) ফিরে এলেন, এক রাকায়াত তখন শেষ। আবদুর রহমান রাসূলুল্লাহর (সা) উপস্থিতি অনুভব করে পেছন দিকে সরে আসার চেষ্টা করেন। রাসূল (সা) তাঁকে নিজের স্থানে থাকার জন্য হাত ইশারা করেন। অতঃপর অবশিষ্ট দ্বিতীয় রাকায়াতটিও তিনি শেষ করেন এবং রাসূল (সা) তাঁর পেছনে ইকতিদা করেন। ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) অন্তিম রোগশয্যায়। জীবনের আশা আর নেই। তাঁর পর খলীফা কে হবেন সে সম্পর্কে চিন্তাশীল বিশিষ্ট সাহাবীদের ডেকে পরামর্শ করলেন। হযরত আবদুর রহমানের সাথেও পরামর্শ করেন এবং হযরত উমারের কিছু গুণাবলী তুলে ধরে পরবর্তী খলীফা হিসাবে তাঁর নামটি তিনি প্রস্তাব করেন। আবদুর রহমান ধৈর্য সহকারে খলীফার কথা শুনার পর বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তবে স্বভাবগতভাবেই তিনি একটু কঠোর।

হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে আটজন বিশিষ্ট সাহাবীকে ফাতওয়া ও বিচারের দায়িত্ব প্রদানের সাথে সাথে অন্য সকলকে ফাতওয়া দান থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। আবদুর রহমান ছিলেন এ আটজনের একজন।

হযরত উমারও তাঁর খিলাফতকালে জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অধিকারী সাহাবীদের ছাড়া অন্য সকলকে বিচার কাজ থেকে বিরত রাখেন। এমনকি যে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদকে তিনি 'খাযিনাতুল ইলম' (জ্ঞানের ভাণ্ডার) বলে অভিহিত করতেন, তিনিও যখন পূর্ব অনুমতি ছাড়াই ফাতওয়া দিতে শুরু করেন, তাঁকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। জ্ঞানের যে শাখায় যিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন হযরত উমার তাকেই কেবল সে বিষয়ে মতামত প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেন। এ সম্পর্কে সিরিয়া সফরকালে 'জাবিয়া' নামক স্থানে এক বক্তৃতায় বলেন, 'যারা কুরআন বুঝতে চায়, তারা উবাই বিন কা'ব, যারা ফারায়েজ সম্পর্কে জানতে চায়, তারা যায়িদ বিন সাবিত এবং যারা ফিক্হ সংক্রান্ত

বিষয়ে অবগত হতে চায়, তারা মুয়ায বিন জাবাল ও আবদুর রহমান বিন 'আউফের সাথে যেন সম্পর্ক গড়ে তোলে।"

খলীফা হযরত উমার হযরত আবদুর রহমানকে বিশেষ উপদেষ্টার মর্যাদা দেন। রাতে তিনি যখন ঘুরে ঘুরে নগরের মানুষের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন, অনেক সময় সংগে নিতেন হযরত আবদুর রহমানকে এবং নানা বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন।

একদিন রাতে খলীফা উমার বের হলেন আবদুর রহমানকে সংগে নিয়ে নগর পরিভ্রমণে। দূর থেকে তাঁরা লক্ষ্য করলেন একটি বাড়ীতে আলো। কাছে গিয়ে দেখলেন বাড়ীর দরজা-জানালা সব বন্ধ; কিন্তু ভেতর থেকে কিছু লোকের উচ্চকণ্ঠ ভেসে আসছে। খলীফা উমার আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ভেতর থেকে আসা আওয়ায শুনতে পাচ্ছেন?'

– 'জী হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।'

– 'কি বলছে, তা-কি বুঝতে পারছেন?'

– 'সমবেত কণ্ঠের আওয়ায। কেবল শোরগোল শোনা যাচ্ছে। কি বলছে তা বুঝা যাচ্ছে না।'

– 'আপনি কি জানেন বাড়ীটি কার?'

– 'বাড়ীটি তো রাবীয়া' ইবন উমাইয়্যার।'

উমার বলেন, 'সম্ভবতঃ তারা মদপান করে মাতলামি করছে। আপনার কি মনে হয়?'

– "আল্লাহ্ আমাদেরকে গুপ্তচরবৃত্তি থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ওয়ালা তাজাস্‌সাসূ (গুপ্তচর বৃত্তি করোনা) এবং ওয়ালা তাকফু মা লাইসা লাকা বিহি ইলমুন (যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না)।"

এ কথা শুনে উমার বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন এবং যথাসময়ে স্মরণ করে দিয়েছেন।'– এই বলে তিনি আবদুর রহমানকে সংগে নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। হযরত আবদুর রহমান এ ক্ষেত্রে যে আয়াত দু'টি আমীরুল মুমিনীনকে স্মরণ করে দেন, তা হচ্ছে মুসলিম সমাজ জীবনে ব্যক্তির বুনিয়াদী অধিকারের প্রাণস্বরূপ।

১৬ হিজরী সনে ইরাক বিজয়ের ফলে ইরাকে কিসরা শাহানশাহীর পতন হয় এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর সিরিয়া থেকে রোমের কাইসার সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। খলীফা জিযিয়া ও খারাজ নির্ধারণের ব্যাপারে উদ্যোগী হন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ, বিলাল ও আবদুর রহমানের প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হন। অবশেষে মজলিসে শূরার ক্রমাগত বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর খলীফার মতামতই গৃহীত হয়।

খলীফা হযরত উমার রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের ভাতা নির্ধারণের ইচ্ছা করলেন। এ ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করলেন হযরত আবদুর রহমানের নিকট। তিনি পরামর্শ দিলেন, কুষ্ঠি বিদ্যায় পারদর্শী তিন ব্যক্তি– মাখযামা ইবন নাওফিল, খায়বর ইবন মাতয়াম এবং আকীল ইবন আবু তালিবের ওপর একটি তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণের জন্য। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী খলীফা তাঁদেরকে দায়িত্ব প্রদান করলেন। তাঁরা তালিকা প্রণয়ন করে

খলীফার নিকট পেশ করলে আমীরুল মুমিনীন ও আবদুর রহমান দু'জনেই তা পরীক্ষা করেন। হযরত উমার তালিকা দেখার পর বললেন, "বর্তমান তালিকার ক্রমধারা পরিবর্তন করে আমার নিজের ও আমার গোত্রীয় অন্য লোকদের নাম রাসূলের (সা) সাথে বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে যখন আসবে তখন লিখবে"। হযরত আলী ও হযরত আবদুর রহমান আপত্তি করে বললেন, "আপনি আমীরুল মুমিনীন। তালিকার সূচনা আপনার নাম দিয়েই হওয়া উচিত।" তিনি বললেন, "না। রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা 'আব্বাস (রা) থেকে শুরু কর, তারপর আলীর (রা) নামটি লিখ।" ভাতার পরিমাণ তিনি আবদুর রহমানের সাথে পরামর্শ করেই নির্ধারণ করেন। তারপর তা মজলিসে শূরায় পেশ করেন।

আযওয়াজে মুতাহ্হারাত (রাসূলুল্লাহর সা. সহধর্মিগণ) বেশ আগে থেকেই হজ্জ্ব পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। তেইশ হিজরী সনে খলীফা উমার তাঁদের হজ্ব আদায়ের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেন। তিনি নিজেও তাঁদের সফরসংগী হন। তাঁদের সফর ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব হযরত আবদুর রহমান ও হযরত উসমানের (রা) ওপর অর্পণ করেন। সফরের সময় আবদুর রহমান কাফিলার আগে এবং উসমান পেছনে সশস্ত্র অবস্থায় পাহারা দিয়ে চলতেন। কোন ব্যক্তিকে তাঁদের উটের কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। তাঁরা যখন কোথাও অবস্থান করতেন, এরা দু'জন তাঁবুর প্রহরায় নিয়োজিত থাকতেন।

হযরত উমার তাঁর খিলাফতের প্রথম বছর আবদুর রহমানকে আমীরে হজ্জ নিয়োগ করে মক্কায় পাঠান। আর তাঁর সাথে পাঠান নিজের পক্ষ থেকে কুরবানীর একটি পশু। এ বছর বিশ্ব মুসলিম তাঁর নেতৃত্বেই হজ্ব আদায় করে।

খলীফা হযরত উমার (রা) ফজরের জামায়াতে ইমামতি করছিলেন। মুগীরা ইবন শু'বার পারসিক দাস ফিরোয তাকে ছুরিকাঘাত করে। আহত অবস্থায় সংগে সংগে তিনি পেছনে দণ্ডায়মান আবদুর রহমানের হাতটি ধরে নিজের স্থানে তাঁকে দাঁড় করে দেন এবং তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অতপর আবদুর রহমান অবশিষ্ট নামায দ্রুত শেষ করেন।

হযরত উমার আহত হওয়ার দশ ঘন্টা পর সমবেত লোকদের বললেন, 'আপনারা যেমন বলতেন আমিও চাচ্ছিলাম, এ উম্মাতের বোঝা বহনের ক্ষমতা রাখে এমন এক ব্যক্তি আমি আমীর বানিয়ে যাই। পরে আমি চিন্তা করলাম, এমনটি করলে আমার মৃত্যুর পরও এর দায়-দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে। এ কারণে, আমার সাহস হলো না। এ ছ'ব্যক্তি– আলী, উসমান, আবদুর রহমান, সা'দ, যুবাইর ও তালহা। আল্লাহর রাসূল (সা) তাদেরকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। তাদের কোন একজনকে আপনারা আমীর নির্বাচন করে নেবেন। এ ছ'জন ছাড়া আমার পুত্র আবদুল্লাহও আছে। তবে খিলাফতের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। উল্লেখিত ছয় ব্যক্তি যদি খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে তিনজন করে সমান দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ যে দলকে সমর্থন করবে সে দল থেকেই খলীফা হবে। কিন্তু আবদুল্লাহর মতামত যদি সর্বসাধারণের নিকট গৃহীত না হয় তাহলে আবদুর রহমান যে দলে থাকবেন তাঁদের মতই গ্রহণযোগ্য হবে।' হযরত উমারের এ পরামর্শের মধ্যে আবদুর রহমান সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

হযরত উমার ইনতিকাল করলেন। আবদুর রহমান খলীফা হতে রাজি ছিলেন না। এদিকে হযরত তালহাও তখন মদীনায় ছিলেন না। অবশিষ্ট চার ব্যক্তি খলীফা নির্বাচনের পূর্ণ দায়িত্ব আবদুর রহমানের ওপর ন্যস্ত করেন।

হযরত আবদুর রহমানের ওপর অর্পিত এ দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আমানতদারীর সাথে পালন করেন। ক্রমাগত তিন দিন তিন রাত বিভিন্ন স্তরের লোকদের সাথে মত বিনিময় করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হযরত উসমানের পক্ষেই মত ব্যক্ত করেন। অবশেষে উমারের নির্ধারিত সময় তিন দিন তিন রাত শেষ হওয়ার আগে তিনি মানুষকে ফজরের জামায়াতে শরীক হওয়ার জন্য আবেদন জানান। নামায শেষে তিনি সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে খলীফা হিসাবে হযরত উসমানের নামটি ঘোষণা করেন। হযরত উমারের ছুরিকাহত হওয়ার পর থেকে তাঁরই নির্দেশে তৃতীয় খলীফা হিসাবে উসমানের (রা) নাম ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি জামায়াতের ইমামতি করেন এবং প্রশাসনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন।

চব্বিশ হিজরী সনের মুহাররম মাসে হযরত উসমান খলীফা নির্বাচিত হন। সে বছরই তিনি আবদুর রহমানকে আমীরুল হজ নিযুক্ত করেন। মুসলিম উম্মাহ সে বছরের হজটি তাঁরই নেতৃত্বে আদায় করে।

হযরত আবদুর রহমান আমরণ খলীফা উসমানের মজলিসে শূরার সদস্য থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দানের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর বিশেষ খিদমাত আঞ্জাম দেন। হযরত আবু বকর, উমার, উসমান (রা)– এ তিন খলীফার প্রত্যেকের নিকটই তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ও আস্থার পাত্র।

ইবন সা'দের মতে, হযরত আবদুর রহমান হিঃ ৩২ সনে ৭৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তবে ইবন হাজারের মতে, তিনি ৭২ বছর জীবন লাভ করেছিলেন। ইবন হাজার এ কথাও বলেছেন, হযরত উসমান অথবা যুবাইর ইবনুল আওয়াম তাঁর জানাযার ইমামতি করেন এবং তাঁকে মদীনার বাকী' গোরস্থানে দাফন করা হয়। গোরস্থান পর্যন্ত তার লাশ বহনকারীদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসও ছিলেন।

পূর্বেই আমরা দেখেছি সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে আবদুর রহমান মদীনায় এসেছিলেন। সামান্য ঘি ও পনির কেনাবেচার মাধ্যমে তিনি তাঁর ব্যবসা শুরু করেন। কালক্রমে তিনি তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর একজন সেরা ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। রাসূল (সা) তাঁর সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দুআ করেছিলেন এবং সে দুআ আল্লাহর দরবারে কবুলও হয়েছিল। কিন্তু সে সম্পদের প্রতি তাঁর একটুও লোভ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইনতিকালের পরেও আমরণ তিনি সে সম্পদ অকৃপণ হাতে আল্লাহর পথে ও মানব কল্যাণে ব্যয় করেছেন।

একবার রাসূল (সা) একটি অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বলেন, 'আমি একটি অভিযানে সৈন্য পাঠানোর ইচ্ছা করেছি, তোমরা সাহায্য কর।' আবদুর রহমান এক দৌড়ে বাড়ীতে গিয়ে আবার ফিরে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কাছে এ চার হাজার আছে। দু'হাজার আমার রবকে করজে হাসানা দিলাম এবং বাকী দু'হাজার আমার

পরিবার-পরিজনদের জন্য রেখে দিলাম।' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'তুমি যা দান করেছ এবং যা রেখে দিয়েছ, তার সবকিছুতে আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করুন।'

একবার মদীনায় শোরগাল পড়ে গেল, সিরিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য নিয়ে একটি বাণিজ্য কাফিলা উপস্থিত হয়েছে। শুধু উট আর উট। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কার বাণিজ্য কাফিলা?' লোকেরা বলল, 'আবদুর রহমান ইবন আউফের।' তিনি বললেন, আমি রাসূলকে (সা) 'বলতে শুনেছি, আমি যেন আবদুর রহমানকে সিরাতের ওপর একবার হেলে গিয়ে আবার সোজা হয়ে উঠতে দেখলাম।' অন্য একটি বর্ণনায় আছে, হযত আয়িশা বলেন, 'আল্লাহ দুনিয়াতে তাকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে বরকত দিন এবং তাঁর আখিরাতের প্রতিদান এর থেকেও বড়। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ আবদুর রহমান হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

হযরত আয়িশার এ কথাগুলি আবদুর রহমানের কানে গেল। তিনি বললেন, 'ইনশাআল্লাহ আমাকে সোজা হয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে।' অতঃপর তিনি তাঁর সকল বাণিজ্য সম্ভার সাদকা করে দেন। পাঁচ শো, মতান্তরে সাত শো উটের পিঠে এ মালামাল বোঝাই ছিল। কেউ বলেছেন, বাণিজ্য সম্ভারের সাথে উটগুলিও তিনি সাদকা করে দেন। হযরত আবদুর রহমান ছিলেন উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। তাঁদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের জন্য তিনি আজীবন অকাতরে খরচ করেছেন। তাঁদের নিকট তিনি ছিলেন একজন বিশ্বাসী ও আস্থাভাজন ব্যক্তি। একবার তিনি কিছু ভূমি চল্লিশ হাজার দীনারে বিক্রি করেন এবং বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ বনু যুহরা (রাসূলুল্লাহর সা. জননী হযরত আমিনার পিতৃ-গোত্র), মুসলমান, ফকীর মিসকীন, মুহাজির ও আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের মধ্যে বন্টন করে দেন। হযরত আয়িশার নিকট তাঁর অংশ পৌঁছলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে পাঠিয়েছে?' বলা হলো, 'আবদুর রহমান ইবন আওফ।' তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'আমার পরে ধৈর্যশীলরাই তোমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবে।'

ইবন হাজার *'আল-ইসাবা'* গ্রন্থে জা'ফর ইবন বারকানের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, আবদুর রহমান মোট তিরিশ হাজার দাস মুক্ত করেছেন। জাহিলী যুগেও মদ পানকে তিনি হারাম মনে করতেন।

হযরত আবদুর রহমান ছিলেন তাকওয়া ও আল্লাহভীতির এক বাস্তব নমুনা। মক্কায় গেলে তিনি তাঁর আগের বাড়ী-ঘরের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার বাড়ী-ঘরের প্রতি আপনি এত নাখোশ কেন?' তিনি বললেন, 'ওগুলি তো আমি আমার আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিয়েছি।'

একবার তিনি তাঁর বন্ধুদের দাওয়াত দিলেন। ভালো ভালো খাবার এলো। খাবার দেখে তিনি কান্না শুরু করে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে?' তিনি বলেন, 'রাসূল (সা) বিদায় নিয়েছেন। তিনি নিজের ঘরে যবের রুটিও পেট ভরে খেতে পাননি।'

একদিন তিনি সাওম পালন করছিলেন। ইফতারের পর তাঁর সামনে আনীত খাবারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মুসয়াব ইবন উমায়ের ছিলেন আমার থেকেও উত্তম মানুষ। তিনি শহীদ হলে তাঁর জন্য মাত্র ছোট্ট একখানা কাফনের কাপড় পাওয়া গিয়েছিল। তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যাচ্ছিল। তারপর আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য দুনিয়ার এ প্রাচুর্য দান করলেন। আমার ভয় হয়, আমাদের বদলা না জানি দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়।' অতঃপর তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন।

হযরত উমার তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আবদুর রহমান মুসলিম নেতৃবৃন্দের একজন।' হযরত আলী একটি ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, 'আবদুর রহমান আসমান ও যমীনের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি।'

হযরত আবদুর রহমান রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সরাসরি ও উমার (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে তাঁর পুত্রগণ, যেমন ইবরাহীম, হুমায়েদ, উমার, মুসয়াব, আবু সালামা, তাঁর পৌত্র মিসওয়ার, ভাগ্নে মিসওয়ার ইবন মাখরামা এবং ইবন আব্বাস, ইবন উমার, জুবাইর, জাবির, আনাস, মালিক ইবন আওস (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বড় পরিচয়, তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার একজন।

সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা)

নাম আবু ইসহাক সা'দ, পিতা আবু ওয়াক্কাস মালিক। ইতিহাসে তিনি সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস নামে খ্যাত। কুরাইশ বংশের বনু যুহরা শাখার সন্তান। মাতার নাম 'হামনা'। পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন কুরাইশ বংশের। সা'দের পিতা আবু ওয়াক্কাস ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। তাঁর অন্তিম রোগশয্যায় রাসূল (সা) তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। মাতা হামনাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে প্রথমতঃ তাঁর পুত্র সা'দের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে হৈ চৈ ও বিলাপ শুরু করে লোকজন জড়ো করে ফেললেন। মায়ের কাণ্ড দেখে ক্ষোভে দুঃখে হতভম্ব হয়ে সা'দ ঘরের এক কোণে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেন। কিছুক্ষণ বিলাপ ও হৈ চৈ করার পর মা পরিষ্কার বলে দিলেন ঃ 'সা'দ যতক্ষণ মুহাম্মাদের রিসালাতের অস্বীকৃতির ঘোষণা না দেবে ততক্ষণ আমি কিছু খাব না, কিছু পান করব না, রৌদ্র থেকে বাঁচার জন্য ছায়াতেও আসব না। মার আনুগত্যের হুকুম তো আল্লাহও দিয়েছেন। আমার কথা না শুনলে অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে এবং মার সাথে তার কোন সম্পর্কও থাকবেনা।'

হযরত সা'দ বড় অস্থির হয়ে পড়লেন। রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে সব ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলের (সা) নিকট থেকে জবাব পাওয়ার পূর্বেই সূরা আল আনকাবুতের অষ্টম আয়াতটি নাযিল হল ঃ

'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার ওপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে বলে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের মেনো না।'

কুরআনের এ আয়াতটি হযরত সা'দের মানসিক অস্থিরতা দূর করে দিল। তাঁর মা তিনদিন পর্যন্ত কিছু মুখে দিলেন না, কারো সাথে কথা বললেন না এবং রোদ থেকে ছায়াতেও এলেন না। তাঁর অবস্থা বড় শোচনীয় হয়ে পড়ল। বার বার তিনি মার কাছে এসে তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু তাঁর একই কথা, তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করতে হবে। অবশেষে তিনি মার মুখের ওপর বলে দিতে বাধ্য হলেন ঃ 'মা, আপনার মতো হাজারটি মাও যদি আমার ইসলাম ত্যাগ করার ব্যাপারে জিদ ধরে পানাহার ছেড়ে দেয় এবং প্রাণ বিসর্জন দেয়, তবুও সত্য দ্বীন পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' হযরত সা'দের এ চরম সত্য কথাটি তাঁর মার অন্তরে দাগ কাটে। অবশেষে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে 'আল-ফাদায়িল' অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত সা'দের ভাই উমাইর (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির কিছুদিন পরই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। ইবন খালদুন তাঁর 'তারীখে' উমাইরের পর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু বকর ছিলেন সা'দের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আবু বকরের দাওয়াতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম বুখারী তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে 'আল-মানাকিব' অধ্যায়ে সা'দের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সা'দ বলেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পর আমি নিজেকে তৃতীয় মুসলমান হিসেবে দেখতে পেলাম। আসলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন; কিন্তু অনেকের মতই তখন তিনি ঘোষণা দেননি। আর একথার সমর্থন পাওয়া যায় তাঁর মা'র ঘটনা এবং সূরা আনকাবুতের আয়াতটি নাযিলের মাধ্যমে। কারণ, এ আয়াতটি নবুওয়াতের চতুর্থ বছর নাযিল হয়। সম্ভবতঃ এ সময়ই তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি মায়ের নিকট প্রকাশ করেন।

নবুওয়াতের তৃতীয় বছরে সুলাইম গোত্রের 'আমর ইবন 'আবাসা গোপনে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখনও প্রকাশ্য দাওয়াতের অনুমতি আল্লাহর তরফ থেকে আসেনি। ইসলাম গ্রহণের পর 'আমর শিয়াবে আবী তালিবের এক কোণে নামায আদায় করছিলেন। কুরাইশরা প্রস্তর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। তা দেখে দু'একজন মুসলমানের সাথে সা'দও এগিয়ে এলেন এবং উক্ত কুরাইশ কাফিরদের সাথে তাদের ঝগড়া ও হাতাহাতি শুরু হয়। হযরত সা'দ তাঁর চাবুকটি দিয়ে এক কাফিরকে বেদম মার দিলেন। লোকটির দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। কোন মুসলমানের হাতে কোন মুশরিকের রক্ত ঝরানোর এ ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম।

হযরত মুসয়াব ইবন 'উমাইর ও ইবন উম্মে মাকতুমের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পর যে চার ব্যক্তি মদীনায় হিজরাত করেন তাঁদের একজন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস। সহীহ বুখারীতে বারা ইবন আযিব থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ 'সর্বপ্রথম আমাদের নিকট আগমন করেন মুসয়াব ইবন 'উমাইর ও ইবন উম্মে মাকতুম। এ দু'ব্যক্তি মদীনাবাসীদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। অতঃপর বিলাল, সা'দ ও আম্মার বিন ইয়াসির আগমন করেন। ইবন সা'দ 'তাবাকাতুল কুবরা' গ্রন্থে ওয়াকিদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, সা'দ ও তাঁর ভাই উমাইর মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় এসে তাদের অন্য এক ভাই 'উতবা ইবন আবী ওয়াক্কাসের নিকট অবস্থান করেন। তার কয়েক বছর পূর্বেই 'উতবা এক ব্যক্তিকে হত্যা করে মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় নেয়।

আল্লাহর পথে জিহাদে হযরত সা'দের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা ইসলাম-দুশমনদের খুব মারাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তিনিই প্রথম মুসলিম যিনি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেন। তিনি নিজেও বলতেন

– 'আমি প্রথম আরব যে আল্লাহর জন্য তীর চালনা করেছিল।'

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পর বেশ কিছুকাল যাবত মুহাজির মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাদের না ছিল খাদ্য সম্ভার, না ছিল পরিধেয় বস্ত্র এবং না ছিল সুনির্দিষ্ট জীবিকার উপায় উপকরণ। মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের চাপে মদীনায় সীমিত পরিসরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিতটি নড়ে উঠেছিল। মদীনার আনসার-

মুহাজির নির্বিশেষে গোটা মুসলিম সমাজ চরম আর্থিক দুর্গতির মধ্যে নিপতিত হয়। এমন চরম দারিদ্রের মধ্যে তাঁরা ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজ জারি রাখেন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁদের এ চরম দারিদ্র সম্পর্কে হযরত সা'দ বলেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম; অথচ তখন গাছের পাতা ছাড়া আমাদের খাওয়ার কিছুই থাকতো না। (তা খেয়েই আমরা জীবন ধারণ করতাম) আর আমাদের বিষ্ঠা হত উট ছাগলের বিষ্ঠার মত।' – (বুখারী ও মুসলিম ঃ মানাকিবু সা'দ রা.)

হিজরাতের এক বছর পর সফর মাসে রাসূল (সা) ষাটজন উষ্ট্রারোহীর একটি দলকে কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে টহল দিতে পাঠালেন। এ দলে হযরত সা'দও ছিলেন। এক পর্যায়ে ইকরিমা ইবন আবী জাহলের নেতৃত্বে কুরাইশদের বিরাট একটি দল তাঁরা দেখতে পেলেন। কিন্তু উভয় পক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে গেল। তবে কুরাইশ পক্ষের কেউ একজন হঠাৎ জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলে হযরত সা'দ সাথে সাথে তীর নিক্ষেপ করলেন। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে কাফিরদের প্রতি নিক্ষিপ্ত প্রথম তীর।

হিজরী দ্বিতীয় সনের রবিউস সানী মাসে রাসূল (সা) দু'শো সাহাবীকে সংগে নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেন। উদ্দেশ্য, মদীনার আশে পাশে দুশমনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং দুশমনদের জানিয়ে দেওয়া যে মুসলমানরা ঘুমিয়ে নেই। এ বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন হযরত সা'দ (রা)। বাওয়াত নামক স্থানে কুরাইশদের সাথে এবার ছোট খাট একটি সংঘর্ষও হয়। এর ছয়মাস পর বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বদর যুদ্ধের অল্প কয়েকদিন আগে রাসূল (সা) কুরাইশ কাফিলার সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিন জনের যে দলটি পাঠান তাদের একজন ছিলেন সা'দ (রা)। তাঁরা বদরের কূপের নিকট ওৎ পেতে থেকে প্রতিপক্ষের দু'জনকে বন্দী করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে আসেন। রাসূল (সা) তাঁদের নিকট থেকে শত্রু পক্ষের অনেক তথ্য অবগত হন।

বদরে সা'দ ও তাঁর ভাই 'উমাইর (রা) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়েন। প্রত্যেকেই একাধিক কাফিরকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠান। এ যুদ্ধে হযরত 'উমাইর (রা) শাহাদাত বরণ করেন। এবং সা'দ (রা) সাঈদ ইবন আ'সকে হত্যা করে তার তলোয়ারখানি নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট সমর্পণ করেন। তিনি রাসূলের (রা) নিকট তলোয়ারখানি পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জবাবে তিনি বললেন ঃ এ তলোয়ার না তোমার না আমার। সা'দ রাসূলের (সা) নিকট থেকে উঠে কিছুদূর যেতে না যেতেই সূরা আনফাল নাযিল হয়। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁকে ডেকে বলেন ঃ 'তোমার তলোয়ার নিয়ে যাও।'

উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদরের এক বছর পর। হযরত সা'দ এ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। কতিপয় মুসলিম সৈনিকের ভুলের কারণে নিশ্চিত বিজয় যখন পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়, তখন মুষ্টিমেয় যে ক'জন সৈনিক নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূলকে (সা) ঘিরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেন, সা'দ (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইমাম বুখারী এ ঘটনা সা'দের (রা) যবানেই বর্ণনা করেছেন ঃ

'উহুদের দিনে রাসূল (সা) তাঁর তুনীর আমার সামনে ছড়িয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ

তীর মার! আমার মা-বাবা তোমার প্রতি কুরবান হোক।' ইবন সা'দ আরও বলেছেন ঃ 'ঘটনাক্রমে একটি তুনীর ফলা ছিলনা। সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ এটাতো খালি। বললেন ঃ ওটাও ছুঁড়ে দাও।'

হযরত সা'দের এক ভাই 'উমাইর বদর যুদ্ধে শহীদ হন। উহুদের যুদ্ধে সা'দ (রা) যখন কাফিরদের প্রবল আক্রমণ থেকে রাসূলকে (সা) হিফাজতের জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে লড়ছেন, ঠিক তখনই তাঁর অন্য ভাই নরাধম 'উতবার নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে প্রিয় নবীর মুখ আহত হয় এবং একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। সা'দ (রা) প্রায়ই বলতেন ঃ কাফিরদের অন্য কাউকে হত্যার এত প্রবল আকাঙ্খা আমার ছিল না যেমন ছিল 'উতবার ব্যাপারে। কিন্তু যখন আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনলাম, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের চেহারা রক্ত-রঞ্জিত করেছে, তার ওপর আল্লাহর গজব আপতিত হবে, তখন তার হত্যার আকাঙ্খা আমার নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং আমার অন্তরে প্রশান্তি নেমে আসে।

উহুদের যুদ্ধে তিনি এক অস্বাভাবিক দৃশ্য অবলোকন করেন। তিনি বলেন ঃ 'উহুদের দিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) ডানে ও বামে ধবধবে সাদা দু'ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। কাফিরদের সাথে তারা প্রচণ্ড লড়ছে। এর আগে বা পরে আর কখনও আমি তাদেরকে দেখিনি।'

খন্দকের যুদ্ধ হয় উহুদের দু'বছর পর। এ যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং একজন চতুর কাফির ঘোরসওয়ারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তার চোখ এমনভাবে এফোঁড় ওফোঁড় করেন যে, তা দেখে রাসূল (সা) হঠাৎ হেসে ওঠেন। খন্দকের যুদ্ধে সালা পর্বতের এক উপত্যকায় রাসূলের (সা) জন্য একটি তাঁবু নির্মাণ করা হয়। এক ঠাণ্ডার রাতে চাদর মুড়ি দিয়ে রাসূল (সা) একাকী শুয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁবুর মধ্যে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে? উত্তর পেলেন ঃ সা'দ—আবী ওয়াক্কাসের পুত্র। কি জন্য এসেছ? বললেন ঃ সা'দের হাজার জীবন অপেক্ষা আল্লাহর রাসূল হচ্ছেন তার প্রিয়তম। এ অন্ধকার ঠাণ্ডা রাতে আপনার ব্যাপারে আমার ভয় হল। তাই পাহারার জন্য হাজির হয়েছি। আল্লাহর নবী বললেন ঃ সা'দ! আমার চোখ খোলা ছিল। আমি আশা করছিলাম আজ যদি কোন নেককার বান্দা আমার হিফাজত করত!

হিজরী দশম সনে রাসূলুল্লাহর (সা) বিদায় হজ্জের সংগী ছিলেন সা'দও। কিন্তু হজ্জের পূর্বেই মক্কায় তিনি দারুণভাবে পীড়িত হয়ে পড়েন। জীবনের আশা এক প্রকার ছেড়ে দিলেন। এ সময় রাসূল (সা) মাঝে মাঝে এসে তাঁর খোঁজ-খবর নিতেন। হযরত সা'দ বললেন ঃ একদিন তিনি আমার সাথে কথা বলার পর আমার কপালে হাত রাখলেন। তারপর মুখমণ্ডলের ওপর হাতের স্পর্শ বুলিয়ে পেট পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং দুআ করলেন ঃ হে আল্লাহ, আপনি সা'দকে শিফা দান করুন, তার হিজরাতকে পূর্ণতা দান করুন। অর্থাৎ হিজরাতের স্থান মদীনাতেই তার মৃত্যুদান করুন। হযরত সা'দ বলতেন, 'রাসলুল্লাহর (সা) হাতের সেই শীতল স্পর্শ ও প্রশান্তি আজও আমার অন্তরে অনুভব করে থাকি।' তিনি সুস্থ হয়ে আরও পঁয়তাল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন।

হযরত আবু 'উবাইদা ও মুসান্নার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী পারস্যের কিসরা বাহিনীকে পরাজিত করে ইরাক জয় করে নিয়েছে। ইরাক এখন মুসলিম বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে।

কিসরার স্বজনবৃন্দ নিজেদের সকল প্রকার মতভেদ ভুলে গিয়ে ইয়াজদিগির্দকে সিংহাসনে বসিয়ে সেনাপতি রুস্তমের নেতৃত্বে নতুন করে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণের জন্য বিরাট বাহিনী গড়ে তুলেছে। হযরত উমার এ প্রস্তুতির খবর পেলেন। তিনি নিজেই মুসান্নার সাহায্যে একটি বাহিনী নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কিন্তু মজলিসে শূরার অনুমতি না পেয়ে শূরার সিদ্ধান্ত মুতাবিক সা'দকে পাঠালেন এবং তাঁকেই নিযুক্ত করলেন ইরানী ফ্রন্টের সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। হযরত সা'দ (রা) মদীনা থেকে তাঁর বাহিনী নিয়ে কাদেসিয়া পৌঁছলেন। তাঁর পৌঁছার পূর্বেই মুসান্না ইনতিকাল করেন। এ কাদেসিয়া প্রান্তরে সেনাপতি সা'দের নেতৃত্বে মুসলিম ও পারস্য বাহিনীর মধ্যে এক চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বিশাল পারস্য বাহিনীর প্রতিরোধ ব্যূহ তছনছ হয়ে যায় এবং একের পর এক তারা যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে।

সাসানী সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনের পথে মুসলিম বাহিনী 'বাহ্রাসীর' দখল করে আছে। এ বাহ্রাসীর ও মাদায়েনের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ দিজলা নদী প্রবাহিত। হযরত সা'দ খবর পেলেন, শাহানশাহ ইয়াজদিগির্দ রাজধানী মাদায়েন থেকে সকল মূল্যবান সম্পদ সরিয়ে নিচ্ছে। হযরত সা'দ সৈন্য বাহিনী নিয়ে দ্রুত মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হলেন। দিজলা তীরে এসে দেখলেন, ইরানীরা নদীর পুলটি পূর্বেই ধ্বংস করে দিয়েছে। এ দিজলার তীরে তিনি মুসলিম মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। ভাষণটির সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

'ওহে আল্লাহর বান্দারা, দ্বীনের সিপাহীরা! সাসানী শাসকরা আল্লাহর বান্দাহদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে মিথ্যা ও বানোয়াট কথার মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে অগ্নি ও সূর্যের উপাসনা করতে বাধ্য করেছে। তাদের ঘামঝরা কষ্টোপার্জিত সম্পদ নিজেদের পুঞ্জিভূত করেছে। তোমরা যখন তাদের পরিত্রাণদাতা হিসেবে উপস্থিত হয়েছ তখন তারা পালাবার পথ ধরেছে এবং দরিদ্র জনসাধারণের ধন সম্পদ ঘোড়া ও গাধার পিঠে বোঝাই করেছে। আমরা কক্ষণো তাদের এমন সুযোগ দেব না। তাদের বাহনের ওপর বোঝাইকৃত ধন-ভাণ্ডার যাতে আমরা ছিনিয়ে নিতে না পারি এজন্য তারা পুল ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু ইরানীরা আমাদের সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তারা জানে না আল্লাহর ওপর ভরসাকারীরা, মানবতার সেবকরা, পুল বা নৌকার ওপর ভরসা করে না। আমি পরম দয়ালু-দাতা আল্লাহর নামে আমার ঘোড়াটি নদীতে নামিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আমার অনুসরণ কর। একজনের পেছনে অন্যজন, একজনের পাশে অন্যজন সারিবদ্ধভাবে তোমরা দিজলা পার হও। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য ও হিফাজত করুন।'

ভাষণ শেষ করে হযরত সা'দ বিসমিল্লাহ বলে নিজের ঘোড়াটি নদীর মধ্যে চালিয়ে দিলেন। অন্য মুজাহিদরাও তাঁদের সেনাপতিকে অনুসরণ করলেন। নদী ছিল অশান্ত। কিন্তু আল্লাহর সিপাহীদের সারিতে একটুও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল না। তাঁরা সারিবদ্ধভাবে নদী পার হয়ে অপর তীরে পৌঁছলেন। ইরানী সৈন্যরা একটু নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিল। তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। অবলীলাক্রমে তারা চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'দৈত্য আসছে, দানব আসছে। পালাও পালাও।'

মুসলিম মুজাহিদদের এ আকস্মিক হামলায় বাদশাহ ইয়াজদিগির্দ অগণিত ধনরত্ন

ফেলে মাদায়েন ত্যাগ করে হালওয়ানের দিকে যাত্রা করে। হযরত সা'দ নির্জন শ্বেত প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। পরিবেশ ছিল ভয়াবহ। প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষ ছিল যেন শিক্ষা ও উপদেশের স্মারক। হযরত সা'দের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো সূরা দুখানের এ আয়াতগুলি ঃ

– 'তারা পেছনে ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্য ক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ এবং কত বিলাস-উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত! এমনটিই ঘটেছিল এবং আমি এ সবকিছুর উত্তরাধিকারী করেছিলাম অন্য সম্প্রদায়কে।' (সূরা দুখান ঃ ২৫-২৮)

হযরত সা'দ শ্বেত প্রাসাদে প্রবেশ করে আট রাকয়াত 'সালাতুল ফাতহ' আদায় করেন। তারপর তিনি ঘোষণা দেন, এ শাহী প্রাসাদে আজ জুমআর জামাআত অনুষ্ঠিত হবে। অতঃপর মিম্বর তৈরী করে জুমআর নামায আদায় করেন। এটাই ছিল পারস্যে প্রথম জুমআর নামায।

মাদায়েন বিজয়ের পর খলীফা উমার (রা) সেনাপতি সা'দকে নির্দেশ দেন, তিনি নিজে যেন ইরানীদের পেছনে ধাওয়া না করেন, বরং এ কাজের জন্য অন্য কাউকে নির্বাচন করে দায়িত্ব দেন। অতঃপর খলীফার আদেশে তিনি আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, প্রশাসনের পুনর্গঠন, ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং নও মুসলিমদের তালীম ও তারবিয়াতে আত্মনিয়োগ করেন। যে মাদায়েন ছিল শত শত বছর ধরে অগ্নি উপাসকদের কেন্দ্রভূমি এবং যে মাদায়েন কখনও শোনেনি এক আল্লাহ্‌র নাম, সেখানে প্রথম বারের মত হযরত সা'দ নির্মাণ করেন এক জামে মসজিদ। ইরানের অন্যান্য শহরেও তিনি মসজিদ নির্মাণ করেন। আরব মুসলমানদের বসবাসের জন্য কুফা শহরের সম্প্রসারণ করেন। ইরাকের বসরা শহরের স্থপতিও তিনি।

খলীফা উমার হযরত সা'দকে কুফার গভর্ণর নিয়োগ করেন। কিছু দিন পর তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় কুফাবাসীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেন। কুফায় সা'দ নিজের জন্য যে প্রাসাদটি তৈরী করেছিলেন, 'উমারের (রা) নির্দেশে মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা মদীনা থেকে কুফা গিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেন। (মাজমূ' ফাতাওয়া-ইবন তাইমিয়া, খণ্ড ৩৫ পৃঃ ৪০)

হযরত সা'দের বিরুদ্ধে উসামা ইবন কাতাদা নামক কুফার যে লোকটি খলীফা উমারের নিকট কসম করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল, সা'দ তার ওপর বদ-দুআ করে তিনটি জিনিস তার জন্য আল্লাহর নিকট কামনা করেন ঃ আল্লাহ্ যেন তাকে দীর্ঘজীবী করেন, দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত করেন এবং তার সত্তাকে ফিতনার শিকারে পরিণত করেন। ঐতিহাসিকরা বলেছেন, তাঁর এ দু'আ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ তিনি তো ছিলেন 'মুজতাজাবুদ দাওয়াহ'। স্বয়ং রাসূল (সা) তাঁর জন্যে দু'আ করেছেন ঃ 'হে আল্লাহ, আপনি সা'দের দু'আ কবুল করুন, যখন সে দু'আ করবে।

হযরত 'উমার (রা) সা'দের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ যে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন তা কিন্তু ঠিক নয়। তাই তিনি বলেছেন ঃ 'আমি সা'দকে রাষ্ট্র প্রশাসনে অযোগ্য বা তার প্রতি আস্থাহীনতার কারণে বরখাস্ত করিনি।' (বুখারী ঃ কিতাবুল

মানাকিব) হযরত সা'দ যে খলীফা উমারের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসভাজন ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট যে বোর্ডটি গঠন করে দিয়ে যান তাতে হযরত সা'দের অন্তর্ভুক্তির মধ্যে। সা'দ সম্পর্কে তাঁর অন্তিম বাণী ছিল ঃ 'যদি খিলাফতের দায়িত্ব সা'দ পেয়ে যান, তাহলে তিনি তার উপযুক্ত। আর তা যদি না হয়, তবে যিনি খলীফা হবেন তিনি যেন তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেন।' (বুখারী ঃ কিতাবুল মানাকিব ও আল-ইসাবা)। হযরত উসমান তাঁর খিলাফতের প্রথম বছরেই পুনরায় সা'দকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে কুফার কোষাধ্যক্ষ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ও তাঁর মধ্যে কোন একটি বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় খলীফা সা'দকে প্রত্যাহার করেন।

ইবন সাবার আনসারী হাঙ্গামাবাজরা খলীফা উসমানকে ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রবেশ করেছে। খলীফা মসজিদে নববীতে জুমআর নামাযের খুতবার মধ্যে হাঙ্গামাবাজদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করলেন। তারাও পাথর নিক্ষেপ করে খলীফাকে আহত করে। এ সময় তাদের প্রতিরোধে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন হযরত সা'দ। তারপর অন্যান্য সাহাবীরা একযোগে উঠে তাদের হটিয়ে দেন।

বিদ্রোহীদের হাতে হযরত উসমান শহীদ হলেন। হযরত সা'দ তখন মদীনায়। মদীনাবাসীরা হযরত আলীকে খলীফা মনোনীত করে তাঁর হাতে বাইয়াত করলেন। আলীর (রা) হাতে বাইয়াতের জন্য লোকেরা যখন সা'দের বাড়ীতে গেল, তিনি তাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন ঃ 'যতক্ষণ না সব মানুষ বাইয়াত করেছে, আমি করব না। তবে আমার পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।'

হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ডের পর ইসলামের ইতিহাসে যে বেদনাদায়ক অধ্যায়ের সূচনা হয় তার আলোচনা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। তবে এ সময় হযরত সা'দের ভূমিকা বুঝার জন্য এতটুকু ইঙ্গিত প্রয়োজন যে, সে সময় ইসলামী উম্মাত তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল হযরত আলীর পক্ষে, একদল তাঁর বিপক্ষে এবং একদল নিরপেক্ষ। হযরত আলীর পক্ষে, বিপক্ষের উভয় দলেই যেমন বিশিষ্ট সাহাবীরা ছিলেন, তেমনিভাবে ছিলেন এ নিরপেক্ষ দলেও। তাঁরা কোন মুসলমানের পক্ষে বিপক্ষে তরবারি উত্তোলনকে জায়েয মনে করেননি। এ কারণে অমরা হযরত সা'দকে দেখতে পাই তিনি উট বা সিফফিনের যুদ্ধে কোন পক্ষেই যোগ দেননি, তখন তিনি মদীনায় নিজ গৃহে অবস্থান করছেন।

মোটকথা, হযরত উসমানের শাহাদাতের পর তিনি নির্জনতা অবলম্বন করেন। একবার তিনি তাঁর উটের আস্তাবলে তাঁর পুত্র উমারকে আসতে দেখে বল্লেন ঃ 'আল্লাহ এ অশ্বারোহীর অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করুন।' অতঃপর উমার এসে পিতাকে বললেন ঃ 'আপনি উট ও ছাগলের মধ্যে সময় অতিবাহিত করছেন, আর এদিকে লোকেরা রাষ্ট্রীয় ঝগড়ায় লিপ্ত।' হযরত সা'দ পুত্রের বুকের উপর হাত দিয়ে আঘাত করে বল্লেন ঃ 'চুপ কর!' আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ ভালোবাসেন নির্জনবাসী, মুত্তাকী এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যে মানুষের রাগ বিরাগের পরোয়া করেনা, তাকে।

হযরত সা'দ আলীর হাতে বাইয়াত করে পুনরায় তাঁর দলত্যাগী খারেজীদের ফাসিক বলে মনে করতেন। হযরত উসমানের শাহাদাতের পর তাঁর পুত্র উমার তাঁর নিকট এসে বলেন ঃ খিলফাত পরিচালনার জন্য এখন উম্মাতে মুসলিমার একজন বিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। আমাদের ধারণায় আপনিই এর উপযুক্ত। এতটুকু বলতেই তিনি বলে ওঠেন ঃ 'থাক, হয়েছে। আমাকে আর উৎসাহিত করতে হবে না।'

হযরত সা'দ মদীনা থেকে দশ মাইল দূরে আকীক উপত্যকায় কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ইনতিকাল করেন। জীবনীকারদের মধ্যে তাঁর মৃত্যুসন সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে হিজরী ৫৫ সনে ৮৫ বছর বয়সে তাঁর ইনতিকাল হয় বলে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি আছে। ইবন হাজার তাঁর *'তাহজীব'* গ্রন্থে এ মতই সমর্থন করেছেন। গোসল ও কাফনের পর লাশ মদীনায় আনা হয়। মদীনার তৎকালীন গভর্নর মারওয়ান জানাযার ইমামতি করেন। সহীহ্ মুসলিমের একাধিক বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর জানাযার বিষয়টি বিস্তারিত জানা যায়।

হযরত সা'দের ইনতিকালের পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা ও অন্যান্য আযওয়াজে মুতাহ্হারাহ্ বলে পাঠালেন, তাঁর লাশ মসজিদে আনা হোক, যাতে আমরা জানাযায় শরীক হতে পারি। কিন্তু লোকেরা লাশ মসজিদে নেয়া যেতে পারে কিনা এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল। হযরত আয়িশা (রা) একথা জানতে পেরে বললেন ঃ 'তোমরা এত তাড়াতাড়িই ভুলে যাও? রাসূল (সা) তো সুহাইল ইবন বায়দার জানাযা এই মসজিদে আদায় করেছেন।' অতঃপর লাশ উম্মুহাতুল মু'মিনীনের হুজরার নিকট আনা হল এবং তাঁরা নামায আদায় করলেন।

মরণকালে হযরত সা'দ (রা) বহু অর্থ-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি একটি অতি পুরাতন পশমী জুববা চেয়ে নিয়ে বলেন ঃ 'এ দিয়েই তোমরা আমাকে কাফন দেবে। এ জুব্বা পরেই আমি বদর যুদ্ধে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়েছি। আমার ইচ্ছা, এটা নিয়েই আমি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হই।'

হযরত সা'দের ছেলে মুসয়াব বলেন ঃ আমার পিতার অন্তিম সময়ে তাঁর মাথাটি আমার কোলের ওপর ছিল। তাঁর মুমূর্ষ অবস্থা দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বেটা কাঁদছ কেন? বললাম ঃ আপনার এ অবস্থা দেখে। বললেন ঃ 'আমার জন্য কেঁদোনা। আল্লাহ্ কক্ষনো আমাকে শাস্তি দেবেন না, আমি জান্নাতবাসী। আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে তাদের সৎকাজের প্রতিদান দেবেন এবং কাফিরদের সৎকাজের বিনিময়ে তাদের শাস্তি লাঘব করবেন।' (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৪)

রাসূল (সা), খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীদের নিকট হযরত সা'দের মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল অতি উচ্চে। তাঁরা তাঁর মতামতকে যে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করতেন, বহু হাদীসের মাধ্যমে একথা জানা যায়। একবার সা'দ মোজার ওপর মসেহ সংক্রান্ত একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার তাঁর পিতা হযরত উমার ফারুক (রা) থেকে হাদীসটির সত্যতা যাচাই করতে চাইলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হাদীসটি কি সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস থেকে শুনেছ? বললেন ঃ 'হাঁ। উমার বললেন ঃ হাঁ। সা'দ যখন তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করে, তখন সে সম্পর্কে অন্য কারও নিকট কিছু জিজ্ঞেস করবে না।'

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে চারজন ছিলেন সর্বাধিক কঠোর ঃ উমার, আলী, যুবাইর, সা'দ রাদিআল্লাহু আনহুম।

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় হযরত বিলালের অনুপস্থিতিতে সা'দ তিনবার আযান দিয়েছেন। রাসূল (সা) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'আমার সংগে বিলালকে না দেখলে তুমি আযান দেবে।' (হায়াতুস সাহাবা ৩/১১৬)

হযরত সা'দ রাসূল (সা) থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর নিকট থেকে তাঁর ছেলে-মেয়েরা, যেমন, ইবরাহীম, আমের, মুসয়াব, মুহাম্মাদ, আয়িশা এবং বিশিষ্ট সাহাবীরা, যেমন, আয়িশা, ইবন আব্বাস, ইবন উমার, জাবির (রা) এবং বিশিষ্ট তাবেয়ীরা, যেমন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব আবু উসমান আন-নাহদী, কায়িস ইবন আবী হাযিম, আলকামা, আহনাফ ও অন্যরা হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আল-ইসাবা ৩/৩৩)

হযরত সা'দের মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। প্রাচীন সূত্রগুলিতে তাঁর কিছু কবিতা সংকলিত হয়েছে। ইবন হাজার *'আল-ইসাবা'* গ্রন্থে কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত সা'দের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি 'আশারায়ে মুবাশ্শারাহ' অর্থাৎ জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের অন্যতম এবং তিনি এ দলের সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (রা)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'লিকুল্লি উম্মাতিন আমীনুন, ওয়া আমীনু হাজিহিল উম্মাহ আবু উবাইদা– 'প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে। আর এ মুসলিম জাতির পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি আবু উবাইদা।'

তিনি ছিলেন উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, গৌরকান্তি, হালকা পাতলা গড়ন ও দীর্ঘদেহের অধিকারী। তাঁকে দেখলে যে কোন ব্যক্তির চোখ জুড়িয়ে যেত, সাক্ষাতে অন্তরে ভক্তি ও ভালোবাসার উদয় হত এবং হৃদয়ে একটা নির্ভরতার ভাব সৃষ্টি হত। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী, অত্যন্ত বিনয়ী ও লাজুক প্রকৃতির। তবে যে কোন সংকট মুহূর্তে সিংহের ন্যায় চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত। তাঁর চারিত্রিক দীপ্তি ও তীক্ষ্ণতা ছিল তরবারীর ধারের ন্যায়। রাসূলের (সা) ভাষায় তিনি ছিলেন উম্মাতে মুহাম্মাদীর 'আমীন'- বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি।

তাঁর পুরো নাম আমীর ইবন আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ আল-ফিহরী আল কুরাইশী। তবে কেবল আবু উবাইদা নামে তিনি সবার কাছে পরিচিত। তাঁর পঞ্চম উর্ধ পুরুষ 'ফিহরের' মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। তাঁর মাও ফিহরী খান্দানের কন্যা। সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমারের (রা) মন্তব্য হল ঃ 'কুরাইশদের তিন ব্যক্তি অন্য সকলের থেকে সুন্দর চেহারা, উত্তম চরিত্র ও স্থায়ী লজ্জাশীলতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা তোমাকে কোন কথা বললে মিথ্যা বলবেন না, আর তুমি তাদেরকে কিছু বললে তোমাকে মিথ্যুক মনে করবেন না। তাঁরা হলেন– আবু বকর সিদ্দিক, উসমান, ইবন আফফান ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ।'

ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগেই যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন আবু উবাইদা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হযরত আবু বকরের মুসলমান হওয়ার পরের দিনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বকরের হাতেই তিনি তাঁর ইসলামের ঘোষণা দেন। তারপর তিনি আবদুর রহমান ইবন আউফ, উসমান ইবন মাজউন, আল-আরকাম ইবন আবিল আরকাম ও তাঁকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির হন। সেখানে তাঁরা সকলেই একযোগে ইসলামের ঘোষণা দেন। এভাবে তাঁরাই হলেন মহান ইসলামী ইমারতের প্রথম ভিত্তি।

মক্কায় মুসলিমদের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবু উবাইদা শরীক ছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অটল থেকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের চূড়ান্ত পরীক্ষায় কামিয়াব হন। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দু'বার হাবশায় হিজরাত করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের পর তিনিও মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় সা'দ বিন মুয়াজের সাথে তাঁর 'দ্বীনী মুয়াখাত' বা দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বদর যুদ্ধের দিন আবু উবাইদার পরীক্ষার কঠোরতা ছিল সকল ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার উর্ধে। যুদ্ধের ময়দানে এমন বেপরোয়াভাবে কাফিরদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকেন যেন তিনি মৃত্যুর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। মুশরিকরা তাঁর আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অশ্বারোহী সৈনিকরা প্রাণের ভয়ে দিশেহারা হয়ে দিকবিদিক

পালাতে থাকে। কিন্তু শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি বার বার ঘুরে ফিরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। আর তিনিও তার সামনে থেকে সরে যেতে লাগলেন যেন তিনি সাক্ষাত এড়িয়ে যাচ্ছেন। লোকটি ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করল। আবু উবাইদা সেখানেও তাকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। অবশেষে সে শত্রুপক্ষ ও আবু উবাইদার মাঝখানে এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। যখন তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, তিনি তাঁর তরবারির এক আঘাতে লোকটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। লোকটি মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

লোকটি কে? সে আর কেউ নয়। সে আবু উবাইদার পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ। প্রকৃতপক্ষে আবু উবাইদা তাঁর পিতাকে হত্যা করেননি, তিনি তাঁর পিতার আকৃতিতে শিরক বা পৌত্তলিকতা হত্যা করেছেন। এ ঘটনার পর আল্লাহ তা'আলা আবু উবাইদা ও তাঁর পিতার শানে নিম্নের এ আয়াতটি নাযিল করেন।

'তোমরা কখনো এমনটি দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে– তারা তাদের পিতা-ই হোক কিংবা তাদের পুত্র-ই হোক বা ভাই হোক অথবা তাদের বংশ-পরিবারের লোক। তারা সেই লোক যাদের দিলে আল্লাহ তা'আলা ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ হতে একটা রূহ দান করে তাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হবে। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে তাঁর প্রতি। এরা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রাখ, আল্লাহর দলের লোকেরাই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।' (আল মুজাদিলা-২২)

আবু উবাইদার এরূপ আচরণে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ, আল্লাহর প্রতি তাঁর দৃঢ় ঈমান, দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা, এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রতি তাঁর আমানতদারী তাঁর মধ্যে এমন চূড়ান্ত রূপলাভ করেছিল যে, তা দেখে অনেক মহান ব্যক্তিও ঈর্ষা পোষণ করতেন। মুহাম্মাদ ইবন জাফর বলেন ঃ 'খৃষ্টানদের একটা প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির হয়ে বললো— হে আবুল কাসিম! আপনার সাথীদের মাঝ থেকে আপনার মনোনীত কোন একজনকে আমাদের সাথে পাঠান। তিনি আমাদের কিছু বিতর্কিত সম্পদের ফায়সালা করে দেবেন। আপনাদের মুসলিম সমাজ আমাদের সবার কাছে মনোপূত ও গ্রহণযোগ্য। একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'সন্ধ্যায় তোমরা আমার কাছে আবার এসো। আমি তোমাদের সাথে একজন দৃঢ়চেতা ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাব।' হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব বলেন ঃ 'আমি সেদিন সকাল সকাল জোহরের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হলাম। আর আমি এ দিনের মত আর কেন দিন নেতৃত্বের জন্য লালায়িত হইনি। এর একমাত্র কারণ, আমিই যেন হতে পারি রাসূলুল্লাহর (সা) এ প্রশংসার পাত্রটি।

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সাথে জোহরের নামায শেষ করে ডানে বায়ে তাকাতে লাগলেন। আর আমিও তাঁর নজরে আসার জন্য আমার গর্দানটি একটু উঁচু করতে লাগলাম। কিন্তু তিনি তাঁর চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহকে দেখতে পেলেন। তাঁকে ডেকে তিনি বললেন ঃ 'তুমি তাদের সাথে যাও এবং সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে তাদের বিতর্কিত বিষয়টির ফায়সালা করে দাও।' আমি

তখন মনে মনে বললাম ঃ আবু উবাইদা এ মর্যাদাটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

আবু উবাইদা কেবল একজন আমানতদারই ছিলেন না, আমানতদারীর জন্য সর্বদা সকল শক্তি পুঞ্জিভূতও করতেন। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরাইশ কাফিলার গতিবিধি অনুসরণের জন্য রাসূল (সা) একদল সাহাবীকে পাঠান। তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন আবু উবাইদাকে। পাথেয় হিসাবে তাঁদেরকে কিছু খোরমা দেওয়া হয়। প্রতিদিন আবু উবাইদা তাঁর প্রত্যেক সংগীকে মাত্র একটি খোরমা দিতেন। তাঁরা শিশুদের মায়ের স্তন চোষার ন্যায় সারাদিন সেই খোরমাটি চুষে চুষে এবং পানি পান করে কাটিয়ে দিত। এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র একটি খোরমাই তাঁদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কোন কোন বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ অষ্টম হিজরীর রজব মাসে রাসূল (সা) আবু উবাইদার নেতৃত্বে উপকূলীয় এলাকায় কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য একটি বাহিনী পাঠান। কিছু খেজুর ছাড়া তাঁদের সাথে আর কোন পাথেয় ছিল না। সৈনিকদের প্রত্যেকের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ছিল মাত্র একটি খেজুর। এই একটি খেজুর খেয়েই তাঁরা বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেন। অবশেষে আল্লাহতায়ালা তাঁদের এ বিপদ দূর করেন। সাগর তীরে তাঁরা বিশাল আকৃতির এক মাছ লাভ করেন এবং তার ওপর নির্ভর করেই তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হয়তো এ দুটি পৃথক পৃথক ঘটনা ছিল।

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন পরাজয় বরণ করে এবং মুশরিকরা জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'মুহাম্মাদ কোথায়, মুহাম্মাদ কোথায়....'। তখন আবু উবাইদা ছিলেন সেই দশ ব্যক্তির অন্যতম যারা বুক পেতে রাসূলকে (সা) মুশরিকদের তীর থেকে রক্ষা করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল রাসূলুল্লাহর (সা) দাঁত শহীদ হয়েছে, তাঁর কপাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে এবং গণ্ডদেশে বর্মের দুটি বেড়ী বিঁধে গেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক বেড়ী দু'টিকে উঠিয়ে ফেলার জন্য তড়িঘড়ি এগিয়ে এলেন। আবু উবাইদা তাঁকে বললেন, 'কসম আল্লাহর! আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।' তিনি ছেড়ে দিলেন। আবু উবাইদা ভয় করলেন হাত দিয়ে বেড়ী দু'টি তুললে রাসূল (সা) হয়ত কষ্ট পাবেন। তিনি শক্তভাবে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে প্রথমে একটি তুলে ফেললেন। কিন্তু তাঁরও অন্য একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। তখন আবু বকর (রা) মন্তব্য করলেন ঃ 'আবু উবাইদা সর্বোত্তম দাঁতভাঙ্গা ব্যক্তি।' খন্দক ও বনী কুরাইজা অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক চুক্তিতে তিনি একজন সাক্ষী হিসেবে সাক্ষর করেন। খাইবার অভিযানে সাহস ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। 'জাতুস সালাসিল' অভিযানে হযরত আমর ইবনুল আসের বাহিনীর সাহায্যের জন্য দু'শ' সিহাপীসহ রাসূল (সা) আবু উবাইদাকে পিছনে পাঠান। তাঁরা জয়লাভ করেন। মক্কা বিজয়, তায়িফ অভিযানসহ সর্বক্ষেত্রে আবু উবাইদা শরীক ছিলেন। বিদায় হজ্জেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসংগী ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবু উবাইদা সর্বক্ষেত্রে ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁকে অনুসরণ করেন।

সাকীফায়ে বনী সায়েদাতে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে তুমুল বাক-বিতণ্ডা চলছে। আবু উবাইদা আনসারদের লক্ষ্য করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন ঃ 'ওহে আনসার সম্প্রদায়! তোমরাই প্রথম সাহায্যকারী। আজ তোমরাই

প্রথম বিভেদ সৃষ্টিকারী হয়োনা।' এক পর্যায়ে হযরত আবু বকর আবু উবাইদাকে বলেন, আপনি হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে বাইয়াত করি। আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ 'প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে, তুমি এ জাতির সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি।' এর জবাবে আবু উবাইদা বললেন ঃ 'আমি এমন ব্যক্তির সামনে হাত বাড়াতে পারিনা যাকে রাসূল (সা) আমাদের নামাযের ইমামতির আদেশ করেছেন এবং যিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ইমামতি করেছেন।' একথার পর আবু বকরের হাতে বাইয়াত করা হল। আবু বকরের খলীফা হবার পর সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সর্বোত্তম উপদেষ্টা ও সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেন। আবু বকরের পর হযরত উমার খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আবু উবাইদা তাঁরও আনুগত্য মেনে নেন।

হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর হিজরী ১৩ সনে সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন। আবু উবাইদাকে হিমস, ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে দিমাশ্‌ক, শুরাহবীলকে জর্দান এবং 'আমর ইবনুল আসকে ফিলিস্তীনে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করলেন আবু উবাইদাকে। দিমাশ্‌ক, হিমস, লাজেকিয়া প্রভৃতি শহর বিজিত হয় আবু উবাইদার হাতে। ইয়ারমুকের সেই ভয়াবহ যুদ্ধ তিনিই পরিচালনা করেন। 'আমর ইবনুল 'আসের আহবানে সাড়া দিয়ে বায়তুল মাকদাস বিজয়ে শরীক হন। বায়তুল মাকদাসবাসীরা খোদ খলীফা 'উমারের সাথে সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করলে আবু উবাইদাই সে কথা জানিয়ে খলীফাকে পত্র লেখেন। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য খলীফা 'জাবিয়া' পৌঁছলে আবু উবাইদাই তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। হিজরী ১৭ সনে হযরত খালিদ সাইফুল্লাহকে দিমাশ্‌কের আমীর ও ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করে খলীফা উমার আবু উবাইদাকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করেন। হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ লোকদের বলেন, 'তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে, আমীনুল উম্মাত তোমাদের ওয়ালী।'

আবু উবাইদার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ায় একের পর এক বিজয় লাভ করে সিরিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড দখল করে চলেছে। এ সময় সিরিয়ায় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দেয় এবং প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ তার শিকারে পরিণত হয়। খলীফা হযরত উমার (রা) নিজেই খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য রাজধানী মদীনা থেকে 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছুলেন। অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে আবু উবাইদা সেখানে খলীফাকে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রবীণ মুহাজির ও আনসারদের সাথে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করলেন। সবাই একবাক্যে সেনাবাহিনীর সদস্যদের স্থান ত্যাগের পক্ষে মত দিলেন। হযরত উমার সবাইকে আহ্বান জানালেন তাঁর সাথে আগামী কাল মদীনায় ফিরে যাওয়ার জন্য। তাকদীরের প্রতি গভীর বিশ্বাসী আবু উবাইদা বেঁকে বসলেন। খলীফাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আ ফিরারুম মিন কাদরিল্লাহ– একি আল্লাহর তাকদীর থেকে পলায়ন নয়?' খলীফা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন ঃ 'আফসুস! আপনি ছাড়া কথাটি অন্য কেউ যদি বলতো! হাঁ, আল্লাহর তাকদীর থেকে পালাচ্ছি। তবে অন্য এক তাকদীরের দিকে। আবু উবাইদা তাঁর বাহিনীসহ সেখানে থেকে গেলেন। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমার মদীনা পৌঁছে দূত মারফত আবু উবাইদাকে একখানা পত্র পাঠান। পত্রে তিনি লেখেন ঃ "আপনাকে আমার খুবই প্রয়োজন। অত্যন্ত জরুরীভাবে আপনাকে আমি তলব করছি। আমার এ পত্রখানি যদি রাতের বেলা আপনার কাছে পৌঁছে তাহলে সকাল হওয়ার পূর্বেই

রওয়ানা দেবেন। আর যদি দিনের বেলা পৌঁছে তাহলে সন্ধ্যার পূর্বেই রওয়ানা দেবেন।" খলীফা উমারের এ পত্রখানি হাতে পেয়ে তিনি মন্তব্য করেন ঃ 'আমার কাছে আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজনটা কি তা আমি বুঝেছি। যে বেঁচে নেই তাকে তিনি বাঁচাতে চান।' তারপর তিনি লিখলেন ঃ "আমীরুল মু'মিনীন, আমি আপনার প্রয়োজনটা বুঝেছি। আমি তো মুসলিম মুজাহিদদের মাঝে অবস্থান করছি। তাদের ওপর যে মুসিবাদ আপতিত হয়েছে তা থেকে আমি নিজেকে বাঁচানোর প্রত্যাশী নই। আমি তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাইনা, যতক্ষণ না আল্লাহ আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন। আমার এ পত্রখানি আপনার হাতে পৌঁছার পর আপনি আপনার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন এবং আমাকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দান করুন।"

হযরত উমার এ পত্রখানি পাঠ করে এত ব্যাকুলভাবে কেঁদেছিলেন যে, তাঁর দু'চোখ থেকে ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর এ কান্না দেখে তার আশেপাশের লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ 'আমীরুল মু'মিনীন, আবু উবাইদা কি ইনতিকাল করেছেন?' তিনি বলেছিলেন ঃ 'না। তবে তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে।'

হযরত উমারের ধারণা মিথ্যা হয়নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্লেগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে উপদেশমূলক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন ঃ "তোমাদেরকে যে উপদেশটি আমি দিচ্ছি তোমরা যদি তা মেনে চলো তাহলে সবসময় কল্যাণের পথেই থাকবে। তোমরা নামায কায়েম করবে, রমাদান মাসে রোযা রাখবে, যাকাত দান করবে, হজ্জ ও উমরা আদায় করবে, একে অপরকে উপদেশ দেবে, তোমাদের শাসক ও নেতৃবৃন্দকে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলবে, তাদের কাছে কিছু গোপন রাখবে না এবং দুনিয়ার সুখ সম্পদে গা ভাসিয়ে দেবে না। কোন ব্যক্তি যদি হাজার বছরও জীবন লাভ করে, আজ আমার পরিণতি তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারও এই একই পরিণতি হবে।" সকলকে সালাম জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন। অতঃপর মুয়াজ ইবন জাবালের দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ 'মুয়াজ! তুমি নামাযের ইমামতি কর।' এর পরপরই তাঁর রূহটি পবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরম সত্তার দিকে ধাবিত হয়। মুয়াজ ওঠে দাঁড়িয়ে সমবেত সকলকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ লোক সকল! তোমরা এ ব্যক্তির তিরোধানে ব্যথা ভারাক্রান্ত। আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যক্তির থেকে অধিক কল্যাণদৃপ্ত বক্ষ, পরিচ্ছন্ন হৃদয়, পরকালের প্রেমিক এবং জনগণের উপদেশ দানকারী আর কোন ব্যক্তিকে জানিনা। তোমরা তাঁর প্রতি রহম কর, আল্লাহও তোমাদের প্রতি রহম করবেন। এটা হিজরী ১৮ সনের ঘটনা।

এরপর লোকেরা সমবেত হয়ে আবু উবাইদার মরদেহ বের করে আনলো। মুয়াজ বিন জাবালের ইমামতিতে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হল। মুয়াজ বিন জাবাল, আমর ইবনুল আস ও দাহ্হাক বিন কায়েস কবরের মধ্যে নেমে তাঁর লাশ মাটিতে শায়িত করেন। কবরে মাটিচাপা দেওয়ার পর মুয়াজ এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাঁর প্রশংসা করে বলেন ঃ "আবু উবাইদা, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন! আল্লাহর কসম! আমি আপনার সম্পর্কে যতটুকু জানি কেবল ততটুকুই বলবো, অসত্য কোন কিছু বলবো না। কারণ, আমি আল্লাহর শাস্তির ভয় করি। আমার জানা মতে আপনি ছিলেন আল্লাহকে অত্যধিক স্মরণকারী, বিনম্রভাবে যমীনের ওপর বিচরণকারী ব্যক্তিদের একজন। আর আপনি ছিলেন সেইসব ব্যক্তিদের অন্যতম যারা তাদের 'রবের' উদ্দেশ্যে সিজদারত ও

দাঁড়ানোর অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করে এবং যারা খরচের সময় অপচয়ও করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে থাকে। আল্লাহর কসম; আমার জানা মতে আপনি ছিলেন বিনয়ী এবং ইয়াতিম-মিসকীনদের প্রতি সদয়। আপনি ছিলেন অত্যাচারী অহংকারীদের শত্রুদেরই একজন।'

খাওফে খোদা, ইত্তেবায়ে সুন্নাত, তাকওয়া, বিনয়, সাম্যের মনোভাব, স্নেহ ও দয়া ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। একদিন একটি লোক আবু উবাইদার বাড়ীতে গিয়ে দেখতে পেল, তিনি হাউমাউ করে কাঁদছেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলো ঃ ব্যাপার কি আবু উবাইদা, এত কান্নাকাটি কেন? তিনি বলতে লাগলেন ঃ "একবার রাসূল (সা) মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বিজয় ও ধন-ঐশ্বর্য্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সিরিয়ার প্রসঙ্গ উঠালেন। বললেন ঃ 'আবু উবাইদা তখন যদি তুমি বেঁচে থাক, তাহলে তিনটি খাদেমই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। একটি তোমার নিজের, একটি পরিবার-পরিজনের এবং অন্যটি তোমার সফরে সংগী হওয়ার জন্য। অনুরূপভাবে তিনটি বাহনও যথেষ্ট মনে করবে। একটি তোমার, একটি তোমার খাদেমের এবং একটি তোমার জিনিসপত্র পরিবহনের জন্য।' কিন্তু এখন দেখছি, আমার বাড়ী খাদেমে এবং আস্তাবল ঘোড়ায় ভরে গেছে। হায়, আমি কিভাবে রাসূলুল্লাহকে (সা) মুখ দেখাবো? রাসূল (সা) বলেছিলেন ঃ সেই ব্যক্তিই আমার সর্বাধিক প্রিয় হবে, যে ঠিক সেই অবস্থায় আমার সাথে মিলিত হবে যে অবস্থায় আমি তাকে ছেড়ে যাচ্ছি।"

খলীফা হযরত উমার সিরিয়া সফরের সময় দেখতে পেলেন, অফিসারদের গায়ে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ। তিনি এতই ক্ষেপে গেলেন যে, ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং তাদের দিকে পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করতে করতে বললেন ঃ তোমরা এত তাড়াতাড়ি অনারব অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছো? কিন্তু আবু উবাইদা একজন সাদামাটা আরব হিসেবে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। গায়ে অতি সাধারণ আরবীয় পোশাক, উটের লাগামটিও একটি সাধারণ রশি। খলীফা উমার (রা) তাঁর বাসস্থানে গিয়ে দেখতে পেলেন, সেখানে আরো বেশী সরল-সাদাসিধে জীবনধারার চিহ্ন। অর্থাৎ একটি তলোয়ার একটি ঢাল ও উটের একটি হাওদা ছাড়া তাঁর বাড়ীতে আর কিছু নেই। খলীফা বললেন ঃ আবু উবাইদা, আপনি তো আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন।' জবাবে আবু উবাইদা বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

একবার হযরত উমার (রা) উপঢৌকন হিসেবে চার শ' দীনার ও চার হাজার দিরহাম আবু উবাইদার নিকট পাঠালেন। তিনি সব অর্থই সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। নিজের জন্য একটি পয়সাও রাখলেন না। হযরত 'উমার একথা শুনে মন্তব্য করেন ঃ 'আলহামদু লিল্লাহ! ইসলামে এমন লোকও আছে।'

তিনি এতই বিনয়ী ছিলেন যে, সিপাহসালার হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ সৈনিকদের থেকে তাঁকে পৃথক করা যেত না। অপরিচিত কেউ তাকে সিপাহসালার বলে চিনতে পারতো না। একবার তো এক রোমান দূত এসে জিজ্ঞেস করেই বসে, 'আপনাদের সেনাপতি কে? সৈনিকরা যখন আঙ্গুল উঁচিয়ে তাঁকে দেখিয়ে দিল, তখন তো সে সেনাপতির অতি সাধারণ পোশাক ও অবস্থান দেখে হতভম্ব হয়ে গেল।

সাঈদ ইবন যায়িদ (রা)

নাম সাঈদ, কুনিয়াত আবুল আ'ওয়ার। পিতা যায়িদ, মাতা ফাতিমা বিন্‌তু বা'জা। উর্ধপুরুষ কা'ব ইবন লুই-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে।

সাঈদের পিতা যায়িদ ছিলেন জাহিলী যুগের মক্কার মুষ্টিমেয় সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন যাঁরা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই শিরক ও পৌত্তলিকতা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখেন, সব রকম পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকেন। এমন কি মুশরিকদের হাতে যবেহ করা জন্তুর গোশ্‌তও পরিহার করতেন। একবার নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে 'বালদাহ' উপত্যকায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে খাবার আনা হলে তিনি খেতে অস্বীকৃতি জানান। যায়িদকে খাওয়ার অনুরোধ করা হলে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমাদের দেব-দেবীর নামে যবেহকৃত পশুর গোশ্‌ত আমি খাইনে।'

হযরত আসমা (রা) বলেন ঃ একবার আমি যায়িদকে দেখলাম, তিনি কা'বার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বলছেন, ওহে কুরাইশ বংশের লোকেরা আল্লাহর কসম, আমি ছাড়া দ্বীনে হানীফের ওপর তোমাদের মধ্যে আর কেউ নেই।

জাহিলী যুগে সাধারণতঃ কন্যা সন্তান জীবন্ত দাফন করা হতো। কোথাও কোন কন্যা সন্তান হত্যা বা দাফন করা হচ্ছে শুনতে পেলে যায়িদ তার অভিভাবকের কাছে চলে যেতেন এবং সন্তানটিকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিতেন। তারপর সে বড় হলে তার পিতার কাছে নিয়ে গিয়ে বলতেন, ইচ্ছে করলে এখন তুমি নিজ দায়িত্বে নিতে পার অথবা আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিতে পার।

কুরাইশরা তাদের কোন একটি উৎসব পালন করছে। মানুষের ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে যায়িদ ইবন আমর ইবন নুফায়িল তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি দেখছেন, পুরুষেরা তাদের মাথায় বেঁধেছে দামী রেশমী পাগড়ী, গায়ে জড়িয়েছে মূল্যবান ইয়ামনী চাদর। আর নারী ও শিশুরা পরেছে মূল্যবান পোশাক ও অলঙ্কার। তিনি আরও দেখছেন, ধনী ব্যক্তিরা গৃহপালিত পশুকে মূল্যবান সাজে সুসজ্জিত করে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে তাদের দেব-দেবীর সামনে বলি দেওয়ার জন্য।

তিনি কা'বার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন ঃ

'কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! এই ছাগলগুলি সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের পান করান, যমীনে ঘাস সৃষ্টি করে তাদের আহার দান করেন। আর তোমরা অন্যের নামে সেগুলি যবেহ কর? আমি তোমাদেরকে একটি মূর্খ সম্প্রদায়রূপে দেখতে পাচ্ছি।

এ কথা শুনে তাঁর চাচা ও উমার ইবনুল খাত্তাবের পিতা আল খাত্তাব উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে বলল–

তোর সর্বনাশ হোক! সব সময় আমরা তোর মুখ থেকে এ ধরনের বাজে কথা শুনে সহ্য করে আসছি। এখন আমাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। তারপর তার গোত্রের বোকা লোকদের উত্তেজিত করে তুলল তাঁকে কষ্ট দিয়ে ত্যক্ত-বিরক্ত করে তুলতে। অবশেষে তিনি বাধ্য হলেন মক্কা ছেড়ে হিরা পর্বতে আশ্রয় নিতে। তাতেও সে ক্ষান্ত হল না। গোপনেও যাতে তিনি মক্কায় প্রবেশ করতে না পারেন, সেদিকে সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখার জন্য একদল কুরাইশ যুবককে সে নিয়োগ করে রাখে।

অতঃপর যায়িদ ইবন আমর কুরাইশদের অগোচরে ওয়ারাকা ইবন নাওফিল, আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ, উসমান ইবনুল হারিস এবং মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহর ফুফু উমাইমা বিনতু 'আবদিল মুত্তালিবের সাথে গোপনে মিলিত হলেন। আরববাসী যে চরম গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত সে ব্যাপারে তিনি তাদের সাথে মত বিনিময় করলেন। যায়িদ তাঁদেরকে বললেন ঃ

'আল্লাহর কসম আপনারা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আপনাদের এ জাতি কোন ভিত্তির ওপর নেই। তারা দ্বীনে ইবরাহীমকে বিকৃত করে ফেলেছে, তার বিরুদ্ধাচরণ করে চলছে। আপনারা যদি মুক্তি চান, নিজেদের জন্য একটি দ্বীন অনুসন্ধান করুন।'

অতপর এ চার ব্যক্তি ইয়াহুদী, নাসারা ও অন্যান্য ধর্মের ধর্মগুরুদের নিকট গেলেন দ্বীনে ইবরাহীম তথা দ্বীনে হানীফ সম্পর্কে জানার জন্য। ওয়ারাকা ইবন নাওফিল খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ উসমান ইবনুল হারিস কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। আর যায়িদ ইবন 'আমর ইবন নুফায়িলের জীবনে ঘটে গেল এক চমকপ্রদ ঘটনা। আমরা সে ঘটনা তাঁর জবানেই পেশ করছি।

'আমি ইয়াহুদী ও খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে অবগত হলাম; কিন্তু সে ধর্মে মানসিক শান্তি পাওয়ার মত তেমন কিছু না পেয়ে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলাম। এক পর্যায়ে আমি শামে (সিরিয়া) এসে উপস্থিত হলাম। আমি আগেই শুনেছিলাম সেখানে একজন রাহিব' 'সংসারত্যাগী ব্যক্তি আছেন, যিনি আসমানী কিতাবে অভিজ্ঞ। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আমার কাহিনী বিবৃত করলাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন— 'ওহে মক্কাবাসী ভাই, আমার মনে হচ্ছে আপনি দ্বীনে ইবরাহীম অনুসন্ধান করছেন।'

বললাম 'হ্যাঁ আমি তাই অনুসন্ধান করছি।'

তিনি বললেন ঃ 'আপনি যে দ্বীনের সন্ধান করছেন, আজকের দিনেতো তা পাওয়া যায়না। তবে সত্য তো আপনার শহরে। আল্লাহ আপনার কওমের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি পাঠাবেন যিনি দ্বীনে ইবরাহীম পুনরুজ্জীবিত করবেন। আপনি যদি তাকে পান তাঁর অনুসরণ করবেন।'

যায়িদ আবার মক্কার দিকে যাত্রা শুরু করলেন। প্রতিশ্রুত নবীকে খুঁজে বের করার জন্য দ্রুত পা চালালেন।

তিনি যখন মক্কা থেকে বেশ কিছু দূরে, তখনই আল্লাহ তা'য়ালা নবী মুহাম্মাদকে (সা) হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠালেন। কিন্তু যায়িদ তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন না। কারণ, মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই একদল বেদুঈন ডাকাত তাঁর উপর চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যা করে।

এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দর্শন লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'আ করেন–

আল্লাহুম্মা ইন কুনতা হারামতানি মিন হাজাল খায়রি ফালা তাহরিম মিনহু ইবনী সাঈদান'– 'হে আল্লাহ, যদিও এ কল্যাণ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন, আমার পুত্র সাঈদকে তা থেকে আপনি মাহরুম করবেন না।'

আল্লাহ তা'আলা যায়িদের এ দু'আ কবুল করেছিলেন। রাসূল (সা) লোকদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। প্রথম ভাগেই যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) ওপর ঈমান আনলেন তাঁদের মধ্যে সাঈদও একজন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, সাঈদ প্রতিপালিত হয়েছিলেন এমন এক গৃহে, যে গৃহ ঘৃণাভরে প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান করেছিল কুরাইশদের সকল কুসংস্কার ও গুমরাহীকে। তাঁর পিতা ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন সত্যের সন্ধানে। সাঈদ একাই ইসলাম গ্রহণ করেননি, সাথে তাঁর সহধর্মিনী উমার ইবনুল খাত্তাবের বোন ফাতিমা বিনতুল খাত্তাবও ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের কারণে কুরাইশ বংশের এ যুবকও অন্যদের মত যুলুম অত্যাচারের শিকার হন। কুরাইশরা তাঁকে ইসলাম থেকে ফেরানো দূরে থাক, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে বরং কুরাইশদের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন ইসলামের মধ্যে। তিনি হলেন তাঁর শ্যালক হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)। তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা 'উমারকে ইসলামের মধ্যে নিয়ে আসেন।

হযরত সাঈদ তার যৌবনের সকল শক্তি ব্যয় করেন ইসলামের খিদমতে। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স বিশ বছরও অতিক্রম করেনি। একমাত্র বদর যুদ্ধ ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অন্য সব যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিরিয়ায় থাকার কারণে তিনি বদর যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। তবে বদর যুদ্ধের গণিমতের অংশ তিনি লাভ করেছিলেন। এ হিসাবে তিনি প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে বদর বাহিনীর সদস্য ছিলেন।

পারস্যের কিসরা ও রোমের কাইসারের সিংহাসন পদানত করার ব্যাপারে তিনি মুসলিম সৈন্য বাহিনীর সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মুসলিমদের সাথে তাদের যতগুলি যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার প্রত্যেকটিতে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ইয়ারমুক যুদ্ধেই তিনি তাঁর বীরত্বের চরম পরাকষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন,

"ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমরা ছিলাম ছাব্বিশ হাজার বা তার কাছাকাছি। অন্যদিকে রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লাখ বিশ হাজার। তারা অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপে পর্বতের মত অটল ভংগিতে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। তাদের অগ্রভাগে বিশপ ও পাদ্রী-পুরোহিতদের বিরাট এক দল। হাতে তাদের ক্রুশ খচিত পতাকা, মুখে প্রার্থনা সংগীত। পেছন থেকে তাদের সুরে সুর মিলাচ্ছিল বিশাল সেনাবাহিনী। তাদের সেই সম্মিলিত কণ্ঠস্বর তখন মেঘের গর্জনের মত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল।

মুসলিম বাহিনী এ ভয়াবহ দৃশ্য ও তাদের বিপুল সংখ্যা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ভয়ে তাদের অন্তরও কিছুটা কেঁপে উঠলো, সেনাপতি আবু উবাইদা তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং মুসলিম সৈন্যদের জিহাদে অনুপ্রাণিত করে এক ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমাদের পা'কে দৃঢ় করবেন।

আল্লাহর বান্দারা! ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্য হল কুফরী থেকে মুক্তির পথ, প্রভুর রিজামন্দী হাসিলের পথ এবং অপমান ও লজ্জার প্রতিরোধক। তোমরা তীর বর্শা শানিত করে ঢাল হাতে প্রস্তুত হয়ে যাও। অন্তরে আল্লাহর যিকর ছাড়া অন্য সব চিন্তা থেকে বিরত থাক। সময় হলে আমি তোমাদের নির্দেশ দেব ইনশাআল্লাহ।"

সাঈদ (রা) বলেন,

তখন মুসলিম বাহিনীর ভেতর থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে আবু 'উবাইদাকে বলল,

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ মুহূর্তে আমি আমার জীবন কুরবানী করব। রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছে দিতে হবে এমন কোন বাণী কি আপনার আছে?' আবু উবাইদা বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আছে। তাঁকে আমার ও মুসলিমদের সালাম পৌঁছে দিয়ে বলবে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের রব আমাদের সাথে যে অংগীকার করেছেন, তা আমরা সত্যই পেয়েছি।'

সাঈদ (রা) বলেন,

"আমি তাঁর কথা শুনা মাত্রই দেখতে পেলাম সে তার তরবারি কোষমুক্ত করে আল্লাহর শত্রুদের সাথে সংঘর্ষের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। এ অবস্থায় আমি দ্রুত মাটিতে লাফিয়ে পড়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে অগ্রসর হলাম এবং আমার বর্শা হাতে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। শত্রুপক্ষের প্রথম যে ঘোড় সওয়ার আমাদের দিকে এগিয়ে এলো আমি তাকে আঘাত করলাম। তারপর অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তর থেকে সকল প্রকার ভয়ভীতি একেবারেই দূর করে দিলেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী রোমান বাহিনীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালাল এবং তাদেরকে পরাজিত করল।"

দিমাশ্ক অভিযানেও সাঈদ ইবন যায়িদ অংশগ্রহণ করেন। দিমাশ্ক জয়ের পর আবু 'উবাইদা তাঁকে সেখানকার ওয়ালী নিযুক্ত করেন। এভাবে তিনি হলেন দিমাশকের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম ওয়ালী। কিন্তু জিহাদের প্রতি প্রবল আগ্রহের কারণে এ পদ লাভ করে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি আবু উবাইদাকে লিখলেন ঃ 'আপনারা জিহাদ করবেন, আর আমি বঞ্চিত হবো, এমন আত্মত্যাগ ও কুরবানী আমি করতে পারিনে।' চিঠি পৌছার সাথে সাথে কাউকে আমার স্থলে পাঠিয়ে দিন। আমি শিগ্‌গিরই আপনার নিকট পৌঁছে যাচ্ছি। আবু উবাইদা বাধ্য হয়ে হযরত ইয়াযিদ ইবন আবু সুফিয়ানকে দিমাশকের ওয়ালী নিযুক্ত করলেন এবং হযরত সাঈদ জিহাদের ময়দানে ফিরে গেলেন।

উমাইয়া যুগে হযরত সাঈদ ইবন যায়িদকে কেন্দ্র করে এক আশ্চর্যময় ঘটনা ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে মদীনাবাসীদের মুখে ঘটনাটি শোনা যেত।

ঘটনাটি হল, আরওয়া বিন্‌তু উওয়াইস নাম্নী এক মহিলা দুর্নাম রটাতে থাকে যে সাঈদ ইবন যায়িদ তার জমির একাংশ জবরদখল করে নিজ জমির সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন। যেখানে সেখানে সে একথা বলে বেড়াতে লাগল। এক পর্যায়ে সে মদীনার ওয়ালী মারওয়ান ইবনুল হিকামের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করল। বিষয়টি যাচাই করে দেখার জন্য মারওয়ান কয়েকজন লোককে সাঈদের নিকট পাঠালেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী হযরত সাঈদের জন্য বিষয়টি ছিল বেশ কষ্টদায়ক। তিনি বললেন ঃ

"তারা মনে করে আমি তার ওপর যুল্‌ম করছি। কিভাবে আমি যুল্‌ম করতে পারি? আমি তো রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ 'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি যুল্‌ম করে নেবে, কিয়ামতের দিন সাত তবকা যমীন তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।' ইয়া আল্লাহ্! সে ধারণা করেছে অমি তার ওপর যুল্‌ম করেছি। যদি সে মিথ্যুক হয়, তার চোখ অন্ধ করে দাও, যে কূপ নিয়ে সে আমার সাথে ঝগড়া করেছে, তার মধ্যেই তাকে নিক্ষেপ কর এবং আমার পক্ষে এমন আলোক প্রকাশ করে দাও যাতে মুসলিমদের মাঝে স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমি তার ওপর কোন যুল্‌ম করিনি।"

এ ঘটনার পর কিছু দিন যেতে না যেতেই আকীক উপত্যকা এমনভাবে প্লাবিত হল যে অতীতে আর কখনো তেমন হয়নি। ফলে দু' যমীনের মাঝখানের বিতর্কিত অদৃশ্য চিহ্নটি এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল যে, মুসলিমরা তা দেখে বুঝতে পারল সাঈদ সত্যবাদী। তারপর একমাস না যেতেই মহিলাটি অন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় একদিন সে তার যমীনে পায়চারী করতে করতে বিতর্কিত কূপটির মধ্যে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন,

'আমরা শুনতাম লোকেরা কাউকে অভিশাপ দিতে গেলে বলত ঃ আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করুন যেমন অন্ধ করেছেন আরওয়াকে। এ ঘটনায় অবাক হওয়ার তেমন কিছু নেই, কারণ রাসূল (সা) তো বলেছেন ঃ

'তোমরা মাযলুমের দু'আ থেকে দূরে থাক। কারণ, সেই দু'আ আর আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না।' এই যদি হয় সব মাযলুমের অবস্থা, তাহলে 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ' জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জনের একজন সাঈদ ইবন যায়িদের মত মাযলুমের দু'আ কবুল হওয়া তেমন আর আশ্চর্য কি?

আবু নুয়াঈম, বিরাহ ইবনুল হারিস থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ মুগীরা ইবন শু'বা একটি বড় মসজিদে বসে ছিলেন। তখন তাঁর ডানে বাঁয়ে বসা ছিল কুফার কিছু লোক। এমন সময় সাঈদ ইবন যায়িদ নামক এক ব্যক্তি এলেন। মুগীরা তাকে সালাম করে খাটের ওপর পায়ের দিকে বসালেন। অতঃপর কুফাবাসী এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে মুগীরার দিকে মুখ করে গালি বর্ষণ করতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ মুগীরা, এ লোকটি কার প্রতি গালি বর্ষণ করছে? বললেন ঃ আলী ইবন আবী তালিবের প্রতি। তিনি বললেন ঃ ওহে মুগীরা! এভাবে তিনবার ডাকলেন। তারপর বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের আপনার সামনে গালি দেওয়া হবে, আর আপনি তার প্রতিবাদ করবেন না, এ আমি দেখতে চাইনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আবু বকর জান্নাতী, 'উমার জান্নাতী, 'উসমান জান্নাতী, 'আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর

রাহমান জান্নাতী, সা'দ ইবন মালিক জান্নাতী। এবং নবম এক ব্যক্তিও জান্নাতী, তোমরা চাইলে আমি তার নামটিও বলতে পারি। রাবী বলেন ঃ লোকেরা সমস্বরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল ঃ হে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী, নবম ব্যক্তিটি কে? বললেন ঃ নবম ব্যক্তিটি আমি। তারপর তিনি কসম করে বললেন ঃ যে ব্যক্তি একটি মাত্র যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেছে, রাসূলুল্লাহর সাথে তার মুখমণ্ডল ধূলি ধুসরিত হয়েছে, তার এই একটি কাজ যে কোন ব্যক্তির জীবনের সকল সৎকর্ম অপেক্ষা উত্তম—যদিও সে নূহের সমান বয়সই লাভ করুক না কেন। (হায়াতুস সাহাবা/২য়-৪৭০ পৃঃ)

তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীদের অন্যতম। সাঈদ ইবন হাবীব বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আবু বকর, 'উমার, উসমান, আলী, সা'দ, সাঈদ, তালহা, যুবাইর ও আবদুর রাহমান ইবন আওফের স্থান ও ভূমিকা ছিল একই। যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা থাকতেন রাসূলুল্লাহর (সা) আগে এবং নামাযের জামাআতে থাকতেন তাঁর পেছনে।

সাঈদ ইবন যায়িদের নিকট থেকে সাহাবীদের মধ্যে ইবন 'উমার 'আমর ইবন হুরাইস, আবু আত্ তুফাইল এবং আবু উসমান আন-নাহদী, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, কায়েস ইবন আবী হাযেম প্রমুখ প্রখ্যাত তাবেয়ীগণও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওয়াকিদী বলেন ঃ তিনি আকীক উপত্যকায় ইনতিকাল করেন এবং মদীনায় সমাহিত হন। মৃত্যুসন হিজরী ৫০। মতান্তরে হিজরী ৫১ অথবা ৫২। সত্তর বছরের ওপর তিনি জীবন লাভ করেন। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস তাঁকে গোসল দিয়ে কাফন পরান এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। তবে হাইসাম ইবন 'আদীর মতে তিনি কুফায় ইনতিকাল করেন এবং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মুগীরা ইবন শু'বা তাঁর জানাযার ইমামতি করেন।

হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)

নাম তাঁর হামযা, আবু ইয়ালা ও আবু 'আম্মারা কুনিয়াত এবং আসাদুল্লাহ উপাধি। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) আপন চাচা। হযরত হামযার জননী হালা বিনতু উহাইব রাসূলুল্লাহর (সা) জননী হযরত আমিনার চাচাতো বোন। তাছাড়া হামযা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) দুধ ভাই। আবু লাহাবের দাসী 'সুওয়াইবা' তাঁদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছিল। বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অপেক্ষা দু' বছর মতান্তরে চার বছর বড়। ছোট বেলা থেকেই তরবারি চালনা, তীরন্দাযী ও কুস্তির প্রতি ছিল তার প্রবল আগ্রহ। ভ্রমণ ও শিকারে ছিল তাঁর সীমাহীন আকর্ষণ। জীবনের বিরাট এক অংশ তিনি এ কাজে ব্যয় করেন।

বেশ কিছুকাল যাবত মক্কার অলি গলিতে তাওহীদের দাওয়াত উচ্চারিত হচ্ছিলো। তবে হামযার মত সিপাহী-স্বভাব মানুষের এ দাওয়াতের প্রতি তেমন মনোযোগ ছিলো না।

একদিন তিনি শিকার থেকে ফিরছিলেন। সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি এলে আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের এক দাসী তাঁকে ডেকে খবরটি দিল। বললো ঃ 'আবু আম্মারা, ইস্, কিছুক্ষণ আগে এসে আপনার ভাতিজার অবস্থা যদি একটু দেখতেন! তিনি কা'বার পাশে মানুষকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। আবু জাহল তাঁকে শক্ত গালি দিয়েছে, ভীষণ কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদ কোন প্রত্যুত্তর না করে নিতান্ত অসহায়ভাবে ফিরে গেছেন।' একথা শুনে তাঁর সৈনিকসুলভ রক্ত টগবগ করে উঠলো। দ্রুত তিনি কা'বার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, শিকার থেকে ফেরার পথে কারো সংগে সাক্ষাৎ হলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তার সংগে দু'চারটি কথা বলা। কিন্তু আজ তিনি প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মাদ হয়ে পড়লেন। রাস্তায় কারো দিকে কোন রকম ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা কা'বার কাছে গিয়ে আবু জাহলের মাথায় ধনুক দিয়ে সজোরে এক আঘাত বসিয়ে দিলেন। আবু জাহলের মাথা কেটে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে বনু মাখযুমের কিছু লোক আবু জাহলের সাহায্যে ছুটে এলো। তারা বললো ঃ 'হামযা, সম্ভবতঃ তুমি ধর্মত্যাগী হয়েছো।' জবাবে বললেন ঃ 'যখন তার সত্যতা আমার নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তখন তা থেকে আমাকে বিরত রাখবে কে? হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। যা কিছু তিনি বলেন সবই সত্যি। আল্লাহর কসম আমি তা থেকে আর ফিরে আসতে পারিনে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, আমাকে একটু বাধা দিয়েই দেখ।' আবু জাহল তার সাহায্যে এগিয়ে আসা লোকদের বললো ঃ 'তোমরা আবু আম্মারকে ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম, কিছুক্ষণ আগেই আমি তাঁর ভাতিজাকে মারাত্মক গাল দিয়েছি।'

পরবর্তীকালে হযরত হামযা বলেছেন, আমি ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে কথাগুলি তো বলে ফেল্লাম; কিন্তু আমার পূর্বপুরুষ ও গোত্রের ধর্মত্যাগের জন্য আমি অনুশোচনায় দগ্ধিভূত হতে লাগলাম। একটা সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে পড়ে সারা রাত ঘুমোতে পারলাম না। কা'বায় এসে অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করলাম, যেন আমার

অন্তর-দুয়ার সত্যের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়, অন্তর থেকে সংশয় বিদূরিত হয়। দুআর পর আমার অন্তর দৃঢ় প্রত্যয়ে পূর্ণ হয়ে যায়। তারপর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে আমার অবস্থা বর্ণনা করলাম। তিনি আমার অন্তরের স্থিতির জন্য দুআ করলেন।

এটা মুসলমানদের সেই দুঃসময়ের কথা যখন রাসূল (সা) আরকাম ইবন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় নিয়ে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন। মুসলমান বলতে তখন ছিলেন মুষ্টিমেয় কিছু নিরাশ্রয় মানুষ। এ অবস্থায় আকস্মিকভাবে হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণে অবস্থা ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। মুমিনদের সাথে কাফিরদের অহেতুক বাড়াবাড়ি ও বেপরোয়া ভাব অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, তাঁর দুঃসাহস ও বীরত্বের কথা মক্কার প্রতিটি লোকই জানতো।

হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের পর একদিন হযরত উমার (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দানের জন্য গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট। তিনি তখন হযরত আরকামের গৃহে কতিপয় সাহাবীর সাথে অবস্থান করছেন। হযরত হামযাও তখন সেখানে। হযরত উমার ছিলেন সশস্ত্র। তাঁকে দেখেই উপস্থিত সকলে প্রমাদ গুণলো। কিন্তু হযরত হামযা বলে উঠলেন ঃ 'তাকে আসতে দাও। যদি সে ভালো উদ্দেশ্যে এসে থাকে, আমরাও তার সাথে ভালো ব্যবহার করবো। অন্যথায় তারই তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করা হবে।' হযরত উমার ভেতরে ঢুকেই কালেমা তাওহীদ পাঠ করতে শুরু করেন। তখন উপস্থিত মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। এই দুই মনীষীর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়। মক্কার মুশরিকরা উপলব্ধি করে, মুহাম্মাদের (সা) গায়ে আঁচড় কাটা আর সহজ হবে না।

মক্কায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রিয় খাদেম যায়িদ ইবন হারিসার সাথে হামযার ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। যায়িদের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালোবাসা এত প্রগাঢ় হয় যে, যখন তিনি বাইরে কোথাও যেতেন তাঁকেই সব ব্যাপারে অসীয়াত করে যেতেন।

নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছরে আরো অনেকের সংগে হযরত হামযাও মদীনায় হিজরাত করলেন। এখানে তাঁর খোদা প্রদত্ত শক্তি ও সাহসিকতা প্রকাশ করার বাস্তব সুযোগ এসে যায়।

হিজরাতের সপ্তম মাসে রাসূল (সা) 'ঈস' অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলের দিকে তিরিশ সদস্যের মুহাজিরদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠান। উদ্দেশ্য, কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করা। এ বাহিনীতে আনসারদের কেউ ছিল না। এখানে তাঁরা সমুদ্র উপকূলে আবু জাহলের নেতৃত্বে মক্কার তিনশো অশ্বারোহীর একটি বাহিনীর মুখোমুখি হন। তারা সিরিয়া থেকে ফিরছিল। কিন্তু মাজদী ইবন 'আমর জুহানীর প্রচেষ্টায় এ যাত্রা সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। মাজদীর সাথে দু'পক্ষের সন্ধিচুক্তি ছিল। মদীনা থেকে যাত্রার প্রাক্কালে রাসূল (সা) হযরত হামযার হাতে ইসলামী ঝাণ্ডা তুলে দেন। ইবন আবদিল বারসহ কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, এটাই ছিল রাসূল (সা) কর্তৃক কোন মুসলমানের হাতে তুলে দেওয়া প্রথম ঝাণ্ডা। (সীরাতু ইবন হিশাম)

দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে ষাট জন সশস্ত্র সাহাবী নিয়ে কুরাইশদের বাণিজ্য চলাচল পথে 'আবওয়া' অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানেও হযরত হামযা ছিলেন পতাকাবাহী এবং গোটা বাহিনীর কমাণ্ডও ছিল তাঁর হাতে। মুসলিম বাহিনী পৌঁছার আগেই কুরাইশ কাফিলা অতিক্রম করায় এ যাত্রাও কোন সংঘর্ষ ঘটেনি। এমনিভাবে হিজরী দ্বিতীয় সনের 'উশায়রা' অভিযানেও হযরত হামযা মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহীর গৌরব লাভ করেন।

হিজরী দ্বিতীয় সনে ইসলামের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষ কাতারবন্দী হওয়ার পর কুরাইশ পক্ষের উতবা, শাইবা ও ওয়ালিদ সারি থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম বাহিনীর কাউকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানায়। দ্বীনের সিপাহীদের মধ্য থেকে তিনজন আনসার জওয়ান তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে যান। কিন্তু উতবা চিৎকার করে বলে উঠে ঃ 'মুহাম্মাদ, আমাদের সমকক্ষ লোকদেরই পাঠাও। এসব অনুপযুক্ত লোকদের সাথে আমরা লড়তে চাই না। রাসূলুল্লাহ (সা) আদেশ দিলেন ঃ হামযা, আলী ও উবাইদা ওঠো, সামনে এগিয়ে যাও।' তাঁরা শুধু আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলেন। এ তিন বাহাদুর আপন আপন নিযা ও বর্শা নিয়ে তাঁদের প্রতিপক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথম আক্রমণেই হযরত হামযা জাহান্নামে পাঠালেন উতবাকে। হযরত আলীও বিজয়ী হলেন তাঁর প্রতিপক্ষের ওপর। কিন্তু আবু উবাইদা ও ওয়ালিদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধস্তাধস্তি চলতে লাগলো। অতঃপর আলীর সহযোগিতায় আবু উবাইদা তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন। শত্রুপক্ষের এ বেগতিক অবস্থা দেখে তুয়াইমা ইবন আদী' তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। হামযার সহযোগিতায় আলী (রা) তরবারির এক আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলেন। এরপর মুশরিক বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণ চালায়। মুসলিম মুজাহিদরাও ঝাঁপিয়ে পড়েন। তুমুল লড়াই শুরু হয়ে যায়। এ যুদ্ধে হযরত হামযা পাগড়ীর ওপর উটপাখির পালক গুঁজে রেখেছিলেন। এ কারণে যে দিকে তিনি যাচ্ছিলেন সুস্পষ্টভাবে তাকে দেখা যাচ্ছিল। দু'হাতে বজ্রমুষ্টিতে তরবারি ধরে বীরত্বের সাথে কাফিরদের ব্যূহ তছনছ করে দিচ্ছিলেন। এ যুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) দুশমনরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। উমাইয়্যা ইবন খালাফ হযরত আবদুর রহমান ইবন 'আউফকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ উটপাখির পালক লাগানো এ লোকটি কে? তিনি যখন বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হামযা, তখন সে বলেছিল ঃ 'এ ব্যক্তিই আজ আমাদের সবচেয়ে বেশী সর্বনাশ করেছে।'

মদীনার উপকণ্ঠেই ছিল ইয়াহুদী গোত্র বনু কাইনুকা'র বসতি। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার পর তাদের সাথে একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভে তাদের হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এ চুক্তি ভংগের কারণে রাসূল (সা) দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানেও হযরত হামযা পতাকাবাহীর দায়িত্ব পালন করেন।

বদরের শোচনীয় পরাজয়ে কুরাইশদের আত্ম অভিমান দারুণভাবে আহত হয়। প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত বিশাল কুরাইশ বাহিনী হিজরী তৃতীয় সনে মদীনার দিকে ধাবিত হলো। আল্লাহর রাসূল (সা) সংগীদের নিয়ে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে তাদের গতিরোধ করেন। শাওয়াল মাসে যুদ্ধ শুরু হয়। কাফিরদের পক্ষ থেকে 'সিবা' নামক এক বাহাদুর সিপাহী এগিয়ে এসে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানায়। হযরত হামযা কোষমুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে ময়দানে এসে হুংকার ছেড়ে বললেন ঃ ওরে উম্মে আনমারের অপবিত্র পানির সন্তান, তুই এসেছিস আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়তে? এ কথা বলে তিনি এমন প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন যে, এক আঘাতেই সিবার কাজ শেষ। তারপর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। হযরত হামযার ক্ষিপ্র আক্রমণে কাফিরদের ব্যূহ তছনছ হয়ে গেল। এ যুদ্ধে তিনি একাই তিরিশ জন কাফির সৈন্যকে হত্যা করেন।

যেহেতু হযরত হামযা বদর যুদ্ধে কুরাইশদের বাছাবাছা নেতৃবৃন্দকে হত্যা করেছিলেন, এ কারণে কুরাইশদের সকলেই তাঁরই খুনের পিয়াসী ছিল সবচেয়ে বেশী। হযরত হামযার হত্যাকারী ওয়াহশী উহুদ ময়দানে হামযার হত্যা ঘটনাটি পরবর্তীকালে বর্ণনা করেছেন। ইবন হিশাম তাঁর 'সীরাত' গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন। ওয়াহশী বলেন ঃ 'আমি ছিলাম জুবাইর ইবন মুতয়িমের এক হাবশী ক্রীতদাস। বদর যুদ্ধে জুবাইরের চাচা তুয়াইম ইবন 'আদী হামযার হাতে নিহত হয়। মক্কায় ফিরে জুবাইর আমাকে বললো ঃ যদি তুমি মুহাম্মাদের চাচা হামযাকে হত্যা করে আমার চাচার হত্যার বদলা নিতে পার, আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব। আমাকে সে বিশেষভাবে ট্রেনিং দিল। আমি শুধু হামযাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই উহুদের দিকে রওয়ানা হলাম। যুদ্ধ শুরু হলো। একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে হামযার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমার কাছাকাছি উপস্থিত হলে অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করলাম। তারপর আমার স্বপক্ষ সৈন্যদের নিকট ফিরে এসে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকলাম। যুদ্ধে আর অংশ গ্রহণ করলাম না। কারণ, আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। আমি মক্কায় ফিরে এলে আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।'

এ মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয় তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি। হযরত হামযার বয়স তখন ষাটের কাছাকাছি।

হযরত হামযার শাহাদাত লাভের পর কুরাইশ রমণীরা আনন্দ সংগীত গেয়েছিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতু উতবা হামযার নাক-কান কেটে অলংকার বানিয়েছিল, বুক, পেট চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে থুথু নিক্ষেপ করেছিল। একথা শুনে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে কি তার কিছু অংশ খেয়েও ফেলেছে? লোকেরা বলেছিল ঃ না। তিনি বলেছিলেন ঃ হামযার দেহের কোন একটি অংশও আল্লাহ জাহান্নামে যেতে দেবেন না।

যুদ্ধ শেষে শহীদের দাফন-কাফনের পালা শুরু হলো। রাসূল (সা) সম্মানিত চাচার লাশের কাছে এলেন। যেহেতু হিন্দা তাঁর নাক-কান কেটে বিকৃত করে ফেলেছিল, তাই এ দৃশ্য দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন ঃ কিয়ামাতের দিন হামযা হবে

'সাইয়েদ্যদুশ শুহাদা' বা সকল শহীদের নেতা। তিনি আরো বললেন ঃ তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার জানামতে তুমি ছিলে আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে অধিক সচেতন, অতিশয় সৎকর্মশীল। যদি সাফিয়্যার শোক ও দুঃখের কথা আমার মনে না থাকতো তাহলে এভাবেই তোমাকে ফেলে রেখে যেতাম, যাতে পশু-পাখী তোমাকে খেয়ে ফেলতো এবং কিয়ামাতের দিন তাদের পেট থেকে আল্লাহ তোমাকে জীবিত করতেন। আল্লাহর কসম, 'তোমার প্রতিশোধ নেওয়া আমার ওপর ওয়াজিব। আমি তাদের সত্তর জনকে তোমার মত নাক-কান কেটে বিকৃত করবো।' রাসূলুল্লাহর (সা) এ কসমের পর জীবরীল (আ) সূরা নাহলের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি নিয়ে অবতীর্ণ হলেন ঃ

'যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে, ধৈর্যশীলদের জন্য তাই-ই তো উত্তম। ধৈর্য ধারণ কর। তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহরই সাহায্যে। তাদের জন্য দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়োনা।' (সূরা নাহল/১২৬-২৭)

এ আয়াত নাযিলের পর রাসূল (সা) কসমের কাফ্ফারা আদায় করেন। (তাবাকাতে ইবন সাদ)

হযরত সাফিয়্যা ছিলেন হযরত হামযার সহোদরা। ভায়ের শাহাদাতের খবর শুনে তাঁকে এক নজর দেখার জন্য দৌড়ে আসেন। কিন্তু রাসূল (সা) তাঁকে দেখতে না দিয়ে কিছু সান্ত্বনা দিয়ে ফিরিয়ে দেন। ভায়ের কাফনের জন্য হযরত সাফিয়্যা দু'খানি চাদর পাঠান। কিন্তু হযরত হামযারই পাশে আরেকটি লাশও কাফনহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। তাই চাদর দু'খানি দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) বলেন, একটি চাদর ছাড়া হামযাকে কাফন দেওয়ার জন্য আর কোন কাপড় আমরা পেলাম না। তা দিয়ে পা ঢাকলে মাথা এবং মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাই আমরা চাদর দিয়ে মাথা এবং 'ইজখির' ঘাস দিয়ে পা ঢেকে দিলাম। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩২৬) সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামযাকে উহুদের ময়দানেই দাফন করা হয়। ইমাম বুখারী হযরত জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদ যুদ্ধের শহীদদের দু'জন করে একটি কবরে দাফন করেছিলেন। হামযা ও আবদুল্লাহ ইবন জাহাশকে এক কবরে দাফন করা হয়।

ইবন হাজার *'আল-ইসাবা'* গ্রন্থে 'ফাওয়ায়েদে আবিত তাহিরের' সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ মুয়াবিয়া যে দিন উহুদে কূপ খনন করেছিলেন সেদিন আমরা উহুদের শহীদদের জন্য কান্নাকাটি করেছিলাম। শহীদদের আমরা সম্পূর্ণ তাজা অবস্থায় পেয়েছিলাম। এক ব্যক্তি হযরত হামযার পায়ে আঘাত করলে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে পড়ে।

হযরত হামযার হত্যাকারী হযরত ওয়াহশী (রা) মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) খেদমতে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

তুমি কি ওয়াহশী? জবাব দিলেন ঃ হাঁ। 'তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছো?' জবাব দিলেন ঃ 'আল্লাহ্‌র রাসূল যা শুনেছেন, তা সত্য।' রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তুমি কি তোমার চেহারা আমার নিকট একটু গোপন করতে পার?' তক্ষুনি তিনি বাইরে বেরিয়ে যান এবং জীবনে আর কখনো রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) মুখোমুখি হননি। রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফত কালে ভণ্ডনবী মুসাইলামার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। তিনিও সে অভিযানে অংশ নিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, মুসাইলামাকে হত্যা করে হযরত হামযার হত্যার কাফ্‌ফারা আদায় করবেন। তিনি সফল হলেন। এভাবে আল্লাহতাআলা তাঁকে দিয়ে ইসলামের যতটুকু ক্ষতি করেন তার চেয়ে বেশী উপকার সাধন করেন।

হযরত হামযার মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর তখনকার অনুভূতি তিনি কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। সীরাতে ইবনে হিশামে "হামযার ইসলাম গ্রহণ" অধ্যায়ের টীকায় তার কিছু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে।

আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)

নাম আবুল ফজল আব্বাস। পিতা আবদুল মুত্তালিব, মাতা নাতিলা, মতান্তরে নাসিলা বিনতু খাব্‌বাব। রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা। তবে দু'জন ছিলেন প্রায় সমবয়সী। ঐতিহাসিকদের ধারণা, সম্ভবতঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দুই বা তিন বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ছোট বেলায় একবার তিনি হারিয়ে যান। মা মান্নত মানেন, আব্বাস ফিরে এলে কা'বায় রেশমী গিলাফ চড়াবেন। কিছু দিন পর তিনি সহি-সালামতে ফিরে এলে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে আবদুল মুত্তালিব তাঁর মান্নত পুরা করেন।

জাহিলী যুগে তিনি ছিলেন কুরাইশদের একজন প্রতাপশালী রঈস। পুরুষানুক্রমে খানায়ে কা'বার রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব লাভ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভ করলেন। মক্কায় প্রকাশ্যে তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিতে লাগলেন। হযরত আব্বাস যদিও দীর্ঘ দিন যাবত প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবে তিনি এ দাওয়াতের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ কারণে মদীনার বাহাত্তর জন আনসার হজ্জের মওসুমে মক্কায় গিয়ে মিনার এক গোপন শিবিরে যে দিন রাসূলুল্লাহকে (সা) মদীনায় হিজরাতের আহ্বান জানান এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন, সেই গোপন বৈঠকেও হযরত আব্বাস উপস্থিত ছিলেন। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। ইতিহাসে এই বাইয়াতকে আকাবার দ্বিতীয় শপথ বলা হয়। এ উপলক্ষে তিনি উপস্থিত মদীনাবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন ঃ 'খাযরাজ কাওমের লোকেরা! আপনাদের জানা আছে, মুহাম্মাদ (সা) স্বীয় গোত্রের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার সাথেই আছেন। শত্রুর মুকাবিলায় সর্বক্ষণ আমরা তাঁকে হিফাজত করেছি। এখন তিনি আপনাদের নিকট যেতে চান। যদি আপনারা জীবন পণ করে তাঁকে সহায়তা করতে পারেন তাহলে খুবই ভালো কথা। অন্যথায় এখনই সাফ সাফ বলে দিন।' জবাবে মদীনাবাসীগণ পরিপূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দান করেন। এর অল্পকাল পরেই রাসূলুল্লাহ মদীনায় হিজরাত করেন।

মক্কার কুরাইশদের চাপের মুখে বাধ্য হয়ে তিনি কুরাইশ বাহিনীর সংগে বদর যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) অবহিত ছিলেন, এ কারণে তিনি সাহাবীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'যুদ্ধের সময় আব্বাস বা বনু হাশিমের কেউ সামনে পড়ে গেলে তাদের হত্যা করবে না। কারণ, জোরপূর্বক তাদের রণক্ষেত্রে আনা হয়েছে।'

বদর যুদ্ধে অন্যান্য কুরাইশ মুশরিকদের সাথে আব্বাস, আকীল ও নাওফিল ইবন হারিস মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। ঘটনাক্রমে, আব্বাসকে এত শক্তভাবে বাঁধা হয় যে, ব্যথায় তিনি কঁকাতে থাকেন। তাঁর সে কঁকানি রাসূলুল্লাহর (সা) রাতের আরামে বিঘ্ন ঘটায়। একথা সাহাবায়ে কিরাম অবগত হলে তাঁরা আব্বাসের বাঁধন ঢিলা করে দেন। আব্বাস কঁকানি বন্ধ করে দিলেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কঁকানি শোনা

বললেন, 'আব্বাস, তীরন্দাজদের আওয়ায দাও।' স্বভাবগতভাবেই আমি ছিলাম উচ্চকণ্ঠ। আহ্বান জানালাম ঃ আইনা আসহাবুস সুমরা'— তীরন্দাজরা কোথায়? আমার এই আওয়াযে মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। তায়েফ অবরোধ, তাবুক অভিযান এবং বিদায় হজ্জেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন।

বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পর রাসূল (সা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিন দিন অসুস্থতা বাড়তে থাকে। হযরত আলী, হযরত আব্বাস ও বনী হাশিমের অন্য লোকেরা রাসূলুল্লাহর (সা) সেবার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ওফাতের দিন হযরত আলী বাড়ীর বাইরে এলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থা কেমন? যেহেতু সে দিন অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল, এ কারণে তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর অনুগ্রহে একটু ভালো।' কিন্তু হযরত আব্বাস ছিলেন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি আলীর একটি হাত ধরে বল্লেন ঃ 'তুমি কী মনে করেছো? আল্লাহর কসম, তিন দিন পরেই তোমরা গোলামী করতে শুরু করবে। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি এ রোগেই অল্প দিনের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করবেন। আমি আবদুল মুত্তালিব খান্দানের লোকদের চেহারা দেখেই তাদের মৃত্যু আন্দাজ করতে পারি।'

ঐ দিন রাসূল (সা) ইনতিকাল করেন। হযরত আলী ও বনী হাশিমের অন্যান্যদের সহযোগিতায় হযরত আব্বাস কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেন। যেহেতু তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মানিত চাচা এবং বনী হাশিমের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, এ কারণে বহিরাগত লোকেরা তাঁর নিকট এসে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করতে থাকে।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) চাচা আব্বাসকে খুব সম্মান করতেন। তাঁর সামান্য কষ্টতেও তিনি দারুণ দুঃখ পেতেন। একবার কুরাইশদের একটি আচরণ সম্পর্কে হযরত আব্বাস অভিযোগ করলে রাসূল (সা) অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ 'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের জন্য আপনাদের ভালবাসেনা তার অন্তরে ঈমানের নূর থাকবে না।'

একবার রাসূল (সা) এক বৈঠকে আবু বকর ও উমারের (রা) সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় আব্বাস উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) তাঁকে নিজের ও আবু বকরের মাঝখানে বসালেন এবং কণ্ঠস্বর একটু নীচু করে কথা বলতে লাগলেন। আব্বাস চলে যাওয়ার পর আবু বকর (রা) এমনটি করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (সা) বলেন ঃ 'মর্যাদাবান ব্যক্তিই পারে মর্যাদাবান ব্যক্তির মর্যাদা দিতে।' তিনি আরো বলেন ঃ 'জিবরীল আমাকে বলেছেন, আব্বাস উপস্থিত হলে আমি যেন আমার স্বর নিচু করি, যেমন আমার সামনে তোমাদের স্বর নিচু করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন।'

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীন হযরত আব্বাসের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। হযরত উমার ও হযরত উসমান (রা) ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁর সম্মানার্থে ঘোড়া থেকে নেমে পড়তেন এবং বলতেন ঃ 'ইনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা।' হযরত আবু বকর (রা) একমাত্র আব্বাসকেই নিজের আসন থেকে সরে গিয়ে স্থান করে দিতেন।

হযরত আব্বাস ৩২ হিজরীর রজব/মুহাররম মাসের ১২ তারিখ ৮৮ (অষ্টাশি) বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা) জানাযার নামায পড়ান এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) কবরে নেমে তাঁকে সমাহিত করেন। মদীনার বাকী গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ৩২ বছর এবং জাহিলী যুগে ৫৬ বছর জীবন লাভ করেন।

জাহিলী যুগে হযরত আব্বাস (রা) অত্যন্ত সম্পদশালী ছিলেন। এ কারণে বদর যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) তাঁর নিকট থেকে মুক্তিপণ স্বরূপ বিশ উকিয়া স্বর্ণ গ্রহণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল তাঁর জীবিকার উৎস। সুদের কারবারও করতেন। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এ কারবার চালু ছিল। দশম হিজরীর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূল (সা) বলেন ঃ 'আজ থেকে আরবের সকল প্রকার সুদী কারবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো এবং সর্বপ্রথম আমি আব্বাস ইবন আবদিল মুত্তালিবের সুদী কারবার রহিত ঘোষণা করছি।'

সুদের কারবার বন্ধ হওয়ার পর রাসূল (সা) গণীমতের এক পঞ্চমাংশ ও ফিদাক বাগিচার আমদানী থেকে তাঁকে সাহায্য করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর তিনি ও হযরত ফাতিমা প্রথম খলীফার নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) উত্তরাধিকার দাবী করেন। নবীরা কোন উত্তরাধিকার রেখে যান না— এ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহর (সা) একটি বাণী হযরত আবু বকরের (রা) মুখ থেকে শোনার পর তাঁরা নীরব হয়ে যান।

হযরত আব্বাস ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। অতিথি পরায়ণ ও দয়ালু। হযরত সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ 'আব্বাস হলেন আল্লাহর রাসূলের চাচা, কুরাইশদের মধ্যে সর্বাধিক দরাজ হস্ত এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি অধিক মনোযোগী'। তিনি ছিলেন কোমল অন্তর বিশিষ্ট। দুআর জন্য হাত উঠালেই চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা বয়ে যেত। এ কারণে তাঁর দুআয় এক বিশেষ আছর পরিলক্ষিত হতো।'

রাসূলুল্লাহ (সা) আব্বাস (রা) ও তাঁর সন্তানদের জন্য দুআ করেছেন। তিনি তাঁদের সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অপরাধের মাগফিরাত কামনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে বহু সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আব্বাসের মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। হুনাইন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তিনি একটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। তার কয়েকটি পংক্তি *'আল-ইসতিয়াব'* ও ইবন ইসহাকের সীরাত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।

বিলাল ইবন রাবাহ (রা)

আবু আবদুল্লাহ বিলাল তাঁর নাম। পিতা রাবাহ এবং মাতা হামামাহ। হাবশী বংশোদ্ভূত ক্রীতদাস। তবে মক্কায় জন্মলাভ করেছিলেন। বনু জুমাহ ছিল তাদের মনিব।

হাবশী দাস হিসাবে তাঁর বাহ্যিক রং কালো হলেও অন্তর ছিল দারুণ স্বচ্ছ। আরবের গৌরবর্ণের লোকেরা যখন আভিজাত্যের ও কৌলিণ্যের বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে হকের দাওয়াত অস্বীকার করে চলেছিল, তখনই তাঁর অন্তর ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। অল্প কিছু লোক দাওয়াতে হক কবুল করলেও যে সাত ব্যক্তি প্রকাশ্য ঘোষণার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এ হাবশী গোলাম অন্যতম।

চিরকালই দুর্বলরা অত্যাচার উৎপীড়নের শিকার হয়ে থাকে। বিলালের সামাজিক অবস্থানের কারণে তাঁর ওপর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে। শাস্তি ও যন্ত্রণার নানা রকম অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁর সবর ও ইসতিকলালের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। গলায় উত্তপ্ত বালু, পাথরকুচি ও জ্বলন্ত অংগারের ওপর তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, গলায় রশি বেঁধে ছাগলের মত শিশুরা মক্কার অলিতে গলিতে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে। তবুও তাওহীদের শক্ত রশি তিনি হাত ছাড়া করেননি। আবু জাহল তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে পিঠের ওপর পাথরের বড় চাক্কি রেখে দিত। মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপে তিনি যখন অস্থির হয়ে পড়তেন, আবু জাহল বলতো ঃ 'বিলাল, এখনো মুহাম্মাদের আল্লাহ থেকে ফিরে এসো।' কিন্তু তখনো তার পবিত্র মুখ থেকে 'আহাদ' 'আহাদ' ধ্বনি বের হতো।

অত্যাচারী মুশরিকদের মধ্যে উমাইয়্যা ইবন খালাফ ছিল সর্বাধিক উৎসাহী। সে শাস্তি ও যন্ত্রণার নিত্য নতুন কলা-কৌশল প্রয়োগ করতো। নানা রকম পদ্ধতিতে সে তাঁকে কষ্ট দিত। কখনো গরুর কাঁচা চামড়ায় তাঁকে ভরে, কখনো লোহার বর্ম পরিয়ে উত্তপ্ত রোদে বসিয়ে দিয়ে বলতো ঃ 'তোমার আল্লাহ লাত ও উয্যাহ' কিন্তু তখনো এ তাওহীদ প্রেমিক লোকটির যবান থেকে 'আহাদ' 'আহাদ' ছাড়া আর কোন বাক্য বের হতো না। মুশরিকরা বলতো, তুমি আমাদের কথিত শব্দগুলিই উচ্চারণ করো। তিনি বলতেন ঃ 'আমার যবান ঠিক মত তোমাদের শব্দগুলি উচ্চারণ করতে পারে না।'

প্রতিদিনের মত সেদিনও হযরত বিলালের ওপর 'বাতহা' উপত্যকায় অত্যাচারের স্টীম রোলার চলছিল। ঘটনাক্রমে হযরত আবু বকর সিদ্দীকও সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দারুণ মর্মাহত হলেন। মোটা অংকের অর্থ বিলালের মনিবকে দিয়ে তিনি তাঁকে আযাদ করে দেন। এ খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আবু বকর, আমাকেও তুমি এ কাজে শরীক করে নাও। তিনি আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি তো তাঁকে আযাদ করেই দিয়েছি।'

মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় তিনি হযরত সা'দ ইবন খুসাইমার (রা) অতিথি হলেন। হযরত আবু রুওয়াইহা আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান খাসয়ামীর (রা) সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপিত হলো। তাঁদের দু'জনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়

খলীফা হযরত উমার ফারুকের সময়ে হযরত বিলাল সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। খলীফা উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ বিলাল, তোমার ভাতা কে উঠাবে? জবাব দিলেন ঃ 'আবু রুওয়াইহা। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের দু'জনের যে ভ্রাতৃসম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন তা কখনো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।'

হিজরাতের আগ পর্যন্ত মক্কায় ইসলাম ছিল দুর্বল, হিজরাতের পর মদীনায় তা সবল হয়ে দাঁড়ায়। এই মাদানী জীবনের সূচনা থেকেই ইসলামী আচার-আচরণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মূল ভিত্তির স্থাপনা শুরু হয়। মসজিদ প্রতিষ্ঠা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং নামাযের জন্য আযানের প্রচলন হলো। হযরত বিলাল প্রথম ব্যক্তি, আযানের দায়িত্ব যাঁর ওপর অর্পিত হয়। বিলালের উচ্চ ও হৃদয়গ্রাহী আযান ধ্বনি শুনে নারী পুরুষ, কিশোর যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কেউ ঘরে স্থির থাকতে পারতো না। মসজিদে তাওহীদের ধারক-বাহকদের ভীড় জমে উঠলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দরজায় গিয়ে আওয়ায দিতেন ঃ 'হাইয়ালাস সালাহ, হাইয়ালাল ফালাহ, আস্‌সালাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ— হে আল্লাহর রাসূল! নামায উপস্থিত।' রাসূল (সা) বেরিয়ে আসতেন, বিলাল তাকবীর দিতেন। কোনদিন হযরত বিলাল মদীনায় উপস্থিত না থাকলে হযরত আবু মাহযুরা এবং হযরত 'আমর ইবন উম্মে মাকতুম (রা) তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। বিলাল (রা) সাধারণতঃ সুবহে সাদিক হওয়ার আগেই ফজরের আযান দিতেন। এ কারণে সকালে দু'বার আযান দেওয়া হতো। শেষের আযান দিতেন হযরত 'আমর ইবন উম্মে মাকতুম (রা)। এ জন্য রমজান মাসে হযরত বিলালের আযানের পর পানাহার জায়েয ছিল।

রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় অবস্থান বা সফরের সময়, উভয় অবস্থায় বিলাল ছিলেন তাঁর বিশেষ মুয়াজ্জিন। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) কোন এক সফরে পথ চলতে চলতে রাত হয়ে গেল। সাহাবাদের কেউ কেউ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এখানে কোথাও রাত্রি যাপনের জন্য তাঁবু গাড়ার হুকুম দিলে ভালো হতো। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আমার ভয় হচ্ছে ঘুম তোমাদের নামায থেকে উদাসীন করে না দেয়।' হযরত বিলাল সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব নিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি পেয়ে সবাই তাঁবু গেড়ে বিশ্রামে গা এলিয়ে দিলেন। এদিকে বিলাল (রা) অধিক সতর্কতার সাথে হাওদার কাঠের সাথে হেলান দিয়ে সুবহে সাদিকের প্রতীক্ষায় থাকলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে এ অবস্থায় তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে এলো এবং গভীর ঘুমে এমন অচেতন হয়ে পড়লেন যে সূর্যোদয়ের আগে আর চেতনা ফিরে এলো না। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুম থেকে জেগে সর্বপ্রথম বিলালকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার দায়িত্ব পালনের কি হলো? বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজ আমি এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে, এমনটি আমার সাধারণতঃ হয় না। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আল্লাহ যখন ইচ্ছা তোমাদের রূহ অধিকার করে নেন, আবার যখন ইচ্ছা তা ফিরিয়ে দেন। উঠে আযান দাও এবং লোকদের নামাযের জন্য সমবেত কর।'

হযরত বিলাল (রা) প্রধান প্রধান সকল যুদ্ধেই শরীক ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি ইসলামের এক মস্তবড় দুশমন উমাইয়্যা ইবন খালাফকে হত্যা করেন। মক্কায় যাঁরা বিলালের ওপর নির্যাতন চালাতো, এ উমাইয়্যা ছিল তাদের অন্যতম। মক্কা বিজয়ের

দিনে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সংগী ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তিনিও কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে কা'বার ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি আযান ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর হযরত বিলাল (রা) তাঁর প্রতি সর্বাধিক ইহসানকারী ব্যক্তি হযরত সিদ্দীকে আকবরের (রা) নিকট আরজ করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি কি আমাকে আযাদ করেছেন আল্লাহর ওয়াস্তে না আপনার সংগী বানানোর উদ্দেশ্যে? তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর ওয়াস্তে।' বিলাল বললেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে শুনেছি, মুমিনের উত্তম কাজ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এ কারণে আমি চাই, এই মহান কাজটিকে আমরণ আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করতে।' হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ 'বিলাল, তুমি আমার থেকে দূরে চলে গিয়ে বিচ্ছেদ বেদনায় আমাকে কাতর করে তুলো না।' হযরত আবু বকরের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁর জীবদ্দশায় বিলাল কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

হযরত আবু বকরের পর খলীফা হযরত 'উমার। বিলাল তাঁর কাছেও অনুমতি চাইলেন জিহাদে অংশগ্রহণের। প্রথম খলীফার মত দ্বিতীয় খলীফাও তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর অত্যধিক উৎসাহ ও অনমনীয় মনোভাব দেখে খলীফা উমার তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তিনি সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করলেন। ১৬ হিজরী সনে হযরত উমারের সিরিয়া সফরকালে অন্যান্য সামরিক অফিসারদের সাথে বিলালও 'জাবিয়া' নামক স্থানে খলীফাকে স্বাগত জানান এবং 'বাইতুল মুকাদ্দাস' সফরে তিনি খলীফার সংগী হন। সফরের এক পর্যায়ে একদিন খলীফা বিলালকে অনুরোধ করলেন আযান দেওয়ার জন্য। বিলাল বললেন ঃ 'যদিও আমি অঙ্গীকার করেছি, রাসূলুল্লাহর (সা) পর আর কারো জন্য আযান দিব না, তবে আজ আপনার ইচ্ছা পূরণ করবো।' এ কথা বলে তিনি এমন হৃদয়গ্রাহী আওয়াযে আযান দিলেন যে উপস্থিত জনতার মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিল। হযরত 'উমার এত কাঁদলেন যে তাঁর বাক রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু 'উবাইদা ও হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) কান্নায় ভেংগে পড়েছিলেন। সবারই মনে তখন নবী-যুগের ছবি ভেসে উঠছিল, অন্তরে তখন এক বিশেষ অনুভূতি জেগে উঠেছিল।

সিরিয়ার সবুজ ও শস্য-শ্যামল ভূমি হযরত বিলালের খুবই মনঃপুত হয়। তিনি দ্বিতীয় খলীফার নিকট তাঁর ইসলামী ভাই আবু রুওয়াইহাসহ তাঁকে সিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দানের জন্য আবেদন জানান। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হলো। তাঁরা দু'জন 'খাওলান' নামক ছোট একটি শহরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের পূর্বেই এ শহরে বসতি স্থাপন করেছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু দারদা আনসারীর (রা) গোত্র। এখানে তাঁরা দু'জন এ গোত্রের দু'টি মেয়েকে বিয়ে করে তাদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন।

দীর্ঘদিন যাবত হযরত বিলাল (রা) সিরিয়ায় বসবাস করতে থাকেন। একদিন স্বপ্নে দেখলেন ঃ রাসূল (সা) বলছেন ঃ 'বিলাল, এমন নিরস জীবন আর কতকাল? আমার যিয়ারতের সময় কি তোমার এখনো হয়নি?' এ স্বপ্ন তাঁর প্রেম ও ভালোবাসার ক্ষত

আবার তাজা করে দিল। তখুনি তিনি মদীনা রওয়ানা হলেন এবং পবিত্র রওজা মুবারকে হাজির হয়ে জবাই করা মোরগের মত ছটফট করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) কলিজার টুকরা হযরত হাসান ও হুসাইনকে (রা) জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকেন। তাঁরা দু'জন সে দিন সকালে ফজরের আযান দেওয়ার জন্য হযরত বিলালকে (রা) অনুরোধ করেন। তাঁদের অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। সুবহে সাদিকের সময় মসজিদে নববীর ছাদে দাঁড়িয়ে তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলছিলেন, আর সে ধ্বনি মদীনার অলিতে গলিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল। তাঁর সে আযান ধ্বনি শুনে মদীনার জনগণ তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলছিল।

তিনি যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বললেন, তখন মদীনার নারী-পুরুষ সকলেই অস্থিরভাবে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে দৌড়াতে শুরু করেন। বর্ণিত আছে, এমন ভাব-বিহ্বল দৃশ্য মদীনায় আর কখনো দেখা যায়নি।

এ নিষ্ঠাবান রাসূলপ্রেমিক হিজরী ২০ সনে প্রায় ষাট বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। দিমাশকের 'বাবুস সাগীরের' কাছেই তাঁকে দাফন করা হয়।

চারিত্রিক সৌন্দর্য হযরত বিলালের (রা) মর্যাদা ও সম্মানকে অত্যধিক বাড়িয়ে দিয়েছিল। হযরত উমার বলতেন ঃ 'আবু বকর আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের নেতা বিলালকে আযাদ করেছেন।'

হযরত রাসূলে পাকের সাহচর্য ও সেবাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) আশেপাশে উপস্থিত থাকতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সফর সংগী হতেন। ঈদ ও ইসতিসকার নামাযের সময় বল্লম হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) আগে আগে ময়দানে যেতেন। ওয়াজ নসীহতের মজলিসেও উপস্থিত থাকতেন। শত প্রয়োজন ও দারিদ্র থাকা সত্ত্বেও হাতে কিছু এলেই তার একাংশ রাসূলকে (সা) উপঢৌকন পাঠাতেন। একবার উৎকৃষ্ট মানের কিছু খেজুর রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে আসেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'বিলাল, এগুলি কোথায় পেলে? জবাব দিলেন ঃ আমার কাছে কিছু নিম্নমানের খেজুর ছিল। যেহেতু আপনার খিদমতে কিছু পাঠানোর ইচ্ছা ছিল, এ জন্যই দু' সা'য়ের বিনিময়ে এর এক সা' খেজুর লাভ করেছি। রাসূল (সা) বললেন ঃ হায়, হায়, এমন করোনা। এ তো এক ধরনের সুদ। যদি তোমাকে খরীদ করতেই হতো, তাহলে প্রথমে তোমার খেজুরগুলি বিক্রি করে দিতে এবং সেই অর্থ দিয়ে এগুলি খরীদ করতে।

মক্কায় যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন হযরত বিলাল সহ্য করেছিলেন, তাদ্বারাই তাঁর সহ্যশক্তি, ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। কেউ তাঁর কোন গুণের কথা বললে বলতেন ঃ 'আমি তো শুধু একজন হাবশী, কালপর্যন্তও যে দাস ছিল।' সততা, নিষ্কলুষতা ও বিশ্বস্ততা ছিলো তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

হযরত বিলাল যেহেতু রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ মুয়ায্যিন ছিলেন এ কারণে অধিকাংশ সময় মসজিদেই কাটাতে হতো। রাত দিনের বেশী সময় ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। একবার রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কোন্ ভালো কাজটির

জন্য সবচেয়ে বেশী সাওয়াবের আশা করো? বললেন ঃ 'আমি তো এমন কোন ভালো কাজ করিনি। তবে প্রত্যেক অজুর পরে নামায আদায় করেছি।'

সম্ভ্রান্ত আরব পরিবারে তিনি একাধিক বিয়ে করেছিলেন। হযরত আবু বকরের কন্যার সাথে রাসূল (সা) নিজে বিয়ে দিয়েছিলেন। বনু যুহরা ও আবু দারদার পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু কোন পক্ষেই তাঁর কোন সন্তান জন্ম লাভ করেনি।

সহীহ *ইবন খুযাইমা* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, একদিন রাসূল (সা) বিলালকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বিলাল, কিসের বদৌলতে তুমি আমার আগেই জান্নাতে পৌছে গেলে? গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে তোমার 'খশ্‌খশা' আওয়ায শুনতে পেলাম।' বিলাল বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কোন গুনাহ করলেই দু'রাকায়াত নামায আদায় করি। আর অজু চলে গেলে তখনি আবার অজু করে আমি দু'রাকায়াত নামায আদায় করে থাকি।'

জা'ফর ইবন আবী তালিব (রা)

আবু আবদিল্লাহ জা'ফর নাম, পিতা আবু তালিব এবং মাতা ফাতিমা। কুরাইশ গোত্রের হাশেমী শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাত ভাই এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সহোদর। বয়সে আলী (রা) থেকে দশ বছর বড়।

বনী আবদে মান্নাফের পাঁচ ব্যক্তির চেহারা রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারার সাথে এত বেশী মিল ছিল যে প্রায়শঃ ক্ষীণ দৃষ্টির লোকেরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলতো। সে পাঁচ ব্যক্তি হলেন ঃ ১। আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইবন আবদিল মুত্তালিব। তিনি একাধারে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই এবং দুধ ভাইও। ২। কুসাম ইবনুল আব্বাস ইবন মুত্তালিব। তিনিও রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই। ৩। আস-সায়িব ইবন 'উবায়িদ ইবন আবদে ইয়াযিদ ইবন হাশিম। তিনি ছিলেন ইমাম শাফেয়ীর (রহঃ) পিতামহ। ৪। হাসান ইবন আলী— রাসূলুল্লাহর (সা) দৌহিত্র। রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারার সাথে তাঁর চেহারার সাদৃশ্য ছিল সর্বাধিক। ৫ম ব্যক্তি হলেন জা'ফর ইবন আবী তালিব।

কুরাইশদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অধিক সন্তান-সন্ততি ও পোষ্যের কারণে আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা ছিল দারুণ অসচ্ছল। মরার ওপর খাড়ার ঘা'র মত সেই অনাবৃষ্টির বছরটি তাঁর অসচ্ছল অবস্থাকে আরও নিদারুণ করে তোলে। সেই মারাত্মক খরার বছরে কুরাইশদের সব ফসল পুড়ে যায়, গবাদি পশুও ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে একটা হাহাকার পড়ে যায়। এ সময় বনী হাশিমের মধ্যে মুহাম্মদ বিন আবদিল্লাহ এবং তাঁর চাচা আব্বাস অপেক্ষা অধিকতর সচ্ছল ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না।

একদিন মুহাম্মাদ (সা) চাচা আব্বাসকে বললেন ঃ 'চাচা, আপনার ভাই আবু তালিবের তো অনেক সন্তানাদি। মানুষ এ সময় দারুণ দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টের মধ্যে আছে। চলুন না আমরা তাঁর কাছে যাই এবং তাঁর কিছু সন্তানের বোঝা আমাদের কাঁধে তুলে নেই। তাঁর একটি ছেলেকে আমি নেব এবং অপর একটিকে আপনি নেবেন।'

আব্বাস মন্তব্য করলেন ঃ তুমি সত্যিই একটি কল্যাণের দিকে আহ্বান জানিয়েছ এবং একটি ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছ।'

অতঃপর তাঁরা দু'জন আবু তালিবের নিকট গেলেন। বললেন, 'আমরা এসেছি আপনার পরিবারের কিছু বোঝা লাঘব করতে, যাতে মানুষ যে দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়েছে তা থেকে আপনি কিছুটা মুক্তি পান।'

আবু তালিব বললেন, 'আমার জন্য আকীলকে (আকীল ইবন আবী তালিব) রেখে তোমরা যা খুশী তাই করতে পার।' অতঃপর মুহাম্মাদ (সা) নিলেন আলীকে এবং আব্বাস জা'ফরকে।

আলী প্রতিপালিত হতে লাগলেন মুহাম্মাদের (সা) তত্ত্বাবধানে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদকে (সা) নবুওয়াত দান করেন এবং যুবকদের মধ্যে আলীই তাঁর ওপর

প্রথম ঈমান আনার সৌভাগ্য অর্জন করেন। অন্যদিকে জা'ফর তাঁর চাচা আব্বাসের নিকট প্রতিপালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে স্বনির্ভর হন।

জা'ফর ইবন আবী তালিব ও তাঁর সহধর্মিনী আসমা বিনতু 'উমাইস ইসলামী নূরের কাফিলার যাত্রাপথেই তাতে যোগদান করেন। তাঁরা দু'জনই হযরত সিদ্দীকে আকবরের হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) 'দারুল আরকামে' প্রবেশের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ('দারুল আরকাম' মক্কার একটি গৃহ। দারুল ইসলাম নামেও প্রসিদ্ধ। গৃহটি আরকাম ইবন আবদে মান্নাফ আল মাখযুমীর। মক্কায় রাসূল সা. এ বাড়ী থেকে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।) একদিন আবু তালিব দেখতে পেলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে দাঁড়িয়ে আলী নামায আদায় করছেন। এ দৃশ্য আবু তালিবের খুবই ভালো লাগলো। পাশেই দাঁড়ানো জা'ফরের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন ঃ জা'ফর, তুমিও তোমার চাচাতো ভাই মুহাম্মাদের (সা) একপাশে দাঁড়িয়ে যাও। জা'ফর রাসূলুল্লাহর (সা) বাম দিকে দাঁড়িয়ে সেদিন নামায আদায় করেন। এ ঘটনা জা'ফরের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এর অল্পকিছু দিনের মধ্যেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বে মাত্র ৩১/৩২ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথম যুগের মুসলমানরা যেসব দৈহিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করেছিল তার সবই এ হাশেমী যুবক ও তাঁর যুবতী স্ত্রী ভোগ করেছিলেন। কিন্তু কখনও তাঁরা ধৈর্যহারা হননি। তাঁরা জানতেন, জান্নাতের পথ বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ। তবে যে বিষয়টি তাঁদের অন্যান্য দ্বীনী ভাইদের মত তাঁদেরকেও পীড়া দিত এবং ভাবিয়ে তুলতো তা হল, ইসলামী অনুশাসনগুলি পালনে এবং এক আল্লাহর ইবাদাতে কুরাইশদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুরাইশরা তাঁদের জন্য ওঁৎ পেতে থেকে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ গড়ে তুলতো।

এমনি এক মুহূর্তে জা'ফর ইবন আবী তালিব, তাঁর স্ত্রী এবং আরও কিছু সাহাবা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাবশায় হিজরাতের অনুমতি চাইলেন। অত্যন্ত বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি তাদের অনুমতি দিলেন। ব্যাপারটি তাঁর কাছে এত কষ্টদায়ক ছিল এ জন্য যে, এসব সৎ ও পবিত্র-আত্মা লোক তাদের প্রিয় জন্মভূমি-শৈশব কৈশোর ও যৌবনের চারণভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তাছাড়া অন্য কোন অপরাধে তারা অপরাধী নয়। তারা দেশত্যাগ করছে, তাদের ওপর যুল্ম, উৎপীড়ন চলছে আর তিনি নিতান্ত অসহায়ভাবে তা তাকিয়ে দেখছেন।

মুহাজিরদের প্রথম দলটি জা'ফর ইবন আবী তালিবের নেতৃত্বে হাবশায় উপনীত হলেন। সেখানে তাঁরা সৎ ন্যায়নিষ্ঠ নাজ্জাশীর দরবারে আশ্রয় লাভ করলেন। ইসলাম গ্রহণের পর এই প্রথমবারের মত তাঁরা একটু নিরাপত্তার স্বাদ এবং নিঃশঙ্কচিত্তে স্বাধীনভাবে এক আল্লাহর ইবাদতের মাধুর্য অনুভব করলেন।

মুসলমানদের এ দলটির হাবশায় হিজরাত এবং সেখানে বাদশার দরবারে আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভের ব্যাপারে কুরাইশরা অবহিত ছিল। তারা তাদেরকে হত্যা অথবা ফিরিয়ে আনার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করল। এই ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হযরত উম্মু

সালামা (রা) বলেন ঃ "আমরা যখন হাবশায় পৌঁছলাম, সেখানে সৎ প্রতিবেশী এবং আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলাম। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের ব্যাপারে আমরা কোন প্রকার যুল্‌ম-অত্যাচারের সম্মুখীন হলাম না অথবা আমাদের অপছন্দনীয় কোন কথাও আমরা শুনলাম না। এ কথা কুরাইশরা জানতে পেরে ষড়যন্ত্র শুরু করল। তারা তাদের মধ্য থেকে শক্তিমান ও তাগড়া জোয়ান দু'ব্যক্তিকে নির্বাচন করে নাজ্জাশীর কাছে পাঠাল। এ দু'ব্যক্তি হল, আমর ইবনুল 'আস ও আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবীয়া। তারা তাদের দু'জনের সংগে নাজ্জাশী ও তার দরবারের চাটুকার পাদ্রীদের জন্য প্রচুর মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাল। তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল, হাবশার রাজার সাথে আমাদের বিষয়টি আলোচনার পূর্বেই প্রত্যেক পাদ্রীর জন্য নির্ধারিত হাদিয়া তাদের কাছে পৌঁছে দেবে।

তারা দু'জন হাবশা পৌঁছে নাজ্জাশীর পাদ্রীদের সাথে মিলিত হল এবং তাদের প্রত্যেককে তার জন্য নির্ধারিত উপঢৌকন পৌঁছে দিয়ে বলল, "বাদশাহর সাম্রাজ্যে আমাদের কিছু বিভ্রান্ত সন্তান আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করেছে। আমরা যখন তাদের সম্পর্কে বাদশাহর সংগে কথা বলবো, আপনারা তাদের দ্বীন সম্পর্কে কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই তাদেরকে আমাদের নিকট ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে বাদশাহকে একটু অনুরোধ করবেন। কারণ, তাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দইতো তাদের বিশ্বাস ও আচরণ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তারাই তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন।"

দরবারী পাদ্রীরা তাদের কথায় সায় দিল।

উম্মু সালামা বলেন, 'বাদশাহ আমাদের কাউকে ডেকে তার কথা শুনুক, এর চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু 'আমর ইবনুল আস ও তার সংগীর নিকট ছিলনা।'

তারা দু'জন নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে উপঢৌকন পেশ করল। উপঢৌকনগুলি নাজ্জাশীর খুবই পছন্দ হল। তিনি সেগুলির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অতঃপর তারা বাদশাহকে বলল ঃ "মহামান্য বাদশাহ, আমাদের কিছু দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে আপনার সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছে। তারা এমন একটি ধর্ম আবিষ্কার করেছে যা আমরাও জানিনে এবং আপনিও জানেন না। তারা আমাদের দ্বীন পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু আপনাদের দ্বীনও গ্রহণ করেনি। তাদের পিতা, পিতৃব্য ও গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তাদের সৃষ্ট অশান্তি ও বিপর্যয় সম্পর্কে তাদের গোত্রীয় নেতারাই অধিক জ্ঞাত।"

নাজ্জাশী তাঁর দরবারে উপস্থিত পাদ্রীদের দিকে তাকালেন। তারা বলল ঃ 'মহামান্য বাদশাহ, তারা সত্য কথাই বলেছে। কারণ তাদের গোত্রীয় নেতারাই তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। গোত্রীয় নেতাদের নিকট আপনি তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিন, যাতে গোত্রীয় নেতারা তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।'

পাদ্রীদের কথায় বাদশাহ দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন ঃ "আল্লাহর কসম! তা হতে পারেনা। তাদের প্রতি যে অভিযোগ আরোপ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ না করা পর্যন্ত একজনকেও আমি সমর্পন করব না। সত্যিই তারা যদি এমনই হয় যেমন এ দু'ব্যক্তি বলছে, তাহলে তাদেরকে সমর্পণ করব। তা না হলে তারা

যতদিন আমার আশ্রয়ে থাকতে চায়, আমি তাদেরকে নিরাপত্তার সাথে থাকতে দেব।"

উম্মু সালাম বলেন ঃ "অতঃপর নাজ্জাশী আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য। যাওয়ার আগে আমরা সকলে একস্থানে সমবেত হলাম। আমরা অনুমান করলাম, নিশ্চয় বাদশাহ আমাদের নিকট আমাদের দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, যা আমরা বিশ্বাস করি তা প্রকাশ করে দেব। আর সবার পক্ষ থেকে জা'ফর ইবন আবী তালিব কথা বলবেন। অন্য কেউ কোন কথা বলবে না।"

উম্মু সালামা বলেন ঃ অতঃপর নাজ্জাশীর নিকট গিয়ে দেখতে পেলাম, তিনি তাঁর সকল পাদ্রীদের ডেকেছেন। তারা তাদের বিশেষ অভিজাত পোশাক পরে সাথে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ মেলে ধরে বাদশাহর ডান ও বাম দিকে বসে আছে। আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবীয়াকেও আমরা বাদশাহর নিকট দেখতে পেলাম। মজলিসে আমরা স্থির হয়ে বসার পর, নাজ্জাশী আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'সে কোন্ ধর্মমত– যা তোমরা নতুন আবিষ্কার করেছ এবং যার কারণে তোমরা তোমাদের খান্দানী ধর্মকেও পরিত্যাগ করেছ, অথচ আমার অথবা অন্যকোন ধর্মও গ্রহণ করনি?'

জা'ফর ইবন আবী তালিব সবার পক্ষ থেকে বললেন ঃ "মহামান্য বাদশাহ! আমরা ছিলাম একটি মূর্খ জাতি। মূর্তির উপাসনা করতাম, মৃত জন্তু ভক্ষণ করতাম, অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম, এবং প্রতিবেশীর সাথে অসদ্ব্যবহার করতাম। আমাদের সবলরা দুর্বলদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করত। আমরা ছিলাম এমনি এক অবস্থায়। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠালেন। আমরা তাঁর বংশ, সততা, আমানতদারী, পবিত্রতা ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানালেন, যেন আমরা তার একত্বে বিশ্বাস করি, তাঁর ইবাদত করি এবং আমরা ও আমাদের পূর্ব পুরুষরা যেসব গাছ, পাথর ও মূর্তির পূজা করতাম তা পরিত্যাগ করি।

তিনি আমাদের নির্দেশ দিলেন সত্য বলার, গচ্ছিত সম্পদ যথাযথ প্রত্যর্পণের, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখার, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার, হারাম কাজ ও অবৈধ রক্তপাত থেকে বিরত থাকার। তাছাড়া অশ্লীল কাজ, মিথ্যা বলা, ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া থেকে নিষেধ করলেন।

তিনি আমাদের আরও আদেশ করেছেন এক আল্লাহর ইবাদত করার, তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক না করার, নামায কায়েম করার, যাকাত দানের এবং রমযান মাসে রোযা রাখার।

আমরা তাঁকে সত্যবাদী জেনে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ করেছি। সুতরাং যা তিনি আমাদের জন্য হালাল এবং হারাম ঘোষণা করেছেন, আমরা তা হালাল ও হারাম বলে বিশ্বাস করেছি।

মহামান্য বাদশাহ! অতঃপর আমাদের জাতির সকলেই আমাদের ওপর বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল। তারা আমাদের দ্বীন থেকে পুনরায় মূর্তিপূজার দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য

আমাদের ওপর অত্যাচার চালাল। তারা যখন আমাদেরকে অত্যাচার উৎপীড়নে জর্জরিত করে তুলল এবং আমাদের ও আমাদের দ্বীনের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল, তখন আমরা অন্য কোথাও না গিয়ে আপনার এখানে আসাকেই প্রাধান্য দিলাম এই আশায় যে, আপনার এখানে আমরা অত্যাচারিত হব না।"

উম্মু সালামা বলেন ঃ অতঃপর নাজ্জাশী জা'ফর ইবন আবী তালিবের দিকে একটু তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের নবী আল্লাহর নিকট থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার কিছু অংশ কি তোমাদের সংগে আছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। 'আমাকে একটু পাঠ করে শুনাও তো।' জা'ফর পাঠ করলেন ঃ "কাফ্-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল গোপনে। সে বলেছিল, 'আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক সাদা হয়েছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনও ব্যর্থকাম হইনি।"

এভাবে তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা মরিয়মের প্রথম অংশ পাঠ করে শুনালেন।

আল্লাহর কালাম শুনে নাজ্জাশী এত কাঁদলেন যে অশ্রুধারায় তার শ্মশ্রু সিক্ত হয়ে গেল এবং দরবারে উপস্থিত পাদ্রীরা কেঁদে তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত ধর্মগ্রন্থসমূহ ভিজিয়ে দিল। কিছুটা শান্ত হয়ে নাজ্জাশী বললেন ঃ 'তোমাদের নবী যা নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর পূর্বে ঈসা (আ) যা নিয়ে এসেছিলেন উভয়ের উৎস এক। অতঃপর আমর ও তার সংগীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা চলে যাও। আল্লাহর কসম! তোমাদের হাতে আমি তাদেরকে সমর্পণ করব না।'

উম্মু সালামা বলেন ঃ আমরা নাজ্জাশীর দরবার থেকে বেরিয়ে এলে আমর ইবনুল আস আমাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে তার সংগীকে বলল, 'আল্লাহর কসম! আগামীকাল আবার আমরা বাদশাহর নিকট আসব এবং তাঁর নিকটে তাদের এমন সব কার্যকলাপ তুলে ধরব যাতে তাঁর হৃদয়ে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং তাদের প্রতি ঘৃণায় তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়। তাদেরকে সম্পূর্ণ উৎখাত করার জন্য আমরা অবশ্যই বাদশাহকে উৎসাহিত করব।'

একথা শুনে তার সংগী আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবীয়া বলল ঃ 'আমর, এমনটি করা উচিত হবে না। ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের বিরোধিত করলেও তারা তো আমাদের আত্মীয়।'

আমর বলল ঃ 'তুমি রাখ তো এসব কথা। আমি অবশ্যই বাদশাহকে এমন সব কথা অবহিত করব যা তাদের অন্তরকে কাঁপিয়ে তুলবে। বাদশাহকে আমি বলব ঃ তারা মনে করে ঈসা ইবন মরিয়ম অন্যদের মতই একজন বান্দা।'

পরদিন সত্যি সত্যিই আমর নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ 'মহামান্য বাদশাহ! এসব লোক, যাদেরকে আপনি আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করছেন, তারা ঈসা ইবন মরিয়ম সম্পর্কে একটা মারাত্মক কথা বলে থাকে। আপনি তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখুন তারা তাঁর সম্পর্কে কি বলে।'

উম্মু সালামা বলেন ঃ আমরা একথা জানতে পেয়ে ভীষণ দুঃশ্চিন্তায় পড়লাম। আমরা পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'বাদশাহ যখন ঈসা ইবন মরিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা তখন কি বলবে?' সবাই ঐকমত্যে পৌঁছলাম; তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ যা বলেছেন তার অতিরিক্ত আর কিছুই আমরা বলব না। আমাদের নবী তাঁর সম্পর্কে যা কিছু এনেছেন তা থেকে আমরা এক আংগুলের ডগা পরিমাণও বাড়িয়ে বলবনা। তাতে আমাদের ভাগ্যে যা থাকে তা-ই হবে। আমাদের পক্ষ থেকে এবারও জা'ফর ইবন আবী তালিব কথা বলবেন।

নাজ্জাশী আমাদের ডেকে পাঠালেন। আমরা তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম, পাদ্রীরা পূর্বের দিনের মত একই বেশভূষায় বসে আছে। আমর ইবনুল আস ও তার সংগী সেখানে উপস্থিত হতেই বাদশাহ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ঈসা ইবন মরিয়ম সম্পর্কে তোমরা কি বলে থাক?'

জা'ফর ইবন আবী তালিব বললেন ঃ 'আমাদের নবী তাঁর সম্পর্কে যা বলেন তার অতিরিক্ত আমরা কিছুই বলিনে।'

'তিনি কি বলে থাকেন?'

'তিনি বলেন ঃ তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি তার রূহ ও কালাম– যা তিনি কুমারী ও পবিত্র মরিয়মের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন।'

জা'ফরের কথা শুনে নাজ্জাশী হাত দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে করতে বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম! ঈসা ইবন মরিয়ম সম্পর্কে তোমাদের নবী যা বলেছেন তা একটি লোম পরিমাণও অতিরঞ্জন নয়।' একথা শুনে নাজ্জাশীর আশেপাশে উপবিষ্ট পেট্রিয়ার্করা তাদের নাসিকা-ছিদ্র দিয়ে ঘৃণাসূচক শব্দ বের করল। বাদশাহ বললেন ঃ 'তা তোমরা যতই ঘৃণা কর না কেন।' তারপর তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ যাও, তোমরা স্বাধীন ও নিরাপদ। কেউ তোমাদের গালি দিলে বা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তার বদলা নেওয়া হবে। আল্লাহর কসম! আমি সোনার পাহাড় লাভ করি, আর তার বিনিময়ে তোমাদের কারও ওপর সামান্য বিপদ আপতিত হোক– এটাও আমার পছন্দনীয় নয়। এরপর তিনি আমর ও তার সংগীর দিকে ফিরে বললেন ঃ 'এ দু'ব্যক্তির উপঢৌকন তাদেরকে ফেরত দাও। আমার সেগুলি প্রয়োজন নেই।'

উম্মু সালামা বলেন ঃ এভাবে আমর ও তাঁর সংগীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল এবং তারা ভগ্ন হৃদয়ে পরাজিত ও হতাশ অবস্থায় দরবার থেকে বেরিয়ে গেল। আর আমরা উত্তম বাসগৃহে সম্মানিত প্রতিবেশীর মত নাজ্জাশীর নিকট বসবাস করতে লাগলাম।

অতঃপর জা'ফর ইবন আবী তালিব ও তাঁর সহধর্মিনী নাজ্জাশীর আশ্রয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্তে পূর্ণ দশটি বছর অতিবাহিত করেন। সপ্তম হিজরীতে তাঁরা দু'জন এবং আরও কিছু মুসলমান হাবশা থেকে ইয়াসরিবের (মদীনা) দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁরাও মদীনায় পৌঁছলেন, আর এদিকে রাসূল (সা) খাইবার বিজয় শেষ করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। রাসূল (সা) জা'ফরকে দেখে এত খুশী হলেন যে, তাঁর দু'চোখের মাঝখানে চুমু দিয়ে বললেন ঃ 'আমি জানিনে, খাইবার বিজয় আর জা'ফরের আগমন– দু'টির কোন্‌টির কারণে আমি বেশী খুশী।'

সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম সমাজ এবং বিশেষভাবে গরীব মুসলমানদের আনন্দ ও খুশী জা'ফরের আগমনে রাসূলুল্লাহর (সা) থেকে বিন্দুমাত্র কম ছিলনা। কারণ জা'ফর ছিলেন গরীব-মিসকীনদের প্রতি ভীষণ দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। এ কারণে তাঁকে ডাকা হত আবুল মাসাকীন বা মিসকীনদের পিতা বলে।

জা'ফর ইবন আবী তালিবের মদীনায় আসার পর একটি বছর কেটে গেল। অষ্টম হিজরীর প্রথম দিকে সিরিয়ার রোমান বাহিনীকে আক্রমণের জন্য রাসূল (সা) সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন। যায়িদ বিন হারিসাকে সেনাপতি নিয়োগ করে তিনি বললেন ঃ 'যায়িদ নিহত হলে আমীর হবে জা'ফর ইবন আবী তালিব। জা'ফর নিহত বা আহত হলে আমীর হবে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। আর সে নিহত বা আহত হলে মুসলমানরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচন করবে।'

মুসলিম বাহিনী জর্দানের সিরিয়া সীমান্তে 'মূতা' নামক স্থানে পৌঁছে দেখতে পেল, এক লাখ রোমান সৈন্য তাদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত এবং তাদের সাহায্যের জন্য লাখম, জুজাম, কুদাআ ইত্যাদি আরব গোত্রের আরও এক লাখ খৃষ্টান সৈন্য পেছনে প্রতীক্ষা করছে। অন্যদিকে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা মাত্র তিন হাজার। যুদ্ধ শুরু হতেই যায়িদ বিন হারিসা বীরের ন্যায় শাহাদাত বরণ করেন। অতপর জা'ফর বিন আবী তালিব তাঁর ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েন এবং শত্রু বাহিনী যাতে সেটি ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য নিজের তরবারী দ্বারা ঘোড়াটিকে হত্যা করে ফেলেন। তারপর পতাকাটি তুলে ধরেন রোমান বাহিনীর অভ্যন্তরভাগে বহু দূর পর্যন্ত প্রবেশ করে শত্রু নিধন কার্য চালাতে থাকেন। এমতাবস্থায় তাঁর ডান হাতটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। তিনি বাম হাতে পতাকা উঁচু করে ধরেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তরবারির অন্য একটি আঘাতে তাঁর বাম হাতটিও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবুও তিনি হাল ছাড়লেন না। বাহু দিয়ে বুকের সাথে জাপ্টে ধরে তিনি ইসলামী পতাকা সমুন্নত রাখলেন। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ পর তরবারির তৃতীয় একটি আঘাতে তাঁর দেহটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

অতঃপর পতাকাটি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তুলে নিলেন। শত্রু সৈন্যের সাথে বীর বিক্রমে লড়তে লড়তে তিনিও তাঁর দুই সাথীর অনুগামী হলেন। তারপর খালিদ বিন ওয়ালিদ পতাকা হাতে নিয়ে মুসলিম বাহিনীকে উদ্ধার করেন।

এ যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমারও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ জাফরের লাশ তালাশ করে দেখা গেল, শুধু তাঁর সামনের দিকেই পঞ্চাশটি ক্ষতচিহ্ন। সারা দেহে তাঁর নব্বইটিরও বেশী ক্ষত ছিল। কিন্তু তার একটিও পেছন দিকে ছিল না।

এ তিন সেনাপতির শাহাদাতের খবর শুনে রাসূল (সা) দারুণভাবে ব্যথিত হন। বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি তাঁর চাচাত ভাই জা'ফরের বাড়ীতে যান। তখন তাঁর স্ত্রী আসমা স্বামীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি রুটির জন্য আটা বানিয়ে রেখেছেন, ছেলেমেয়েদের গোসল করিয়ে তেল মাখিয়েছেন এবং তাদেরকে নতুন পোশাক পরিয়েছেন।

আসমা বলেন ঃ পাতলা ও পরিষ্কার একখানা কাপড় দিয়ে পবিত্র মুখমণ্ডল ঢেকে

রাসূলকে (সা) আমাদের বাড়ীর দিকে আসতে দেখে আমার মনে নানারকম ভীতি ও শঙ্কার উদয় হল। কিন্তু খারাপ কিছু শুনতে হয় এ ভয়ে আমি তাঁকে জা'ফর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন ঃ 'জা'ফরের ছেলেমেয়েদের আমার কাছে নিয়ে এস।' আমি তাদেরকে ডাকলাম। তারা খুশিতে বাগবাগ হয়ে কে আগে রাসূলের (সা) নিকট পৌঁছবে এরূপ একটা প্রতিযোগিতা নিয়ে দৌড় দিল। রাসূল (সা) তাদেরকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে লাগলেন। তখন তাঁর দু'চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। আমি বললাম ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আপনি কাঁদছেন কেন?' জা'ফর ও তার সংগী দু'জনের কোন দুঃসংবাদ পেয়েছেন কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আজই তারা শাহাদাত বরণ করেছেন। আর সেই মুহূর্তে ছোট্ট ছেলে-মেয়েদের মুখের হাসি বিলীন হয়ে গেল। যখন তারা শুনতে পেল তাদের মা কান্না ও বিলাপ করছে, তারা নিজ নিজ স্থানে পাথরের মত এমন স্থির হয়ে গেল, যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। প্রতিবেশী মহিলারা এসে আসমার পাশে ভিড় করল। রাসূল (সা) চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন। বাড়ীতে পৌঁছে আযওয়াজে মুতাহ্হারাতকে বললেন ঃ 'আজ তোমরা জা'ফরের পরিবারবর্গের প্রতি একটু নজর রেখ। তারা আজ চেতনাহীন।'

হযরত জা'ফরের শাহাদাতের পর দীর্ঘদিন ধরে রাসূল (সা) শোকাভিভূত ও বিমর্ষ ছিলেন। অবশেষে হযরত জিবরীল (আ) তাঁকে সুসংবাদ দান করেন যে, আল্লাহ তা'আলা জা'ফরকে তাঁর দুটি কর্তিত হাতের পরিবর্তে নতুন দু'টি রক্তরাঙা হাত দান করেছেন এবং তিনি জান্নাতে ফিরিশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছেন। এ কারণে তাঁর উপাধি হয়, 'যুল-জানাহাইন' ও 'তাইয়ার'—দু' ডানাওয়ালা ও উড়ন্ত।

ইবন সা'দ তাঁর *তাবাকাতে* বর্ণনা করেন ঃ যায়িদ বিন হারিসা, জা'ফর ইবন আবী তালিব ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার শাহাদাতের খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে তাদের পরিচয় তুলে ধরে ও প্রশংসা করে এক সংক্ষিপ্ত খুতবা দেন এবং দু'আ করেন ঃ 'হে আল্লাহ, আপনি যায়িদকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ, আপনি যায়িদকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আপনি জা'ফর ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে মাফ করে দিন।'

ইমাম আহমাদ আবদুল্লাহ ইবন আসলাম থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জা'ফরকে বলতেন, 'সিরাত ও সুরাত—চরিত্র ও দৈহিক গঠনে তুমি আমার মত।'

হযরত জা'ফর ছিলেন গরীব মিসকীনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়। আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ "আমাদের মিসকীন সম্প্রদায়ের জন্য জা'ফর ইবন আবী তালিব ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি আমাদেরকে সংগে করে তাঁর গৃহে নিয়ে যেতেন, যা কিছু তাঁর কাছে থাকত তা আমাদের খাওয়াতেন। যখন তাঁর খাবার শেষ হয়ে যেত তখন তাঁর ছোট্ট শূন্য ঘি-এর মশকটি বের করে দিতেন। আমরা তা ফেঁড়ে ভেতরে যা কিছু লেগে থাকত চেটেচুটে খেতাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন ঃ 'আমার আগে যত নবী এসেছেন তাঁদের মাত্র সাতজন বন্ধু দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমার বিশেষ বন্ধুর সংখ্যা চৌদ্দ এবং জা'ফর তার একজন'। (বুখারী, মানাকিবু জা'ফর)

যায়িদ ইবন হারিসা (রা)

আবু উসামা যায়িদ নাম। হিব্বু রাসূলিল্লাহ (রাসূলুল্লাহর প্রীতিভাজন) তাঁর উপাধি, পিতা হারিসা এবং মাতা সু'দা বিনতু সা'লাবা।

সু'দা বিনতু সা'লাবা তাঁর শিশু পুত্র যায়িদকে সংগে করে পিতৃ গোত্র বনী মা'নের নিকট যাওয়ার জন্য যাত্রা করলেন। পিতৃ-গোত্রে পৌঁছার পূর্বেই একদিন রাতে বনী কায়নের লুটেরা দল তাঁদের তাঁবু আক্রমণ করে ধন সম্পদ, উট ইত্যাদি লুণ্ঠন এবং শিশুদের বন্দী করে নিয়ে যায়। এই বন্দী শিশুদের মধ্যে তাঁর পুত্র যায়িদ ইবন হারিসাও ছিলেন।

যায়িদের বয়স তখন আট বছর। লুটেরা দল তাঁকে বিক্রির উদ্দেশ্যে 'উকাজ' মেলায় নিয়ে যায়, হাকীম ইবন হিযাম ইবন খুয়াইলিদ নামে এক কুরাইশ নেতা চার শো' দিরহামে তাঁকে খরীদ করেন। তাঁর সাথে আরো কিছু দাস খরীদ করে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন।

হাকীম ইবন হিযামের প্রত্যাবর্তনের খবর শুনে তাঁর ফুফু খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ দেখা করতে আসেন। ফুফুকে তিনি বলেন ঃ ফুফু উকাজ থেকে আমি বেশ কিছু দাস খরীদ করে এনেছি। এদের মধ্যে যেটা আপনার পসন্দ হয় বেছে নিন। আপনাকে হাদিয়া হিসাবে দান করলাম।

হযরত খাদীজা দাসগুলির চেহারা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করার পর যায়িদ ইবন হারিসাকে চয়ন করলেন। কারণ, তিনি যায়িদের চেহারায় তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধির ছাপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি তাঁকে সংগে করে বাড়ীতে নিয়ে এলেন।

এ ঘটনার কিছু দিন পর মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহর সাথে খাদীজা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি স্বামীকে কিছু উপহার দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। প্রিয় ক্রীতদাস যায়িদ ইবন হারিসা অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর কোন জিনিস তিনি খুঁজে পেলেন না। এ ক্রীতদাসটিকেই তিনি স্বামীর হাতে তুলে দিলেন।

এ সৌভাগ্যবান বালক ক্রীতদাস মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হতে লাগলেন। তাঁর মহান সাহচর্য লাভ করে উত্তম চারিত্রিক সৌন্দর্য্য পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেলেন। এ দিকে তাঁর স্নেহময়ী জননী পুত্র শোকে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চোখের পানি কখনও শুকাতো না। রাতের ঘুম তাঁর হারাম হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বড় দুঃখ ছিল, তাঁর ছেলেটি বেঁচে আছে না ডাকাতদের হাতে মারা পড়েছে, এ কথাটি তিনি জানতেন না। তাই তিনি খুব হতাশ হয়ে পড়তেন। তাঁর পিতা হারিসা সম্ভাব্য সব স্থানে হারানো ছেলেকে খুঁজতে থাকেন। পরিচিত অপরিচিত, প্রতিটি মানুষের কাছে ছেলের সন্ধান জানতে চাইতেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন বিশিষ্ট কবি। এ সময় রচিত বহু কবিতায় তাঁর পুত্র হারানোর বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এমনি একটি কবিতায় তিনি বলেন—

"যায়িদের জন্য আমি কাঁদছি, জানিনে তার কি হয়েছে,
সে কি জীবিত?
তবে তো ফেরার আশা আছে, নাকি মারা গেছে?
আল্লাহর কসম! আমি জানিনে, অথচ জিজ্ঞেস করে চলেছি।
তোমাকে অপহরণ করেছে সমতল ভূমির লোকেরা, না পার্বত্য ভূমির?
উদয়ের সময় সূর্য স্মরণ করিয়ে দেয় তার কথা, আর যখন
অস্ত যায়, নতুন করে মনে করে দেয়।
আমি দেশ থেকে দেশান্তরে তোমার সন্ধানে
উট হাঁকিয়ে ফিরবো, কখনও আমি ক্লান্ত হবো না,
আমার বাহন উটও না। আমার জীবন থাকুক বা মৃত্যু আসুক।
প্রতিটি মানুষই তো মরণশীল—যত আশার পেছনেই দৌড়াক না কেন।"

এই হজ্জ মৌসুমে যায়িদের গোত্রের কতিপয় লোক হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় এলো। কা'বার চতুর্দিকে তাওয়াফ করার সময় তারা যায়িদের মুখোমুখি হলো। তারা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পেরে কুশল বিনিময় করলো। লোকগুলি হজ্জ আদায়ের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে যায়িদের পিতা হারিসাকে তাঁর হারানো ছেলের সন্ধান দিল।

ছেলের সন্ধান পেয়ে হারিসা সফরের প্রস্তুতি নিলেন। কলিজার টুকরা, চোখের পুত্তলি যায়িদের মুক্তিপণের অর্থও বাহনে উঠালেন। সফরসংগী হলেন হারিসার ভাই কা'ব। তাঁরা মক্কার পথে বিরামহীন চলার পর মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহর কাছে পৌঁছলেন এবং বললেন ঃ

'ওহে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আপনারা আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী। অসহায়ের সাহায্যকারী, ক্ষুধার্তকে অন্নদানকারী ও আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দানকারী। আপনার কাছে আমাদের যে ছেলেটি আছে তার ব্যাপারে আমরা এসেছি। তার মুক্তিপণও সংগে নিয়ে এসেছি। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আপনার ইচ্ছামত তার মুক্তিপণ নির্ধারণ করুন।'

মুহাম্মাদ (সা) বললেন ঃ 'আপনারা কোন্ ছেলের কথা বলছেন?'

ঃ আপনার দাস যায়িদ ইবন হারিসা।

ঃ মুক্তিপণের চেয়ে উত্তম কিছু আপনাদের জন্য নির্ধারণ করি, তা-কি আপনারা চান?

ঃ কী তা?

ঃ আমি তাকে আপনাদের সামনে ডাকছি। স্বেচ্ছায় সে নির্ধারণ করুক, আমার সাথে থাকবে, না আপনাদের সাথে যাবে, যদি আপনাদের সাথে যেতে চায়, মুক্তিপণ ছাড়া তাকে নিয়ে যাবেন। আর আমার সাথে থাকতে চাইলে আমার করার কিছুই নেই।

তারা সায় দিয়ে বলল ঃ আপনি অত্যন্ত ন্যায় বিচারের কথা বলেছেন।

মুহাম্মাদ (সা) যায়িদকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ দু'ব্যক্তি কারা?

বলল ঃ ইনি আমার পিতা হারিসা ইবন শুরাহবীল। আর উনি আমার চাচা কা'ব।

বললেন ঃ 'তুমি ইচ্ছা করলে তাঁদের সাথে যেতে পার, আর ইচ্ছা করলে আমার সাথেও থেকে যেতে পার।'

কোন রকম ইতস্ততঃ না করে সংগে সংগে তিনি বলে উঠলেন ঃ 'আমি আপনার সাথেই থাকবো।'

তাঁর পিতা বললেন ঃ 'যায়িদ, তোমার সর্বনাশ হোক! পিতা-মাতাকে ছেড়ে তুমি দাসত্ব বেছে নিলে?'

তিনি বললেন ঃ 'এ ব্যক্তির মাঝে আমি এমন কিছু দেখেছি, যাতে আমি কখনও তাকে ছেড়ে যেতে পারিনে।'

যায়িদের এ সিদ্ধান্তের পর মুহাম্মাদ (সা) তাঁর হাত ধরে কা'বার কাছে নিয়ে আসেন এবং হাজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে উপস্থিত কুরাইশদের লক্ষ্য করে ঘোষণা করেন ঃ 'ওহে কুরাইশ জনমণ্ডলী! তোমরা সাক্ষী থাক, আজ থেকে যায়িদ আমার ছেলে। সে হবে আমার এবং আমি হবো তার উত্তরাধিকারী।'

এ ঘোষণায় যায়িদের বাবা-চাচা খুব খুশী হলেন। তাঁরা তাঁকে মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহর নিকট রেখে প্রশান্ত চিত্তে দেশে ফিরে গেলেন। সেই দিন থেকে যায়িদ ইবন হারিসা হলেন যায়িদ ইবন মুহাম্মাদ। সবাই তাঁকে মুহাম্মাদের ছেলে হিসেবেই সম্বোধন করতো। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবের– 'তাদেরকে তাদের পিতার নামেই ডাক'– এ আয়াত নাযিল করে ধর্মপুত্র গ্রহণের প্রথা বাতিল করেন। অতঃপর আবার তিনি যায়িদ ইবন হারিসা নামে পরিচিতি লাভ করেন।

যায়িদ নিজের পিতা-মাতাকে ছেড়ে মুহাম্মাদকে (সা) যখন বেছে নিয়েছিলেন, তখন জানতেন না কি জিতই না তিনি জিতেছেন। স্বীয় পরিবার-পরিজন ও গোত্রকে ছেড়ে যে মনিবকে তিনি চয়ন করলেন, তিনিই যে, সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল, এর কোন কিছুই তিনি জানতেন না। তার মনে তখন একটি বারের জন্যও এ চিন্তা উদয় হয়নি যে, এ বিশ্বে এমন একটি রাষ্ট্র কায়েম হবে যা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র কল্যাণ ও ন্যায়বিচারে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তিনিই হবেন সেই কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। না, এর কোন কিছুই তখন যায়িদের চিন্তা ও কল্পনায় আসেনি। সবই আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি অঢেল দান করেন।

এ ঘটনার মাত্র কয়েক বছর পর মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন। যায়িদ হলেন পুরুষ দাসদের মধ্যে প্রথম বিশ্বাসী। পরবর্তীকালে তিনি হলেন রাসূলুল্লাহর (সা) বিশ্বাসভাজন আমীন, তাঁর সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে মদীনার অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক।

যায়িদ যেমন পিতা-মাতাকে ছেড়ে রাসূলকে (সা) বেছে নেন, তেমনি রাসূলও (সা) তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসলেন এবং তাঁকে আপন সন্তান ও পরিবারবর্গের মধ্যে শামিল করে নেন। যায়িদ দূরে গেলে তিনি উৎকণ্ঠিত হতেন, ফিরে এলে উৎফুল্ল হতেন এবং এত আনন্দের সাথে তাঁকে গ্রহণ করতেন যে অন্য কারো সাক্ষাতের সময় তেমন দেখা যেত না। কোন এক অভিযান শেষে হযরত যায়িদ মদীনায় ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তার একটি বর্ণনা দিয়েছেন হযরত আয়িশা (রা)।

তিনি বলেন—

'যায়িদ ইবন হারিসা মদীনায় ফিরে এলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন আমার ঘরে। সে দরজার কড়া নাড়লো। রাসূল (সা) প্রায় খালি গায়ে উঠে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর দেহে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত একপ্রস্থ কাপড় ছাড়া কিছু ছিল না। এ অবস্থায় কাপড় টানতে টানতে দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন। তাঁর সাথে গলাগলি করলেন ও চুমু খেলেন। আল্লাহর কসম, এর আগে বা পরে আর কখনও রাসূলুল্লাহকে (সা) এমন খালিগায়ে আমি দেখিনি।'

যায়িদের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) গভীর ভালোবাসার কথা মুসলিম জনতার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে লোকে তাকে 'যায়িদ আল হুব্ব' বলে সম্বোধন করতো এবং তাঁর উপাধি হয় 'হিব্বু রাসূলিল্লাহ' বা রাসূলুল্লাহর প্রীতিভাজন।

হযরত হামযা (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল (সা) তাঁর সাথে যায়িদের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এমন কি হামযা কখনও সফরে গেলে তাঁর দ্বীনি ভাই যায়িদকে অসী বানিয়ে যেতেন।

'উম্মু আয়মন' নামে রাসূলুল্লাহর (সা) এক দাসী ছিলেন। একদিন তিনি সাহাবীদের বললেন ঃ কেউ যদি কোন জান্নাতী মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, সে উম্মু আয়মনকে বিয়ে করুক। হযরত যায়িদ আল্লাহর রাসূলকে (সা) খুশী করার জন্য তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁরই গর্ভে প্রখ্যাত সেনানায়ক হযরত উসামা ইবন যায়িদ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পর তিনি হযরত কুলসুম ইবন হিদ্‌মের মেহমান হন। হযরত উসাইদ ইবন হুদাইরের (রা) সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক কায়েম হয়। এত দিন তিনি নবী পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে একসংগে থাকতেন। এখানে আসার পর তাঁকে পৃথক বাড়ী করে দেওয়া হয় এবং রাসূলুল্লাহর (সা) আপন ফুফাতো বোন জয়নব বিনতু জাহাশের সাথে তার বিয়ে হয়। কিন্তু যয়নবের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তিনি তালাক দেন। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (সা) যয়নবকে বিয়ে করেন।

হযরত যায়িদ ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীরন্দায। বদর থেকে মূতা পর্যন্ত সকল অভিযানেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। একমাত্র 'মাররে ইয়াসী' অভিযানে যোগদান করতে পারেননি। এ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান।

হিজরী অষ্টম সনে একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেল। এ বছর রাসূল (সা) ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একটি পত্রসহ হারিস ইবন উমাইর আল-আযদীকে বসরার শাসকের নিকট পাঠান। হারিস জর্দানের পূর্ব সীমান্তে 'মূতা' নামক স্থানে পৌঁছলে গাস্‌সানী সম্রাটের একজন শাসক শুরাহ্‌বীল ইবন 'আমর পথ রোধ করে তাঁকে বন্দী করে। তারপর তাঁকে হত্যা করে। রাসূল (সা) ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। কারণ, এর আগে আর কোন দূত এভাবে নিহত হয়নি। রাসূল (সা) মূতায় অভিযান পরিচালনার জন্য তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং পরিচালনার

দায়িত্ব দিলেন হযরত যায়িদ ইবন হারিসার হাতে। রওয়ানার পূর্ব মুহূর্তে রাসূল (সা) উপদেশ দিলেন : 'যদি যায়িদ শহীদ হয়, দলটির পরবর্তী পরিচালক হবে জা'ফর ইবন আবী তালিব। জা'ফর শহীদ হলে পরিচালক হবে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। সেও যদি শহীদ হয় তাহলে তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে পরিচালক নির্বাচন করে নেবে।'

যায়িদের নেতৃত্বে বাহিনীটি মদীনা থেকে যাত্রা করে জর্দানের পূর্ব সীমান্তে 'মায়ান' নামক স্থানে পৌঁছলো। রোম সম্রাট হিরাকল গাস্সানীদের পক্ষে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এক লাখ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলো। তার সাথে যোগ দিল পৌত্তলিক আরবদের আরও এক লাখ সৈন্য। এ সম্মিলিত বাহিনী মুসলিম বাহিনীর অনতি দূরে অবস্থান গ্রহণ করলো। 'মায়ানে' মুসলিম বাহিনী দু' রাত অবস্থান করে করণীয় বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। কেউ বললেন, পত্র মারফত শত্রু বাহিনীর সংখ্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করে পরবর্তী নির্দেশের প্রতীক্ষায় থাকা উচিত। কেউ বললেন, আমরা সংখ্যা, শক্তি বা আধিক্যের দ্বারা লড়াই করিনা। আমরা লড়াই করি এ দ্বীনের দ্বারা। যে উদ্দেশ্যে তোমরা বের হয়েছো, সেজন্য এগিয়ে চলো। হয় কামিয়াবী না হয় শাহাদাত—এর যে কোন একটি সাফল্য তোমরা লাভ করবে।

অতঃপর এই দুই অসম বাহিনী মুখোমুখি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হলো। দু'লাখ সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র তিন হাজার সৈন্যের বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে রোমান বাহিনী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তাদের অন্তরে ভীতিরও সঞ্চার হলো।

যায়িদ ইবন হারিসা রাসূলুল্লাহর (সা) পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য যে বীরত্ব সহকারে লড়াই করেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। তীর ও বর্শার অসংখ্য আঘাতে তাঁর দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। অবশেষে, তিনি রণক্ষেত্রে ঢলে পড়েন। তারপর একে একে জাফর ইবন আবী তালিব ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা পতাকা তুলে নেন এবং বীরত্বের সাথে শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনীর সম্মিলিত সিদ্ধান্তে খালিদ ইবন ওয়ালিদ কমাণ্ডার নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন নও মুসলিম। তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী অনিবার্য পরাজয় ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। এভাবে নবম হিজরীতে ৫৪ অথবা ৫৫ বছর বয়সে হযরত যায়িদ শাহাদাত বরণ করেন।

মৃতার দুঃখজনক সংবাদ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছলে তিনি এতই শোকাতুর হয়ে পড়েন যে, আর কখনও তেমন শোকাভিভূত হতে দেখা যায়নি। তিনি শহীদ কমাণ্ডারদের বাড়ী গিয়ে তাদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। যায়িদের বাড়ী পৌঁছলে তাঁর ছোট্ট মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলকে (সা) জড়িয়ে ধরে এবং রাসূলও (সা) উচ্চস্বরে কেঁদে ফেলেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে সা'দ ইবন উবাদা বলে ওঠেন : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ : একি?

তিনি বলেন : 'এ হচ্ছে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।'

রাসূল (সা) বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে যায়িদের অল্পবয়স্ক পুত্র উসামাকে পিতৃ হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য এক বাহিনী সহকারে পাঠান। এত অল্পবয়স্ক ব্যক্তির নেতৃত্ব

অনেকের পছন্দ হলো না। রাসূল (সা) একথা জানতে পেরে বললেন ঃ 'তোমরা পূর্বে তার পিতার নেতৃত্বের সমালোচনা করেছিলে। এখন তার পুত্রের নেতৃত্বে সন্তুষ্ট হতে পারছো না। আল্লাহর কসম! যায়িদ নেতা হওয়ার যোগ্য ছিল এবং সে ছিল আমার সর্বাধিক প্রিয়। তারপর আমার সবচেয়ে প্রিয় তাঁর পুত্র উসামা।' উসামা ছিলেন পিতার উপযুক্ত সন্তান। পিতৃহত্যার উপযুক্ত বদলা নিয়ে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা, আনুগত্য ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল হযরত যায়িদের জীবনের একমাত্র ব্রত। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত উম্মু আয়মন (রা) ছিলেন বেশী বয়সের প্রায় বৃদ্ধা, বাহ্যিক রূপহীনা এক নারী। শুধু রাসূলকে (সা) খুশী করার উদ্দেশ্যেই হযরত যায়িদ (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। হযরত যয়নাবের (রা) সাথে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে তিনি নিজেই আবার যয়নাবের (রা) কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) বিয়ের পয়গাম উত্থাপন করেন। শুধুমাত্র এজন্য যে, রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। এ কারণে হযরত যয়নাবের (রা) প্রতি সম্মানের খাতিরে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাননি। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শুধু প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন। (মুসলিম)

হযরত যায়িদ ও তাঁর সন্তানদের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) সীমাহীন ভালোবাসা লক্ষ্য করে হযরত আয়িশা (রা) বলতেন ঃ 'যদি যায়িদ জীবিত থাকতেন, রাসূল (সা) মৃত্যুর পর হয়তো তাকেই স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন।'

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)

আবদুল্লাহ নাম, আবুল আব্বাস কুনিয়াত। পিতা আব্বাস, মাতা উম্মুল ফাদল লুবাবা। কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা) তাঁর আপন খালা।

মহান সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) নানান দিক থেকেই সম্মান ও গৌরবের অধিকারী ছিলেন। রক্ত-সম্পর্কের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই। অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি আরব জাতি তথা উম্মাতে মুহাম্মাদীর 'হাবর ও বাহর' (পুণ্যবান জ্ঞানী ও সমুদ্র) উপাধি লাভ করেছিলেন। তাকওয়া ও পরহিযগারীর তিনি ছিলেন বাস্তব নমুনা। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি দিনে রোযাদার, রাতে ইবাদাত গোযার এবং রাতের শেষ প্রহরে তাওবাহ ও ইসতিগফারকারী। আল্লাহর ভয়ে তিনি এত বেশী কাঁদতেন যে, অশ্রুধারা তাঁর গণ্ডদ্বয়ে দু'টি রেখার সৃষ্টি করেছিল।

ইনি সেই আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস যাঁকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর রাব্বানী (আল্লাহকে জেনেছে এমন জ্ঞানী) বলা হয়েছে। আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী, তার ব্যাখ্যা ও ভাব সম্পর্কে অধিক পারদর্শী এবং তার রহস্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি।

রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের তিন বছর পূর্বে তিনি মক্কার শিয়াবে আবী তালিবে জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশরা তাঁর গোত্র বনু হাশিমকে বয়কট করার কারণে তারা তখন শিয়াবে আবী তালিবে জীবন যাপন করছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সময় তিনি তের বছরের একজন কিশোর মাত্র। এতদসত্ত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) এক হাজার ছ'শ' ষাটটি বাণী বা হাদীস স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে মুসলিম জাতির বিশেষ কল্যাণ সাধন করেন, সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যার অনেকগুলিই বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহর পিতা হযরত আব্বাস দৃশ্যতঃ মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন পূর্বে হিজরী ৮ম সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবন সাদের বর্ণনা মতে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার পর উম্মুল ফাদলই মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। তাই হযরত আবদুল্লাহ জন্মের পর থেকেই তাওহীদের পরিবেশে বেড়ে ওঠেন এবং বুদ্ধি বিবেক হওয়ার পর এক মজবুত ঈমানের অধিকারী মুসলমান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

তাঁর মা প্রখ্যাত সাহাবিয়্যা উম্মুল ফাদল লুবাবা বিনতুল হারিস আল-হিলালিয়্যা আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁকে কোলে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যায়। রাসূল (সা) নিজের পবিত্র মুখ থেকে একটু থু থু নিয়ে শিশু আবদুল্লাহর মুখে দিয়ে তাঁর তাহনীক করেন। এভাবে তার পেটে পার্থিব কোন বস্তু প্রবেশের পূর্বেই রাসূলে পাকের পবিত্র ও কল্যাণময় থু থু প্রবিষ্ট হয়। আর সেইসাথে প্রবেশ করে তাকওয়া ও হিকমাত।

তাঁর পিতা হযরত 'আব্বাস হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন পূর্বে সপরিবারে মদীনায় হিজরাত করেন। আবদুল্লাহর বয়স তখন এগারো বছরের বেশী হবে না। কিন্তু তখনও তিনি অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যে কাটাতেন। একবার বাড়ী ফিরে এসে তিনি বর্ণনা করেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যাকে আমি চিনিনে।' হযরত আব্বাস একথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ব্যক্ত করলে রাসূল (সা) আবদুল্লাহকে ডেকে নিজের কোলে বসান এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দু'আ করেন; 'হে আল্লাহ, তাকে বরকত দিন এবং তার থেকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিন।'

সাত বছর থেকেই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সেবা ও খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। অজুর প্রয়োজন হলে তিনি পানির ব্যবস্থা করতেন, নামাযে দাঁড়ালে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ইকদেতা করতে এবং সফরে রওয়ানা হলে তিনি তাঁর বাহনের পেছনে আরোহন করে তাঁর সফরসংগী হতেন। এভাবে ছায়ার ন্যায় তিনি তাঁকে অনুসরণ করতেন এবং নিজের মধ্যে সর্বদা বহন করে নিয়ে বেড়াতেন একটি সজাগ অন্তঃকরণ, পরিচ্ছন্ন মস্তিষ্ক এবং আধুনিক যুগের যাবতীয় রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি থেকে অধিক শক্তিশালী একটি স্মৃতিশক্তি।

হযরত আবদুল্লাহ যদিও স্বভাবগতভাবেই ছিলেন শান্তশিষ্ট, বুদ্ধিমান ও চালাক, তবুও তিনি জীবনের যে অধ্যায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য লাভের সুযোগ লাভ করেন মূলতঃ সে বিষয়টি মানুষের জীবনের খেলাধূলার সময়। তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন ঃ আমি অন্য ছেলেদের সাথে গলিতে, রাস্তা-ঘাটে খেলা করতাম। একদিন পেছনের দিক থেকে রাসূলুল্লাহকে (সা) আসতে দেখলাম। আমি তাড়াতাড়ি একটি বাড়ীর দরজার আড়ালে দিয়ে পালালাম। কিন্তু তিনি আমাকে ধরে ফেললেন। আমার মাথায় হাত রেখে বললেন ঃ 'যাও, মুয়াবিয়াকে ডেকে আন।' মুয়াবিয়া ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাতিব বা সেক্রেটারী। আমি দৌড়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম ঃ 'চলুন, রাসূল (সা) আপনাকে ডাকছেন।'

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা) হযরত আবদুল্লাহর খালা হওয়ার কারণে অধিকাংশ সময় তাঁর কাছে কাটাতেন। অনেক সময় রাতে তাঁর ঘরেই শুয়ে পড়তেন। এ কারণে খুব নিকট থেকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য লাভে তিনি ধন্য হয়েছেন। রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাহাজ্জুদ নামায আদায় ও তাঁর অজুর পানি এগিয়ে দেওয়ার সুযোগও লাভ করেছেন। একবার হযরত মায়মূনার ঘরে তাহাজ্জুদ নামাযে রাসূলুল্লাহর (সা) বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি আবদুল্লাহর মাথা ধরে ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস নিজের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) অজু করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি দ্রুত পানির ব্যবস্থা করে দিলাম। আমার কাজে তিনি খুব খুশী হলেন। নামাযে যখন দাঁড়ালেন তখন আমাকে তাঁর পাশে দাঁড়াবার জন্য ইংগিত করলেন। কিন্তু আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। নামায শেষ করে আমার দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবদুল্লাহ আমার পাশে দাঁড়াতে কিসে তোমাকে বিরত রাখলো? বললাম ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার দৃষ্টিতে আপনি মহা

সম্মানিত এবং আপনি এতই মর্যাদাবান যে, আমি আপনার পাশাপাশি হওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করিনি।' সাথে সাথে তিনি আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দু'আ করলেন, 'আল্লাহুম্মা আতিহিল হিকমাহ্'— 'আল্লাহ, আপনি তাকে হিকমাত বা বিজ্ঞান দান করুন।' আর একবার রাতের বেলা রাসূলুল্লাহর (সা) অজুর পানি এগিয়ে দিলে তিনি আবদুল্লাহর জন্য দু'আ করেন এই বলে ঃ 'আল্লাহুম্মা ফাক্কিহ্হু ফিদদীন ওয়া আল্লিমহুত তাবীল– হে আল্লাহ, তাকে দ্বীনের ফকীহ বানিয়ে দাও, তাকে তাবীল বা ব্যাখ্যা পদ্ধতি শিখাও।'

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবীর এ দু'আ কবুল করেন এবং হাশেমী বালককে এত অধিক জ্ঞান দান করেন যে, বড় বড় জ্ঞানীদেরও তিনি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হন। তাঁর অগাধ জ্ঞান তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার বিচিত্র ঘটনাবলী ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সময় আবদুল্লাহর বয়স মাত্র তের বছর। এর সোয়া দুই বছর পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর ইনতিকাল করেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের খিলাফতকালে তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। খলীফা 'উমার (রা) তাঁকে স্বীয় সান্নিধ্যে ও তত্ত্বাবধানে রাখেন। তাকে গুরুত্বপূর্ণ মজলিসে বড় বড় সাহাবীদের সাথে বসার অনুমতি দিতেন। বদরী সাহাবীদের সাথেও বসার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয়। মুহাদ্দিস ইবন আবদিল বার বলেন ঃ 'উমার ইবন আব্বাসকে ভালোবাসতেন এবং তাঁকে সান্নিধ্য দান করতেন।

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা) যুগে হিজরী ২৭ সনে মিসরের ওয়ালী আবদুল্লাহ ইবন আবী সারাহর নেতৃত্বে আফ্রিকায় একটি অভিযান পরিচালিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ মদীনা থেকে একটি বাহিনী নিয়ে এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং মুসলিম পক্ষের দূত হিসাবে আফ্রিকার বাদশাহ জারজীরের সাথে আলোচনা করেন। বাদশাহ তাঁর প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে মন্তব্য করেন ঃ 'আমার ধারণা, আপনি আরবদের একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি।'

হিজরী ৩৫ সনে হযরত উসমান (রা) বিদ্রোহীদের দ্বারা গৃহবন্দী হলে তিনি আবদুল্লাহকে স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে আমীরে হজ্জ নিয়োগ করে মক্কায় পাঠান। সে বছর তারই নেতৃত্বে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। হজ্জ থেকে যখন মদীনায় ফিরে আসলেন, মদীনা তখন উত্তপ্ত। খলীফা উসমান (রা) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন এবং মদীনা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। তাঁরা খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য হযরত আলীকে চাপ দিচ্ছে। হযরত আলী (রা) আবদুল্লাহর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। আবদুল্লাহ পরিস্থিতির বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর দায়িত্বভার গ্রহণ না করার জন্য আলীকে (রা) পরামর্শ দেন। হযরত আলী দায়িত্ব গ্রহণ করলে যেসব পরিস্থিতির উদ্ভব হবে বলে তিনি ধারণা করেন, পরবর্তীকালে তা সবই সত্যে পরিণত হয়।

উটের যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ হযরত আলীর পক্ষে হিজাযী বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আলী তাঁকে বসরার ওয়ালী নিয়োগ করেন। বসরা থেকে একটি বাহিনী নিয়ে তিনি সিফফিনের যুদ্ধে আলীর (রা) পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য

যে, হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সিফ্ফিনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত আলী (রা) হযরত আবদুল্লাহকে তাঁর পক্ষে সালিশ নিযুক্ত করতে চান, কিন্তু অন্যদের আপত্তির কারণে তাঁর সে চাওয়া বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সময় আলীর (রা) কিছু সংগী যখন তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, তখন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস আলীকে বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাকে তাঁদের কাছে গিয়ে একটু কথা বলার অনুমতি দিন।' তিনি বললেন, 'আমি তাদের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ির আশংকা করছি।' আবদুল্লাহ বললেন, 'ইনশাআল্লাহ তেমন কিছু হবে না।'

আবদুল্লাহ তাদের কাছে গিয়ে উপলব্ধি করলেন তাদের চেয়ে এত বেশী একাগ্রচিত্তে ইবাদাতে নিমগ্ন অন্য কোন সম্প্রদায় ইতিপূর্বে আর কখনও তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি। তারা বলল, 'ইবন আব্বাস, আপনাকে খোশ আমদেদ! তবে আপনি কি জন্য এসেছেন?' বললেন, 'আপনাদের সাথে কিছু আলোচনার জন্য।' তাদের কেউ কেউ বলল, 'এর সাথে আলোচনার প্রয়োজন নেই।' তবে কেউ কেউ বলল, 'ঠিক আছে, বলুন, আপনার কথা আমরা শুনি।' তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই, তাঁর জামাই এবং তাঁর ওপর প্রথম পর্যায়ে ঈমান পোষণকারী ব্যক্তি অর্থাৎ আলীর প্রতি এমন চরম মনোভাব পোষণ করছেন কেন?' তারা বলল, 'আমরা তাঁর তিনটি কাজের বদলা নিতে চাই।' তিনি বললেন, 'সে তিনটি কাজ কি কি?' তারা বলল,

১. সিফফিনের যুদ্ধক্ষেত্রে আবু মুসা আশয়ারী ও আমর ইবনুল আসকে শালিশ নিযুক্ত করে তিনি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে বিচারক নিযুক্ত করেছেন।
২. আয়িশা ও মুয়াবিয়ার সাথে তিনি যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু তাদের ধন-সম্পদ গনিমাত হিসাবে এবং যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী হিসাবেও গ্রহণ করেননি।
৩. মুসলমানরা তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁকে আমীর হিসাবে মেনে নেওয়া সত্বেও তিনি 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি পরিহার করেছেন।

জবাবে ইবন আব্বাস বললেন,

'যদি আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস থেকে এমন কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি যা আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না, তাহলে আপনারা যে বিশ্বাসের উপর আছেন তা থেকে কি প্রত্যাবর্তন করবেন?' তাঁরা সম্মতিসূচক জবাব দিলে তিনি বললেন,

'আপনাদের অভিযোগ, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে বিচারক নিযুক্ত করে অপরাধ করেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্বেচ্ছায় কোন কিছু শিকার করে, তাহলে তোমাদের অন্তর্গত দুইজন সুবিচারক সে সম্পর্কে যে আদেশ করে সে অনুযায়ী অনুরূপ একটি পশু বিনিময় হিসাবে কাবায় উপস্থিত করবে।" (আল-মায়িদা ঃ ৯৫)

'আল্লাহর নামে আমি শপথ করে বলছি, চার দিরহাম মূল্যের একটি নিহত খরগোশের ব্যাপারে বিচারক নিয়োগ করা থেকে মানুষের রক্ত ও জীবন রক্ষা এবং তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে মানুষকে বিচারক নিয়োগ করা অধিক যুক্তিসংগত নয় কি?'

তারা বলল, 'হাঁ, মানুষের রক্তের নিরাপত্তা ও তাদের পারস্পরিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য বিচারক নিয়োগ অধিক সংগত।' ইবন আব্বাস বললেন, 'আমরা তাহলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম?' তারা বলল, 'হাঁ।'

ইবন আব্বাস বললেন, 'আপনারা বলছেন, আলী যুদ্ধ করেছেন আয়িশা ও মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে, কিন্তু তাদের বন্দী করে দাস-দাসী বানাননি। আপনারা কি চান আপনাদের মা আয়িশাকে দাসী বানানো হোক এবং অন্যান্য দাসীদের সাথে যেমন আচরণ করা হয় তাঁর সাথেও তেমন করা হোক? উত্তরে যদি হাঁ বলেন তাহলে আপনারা কাফির হয়ে যাবেন। (কারণ শরীয়াতে দাসীর সাথে স্ত্রীর ন্যায় আচরণ বৈধ।)'

আর যদি বলেন, 'আয়িশা' আমাদের মা নন, তাহলেও আপনারা কাফির হবেন। কারণ, আল্লাহ্ বলছেন ঃ

"নবী মুমিনদের ওপর তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিকতর স্নেহশীল এবং তাঁর সহধর্মিনীগণ তাদের জননী।" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৬)

'এখন এ দুটি জবাবের যে কোন একটি আপনারা বেছে নিন।' তারপর তিনি বললেন, 'আমরা তাহলে এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম?' তারা বলল, 'হাঁ।'

সবশেষে তিনি বললেন, "আলী 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধিটি পরিহার করেছেন, আপনারা এ অভিযোগ তুলেছেন। অথচ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে যে চুক্তিটি সম্পাদিত হয়, তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্যটি লেখা হলে কুরাইশরা বলেছিল ঃ আমরা যদি বিশ্বাসই করতাম আপনি আল্লাহর রাসূল, তাহলে আমরা আপনার কা'বা শরীফে পৌঁছার পথে প্রতিবন্ধক হতাম না বা আপনার সাথে সংঘর্ষেও লিপ্ত হতাম না। আপনি বরং এ বাক্যটির পরিবর্তে 'মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ' কথাটি লিখুন। সেদিন কিন্তু রাসূল (সা) এ কথা বলতে বলতে তাদের দাবী মেনে নিয়েছিলেন– 'আল্লাহর কসম, আমি সুনিশ্চিতভাবে বলছি, আমি আল্লাহর রাসূল– তা তোমরা আমাকে যতই অস্বীকার করনা কেন।' আলী ঠিক একই কারণে 'আমীরুল মুমিনীন' লকবটি পরিহার করেছেন। কারণ, মুয়াবিয়া যদি তাঁকে 'আমীরুল মুমিনীন' বলে স্বীকারই করে নিতেন তাহলে তো কোন বিরোধই থাকতো না।" একথার পর তিনি বললেন, 'তাহলে আমরা এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম?' তারা বলল, 'হাঁ।'

হযরত আলীর পক্ষত্যাগীদের সাথে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের এ জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় তাঁরা তৃপ্ত হল এবং তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তিকে তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিল। এ সাক্ষাতকারের পর বিশ হাজার লোক আবার আলীর দলে প্রত্যাবর্তন করে এবং অবশিষ্ট চার হাজার লোক আলীর শত্রুতার হঠকারী সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

চরমপন্থী খারেজীদের সাথে 'নাহরাওয়ান' নামক স্থানে হযরত আলীর (রা) যে যুদ্ধ হয় আবদুল্লাহ বসরা থেকে সাত হাজার সৈন্যসহ এ যুদ্ধে যোগদান করেন। হযরত আলী বসরার সাথে অধিকৃত সমগ্র ইরানেও আবদুল্লাহকে ওয়ালী নিয়োগ করেন। তিনি ইরানের খারেজী বিদ্রোহ নির্মূল করেন।

একটি বর্ণনা মতে, আলীর (রা) খিলাফতকালেই হযরত আবদুল্লাহ বসরার গভর্নরের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে মক্কায় চলে যান। কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, বসরার কাজী আবুল আসওয়াদ দুয়ালী ও তাঁর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। তবে অন্য একটি বর্ণনা মতে, তিনি হযরত আলীর (রা) খিলাফতের শেষ পর্যন্ত বসরার ওয়ালীর দায়িত্ব পালন করেন এবং হযরত মুয়াবিয়ার (রা) খিলাফতের সূচনাতে তিনি মক্কায় চলে যান এবং নির্জনে বসবাস করতে থাকেন।

হযরত ইমাম হুসাইন (রা) কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে যখন মদীনা থেকে মক্কা হয়ে কুফায় রওয়ানা হচ্ছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ তাঁকে কুফাবাসীদের গাদ্দারীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কারবালায় ইমাম হুসাইনের সপরিবারে শাহাদাত বরণে হযরত আবদুল্লাহ ভীষণ আঘাত পান। মক্কায় অবস্থান করলেও হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) হাতে বাইয়াত করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে তাঁকে খিলাফতের হকদার বলে মনে করতেন। বুখারী শরীফের একটি হাদীসের ভিত্তিতে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণে তাঁর মক্কায় অবস্থান কিছুটা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তিনি তায়েফে চলে যান। শেষ জীবনে অসুস্থ হয়ে যান এবং তায়েফেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস জ্ঞানার্জনের জন্য অক্লান্ত সাধনা ও পরিশ্রম করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সব ধরনের পথ ও পন্থা অবলম্বন করেন। রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় তিনি তাঁর অমিয় ঝর্ণাধারা থেকে দু'টি অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর ওফাতের পর বিশিষ্ট সাহাবীদের নিকট থেকে জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে থাকেন। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে তিনি যে কত বিনয়ী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন তাঁর নিজের একটি বর্ণনা থেকেই তা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন ঃ

"আমি যখনই অবগত হয়েছি, রাসূলুল্লাহর (সা) কোন সাহাবীর নিকট তাঁর একটি হাদীস সংরক্ষিত আছে, আমি তাঁর ঘরের দরজায় উপনীত হয়েছি। মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রামের সময় উপস্থিত হলে তাঁর দরজার সামনে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছি। বাতাস ধূলাবালি উড়িয়ে আমার জামা-কাপড় ও শরীর হয়তো একাকার করে ফেলেছে। অথচ আমি সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তখনই অনুমতি দিতেন। শুধুমাত্র তাঁকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যেই আমি এমনটি করেছি। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আমার এ দুরবস্থা দেখে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? আমাকে খবর দেননি কেন, আমি নিজেই গিয়ে দেখা করে আসতাম। বলেছি, আপনার নিকট আমারই আসা উচিত। কারণ জ্ঞান এসে গ্রহণ করার বস্তু, গিয়ে দেয়ার বস্তু নয়। তারপর তাঁকে আমি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি।"

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ইবন আব্বাস ছিলেন বিনয়ী। তিনি জ্ঞানীদের উপযুক্ত কদরও করতেন। এ প্রসংগে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিন কাতিবে ওহী ও

বিচার, ফিকাহ, কিরায়াত ও ফারায়েজ শাস্ত্রে মদীনাবাসী পণ্ডিতদের নেতা যায়িদ বিন সাবিত (রা) তাঁর বাহনের পিঠে আরোহণ করবেন, এমন সময় হাশেমী যুবক আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস মনিবের সামনে দাসের দাঁড়াবার ভংগিতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বাহনের লাগাম ও জিনটি ধরে তাঁকে আরোহণ করতে সাহায্য করলেন। যায়িদ (রা) তাঁকে বললেন, 'রাসূলের (সা) চাচাতো ভাই, এ আপনি কি করছেন, ছেড়ে দিন।' ইবন আব্বাস বললেন, 'আমাদের উলামা ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে এরূপ আচরণ করার জন্যই আমরা আদিষ্ট হয়েছি।' যায়িদ (রা) বললেন, 'আপনার একটি হাত বাড়িয়ে দিন।' তিনি একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে যায়িদ (রা) ঝুঁকে পড়ে তাতে চুমু খেলেন এবং বললেন, 'আমাদের নবী-পরিবারের লোকদের সাথে এরূপ আচরণ করার জন্যও আমরা আদিষ্ট হয়েছি।'

জ্ঞান অন্বেষণে হযরত ইবন আব্বাসের অভ্যাস, একাগ্রতা কর্মপদ্ধতি দেখে সে যুগের বড় বড় জ্ঞানী ও মনীষীরা চরম বিস্ময়বোধ করেছেন। 'মাসরুক ইবনুল আজদা'— একজন শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী, বলেন, "আমি যখন ইবন আব্বাসকে দেখলাম, বললাম, 'সুন্দরতম ব্যক্তি।' যখন তিনি কথা বললেন, বললাম, 'সর্বোত্তম প্রাঞ্জলভাষী' এবং যখন তিনি আলোচনা করলেন, বললাম, 'সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।"

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে যখন তিনি কিছুটা আত্মতৃপ্তি অনুভব করলেন তখন মানুষকে শিক্ষাদানের ব্রত কাঁধে তুলে নিলেন। আর তখন থেকেই তাঁর বাড়ীটি একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। যে অর্থে আজ আমরা বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি ব্যবহার করে থাকি সে অর্থে তার বাড়ীটিকে বিশ্ববিদ্যালয় বললে অত্যুক্তি হয়না। তবে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ইবন আব্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যে পার্থক্য এখানে যে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকেন বহু শিক্ষক আর সেখানে ছিলেন একজন শিক্ষক। তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ইবন আব্বাসের এক সংগী বর্ণনা করেন, 'আমি ইবন আব্বাসের এমন একটি মাহফিল দেখেছি যা গোটা কুরাইশ গোত্রের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। দেখলাম তাঁর বাড়ীর সম্মুখের রাস্তাটি লোকে লোকারণ্য। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বাড়ীর দরজায় মানুষের প্রচণ্ড ভীড়ের কথা জানালাম। তিনি অজুর জন্য পানি আনালেন। অজু করলেন। তারপর বসে বললেন : 'তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষমান লোকদের বল, যারা কুরআন ও কিরায়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাও, ভেতরে যাও।' আমি বেরিয়ে গিয়ে তাদেরকে একথা বললাম। বলার পর এত বিপুল সংখ্যক লোক ভেতরে প্রবেশ করল যে, কক্ষটি এমনকি সম্পূর্ণ বাড়ীটি পূর্ণ হয়ে গেল। তারা যা কিছু জানতে চাইলো তিনি তাদেরকে অবহিত করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের অপেক্ষমান ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও।' তারা চলে গেল।

অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, 'বাইরে গিয়ে বল, যারা কুরআনের তাফসীর ও তাবীল সম্পর্কে জানতে চাও, ভেতরে যাও।' আমি বেরিয়ে গিয়ে তাদেরকে একথা বললাম। বলার পর লোকে ঘর ভরে গেল। তাদের সব জিজ্ঞাসারই তিনি জবাব দিলেন এবং অতিরিক্ত অনেক কিছুই অবহিত করলেন। তারপর বললেন, 'তোমাদের

অপেক্ষমান ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও।' তারা বেরিয়ে গেল।

তিনি আমাকে আবার বললেন, 'তুমি বাইরে গিয়ে যারা হালাল, হারাম ও ফিকাহ সম্পর্কে জানতে চায় তাদেরকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' আমি বেরিয়ে গিয়ে তাদেরকে পাঠালাম। তাদের সংখ্যাও এত ছিল যে ঘরটি সম্পূর্ণরূপে ভরে গেল। তাদের সকল জিজ্ঞাসার জবাব দানের পর তাদেরকে পরবর্তী লোকদের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে বললেন। তারা চলে গেল।

তিনি আমাকে আবার পাঠালেন এবং ফারায়েজ ও তৎসংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদেরকে আহ্বান জানালেন। এবারও ঘরটি ভরে গেল। তাদের সকল জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক জবাব দানের পর পরবর্তী লোকদের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে বললেন। তারা চলে গেল। তিনি আমাকে আবার পাঠালেন। বললেন, 'যারা আরবী ভাষা, কবিতা এবং আরবদের বিস্ময়কর সাহিত্য সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক তাদেরকে পাঠিয়ে দাও।' আমি তাদেরকে পাঠালাম। এবারো ঘর ভরে গেল। তিনি তাদের সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে তুষ্ট করে বিদায় দিলেন। বর্ণনাকারী মন্তব্য করেন, 'সমগ্র কুরাইশ গোত্রের গৌরব ও গর্বের জন্য এই একটিমাত্র সমাবেশই যথেষ্ট।'

এমন ভীড়ের কারণেই ইবন আব্বাস পরবর্তীকালে একেকটি বিষয়ের জন্য সপ্তাহের একটি দিন নির্ধারণ করেছিলেন। ফিকাহ্, মাগাযী, কবিতা, প্রাচীন আরবের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিনে তিনি আলোচনা করতেন। তাঁর এসব আলোচনার মজলিসে যত বড় জ্ঞানীই উপস্থিত হতেন না কেন, তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরতেন।

হযরত ইবন আব্বাস তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির কল্যাণে অল্পবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও খিলাফতে রাশেদার মজলিসে শূরার সদস্য হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন। হযরত উমার (রা) কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে প্রবীণ ও বিদ্বান সাহাবীদের আহ্বান জানাতেন। সেই সাথে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকেও ডেকে পাঠাতেন। তিনি উপস্থিত হলে হযরত উমার তাঁর যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে বলতেন, 'আমরা এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি, তুমি ও তোমার মত আর যারা আছ সমাধান বের কর।'

একবার প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মজলিসে হযরত উমার অন্যদের তুলনায় আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকে একটু বেশী গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিলেন। তখন আবদুল্লাহ একজন যুবক। এ ব্যাপারে তিনি প্রবীণ সাহাবীদের সমালোচনার সম্মুখীন হন। কেউ কেউ বলেন, 'আমাদেরও তো তার বয়সী ছেলে ও নাতিরা রয়েছে, আমরাও তো তাদেরকে নিয়ে আসতে পারি।' হযরত উমার তখন কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করে আবদুল্লাহকে পরীক্ষা করেন। সে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। তখন উমার বলেন, 'আবদুল্লাহ তো বৃদ্ধদের মত যুবক। তার আছে একটি জিজ্ঞাসু যবান ও সচেতন অন্তঃকরণ।'

হিশাম ইবন উরওয়া তাঁর পিতা উরওয়াকে ইবন আব্বাসের জ্ঞানের গভীরতা ও তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'ইবন আব্বাসের তুল্য জ্ঞানী লোক আমার নযরে পড়েনি।'

আমর ইবন হাবশী বলেন, "আমি ইবন উমারকে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি ইবন আব্বাসের কাছে যাও এবং তাকেও জিজ্ঞেস কর। কারণ মুহাম্মাদের (সা) ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের যাঁরা অবশিষ্ট আছেন তাঁদের মধ্যে তিনিই অধিক জ্ঞানী।"

তাফসীর শাস্ত্র ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়সমূহে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের মূলে ছিল প্রথমত তাঁর রাসূলে করীমের (সা) সান্নিধ্য লাভ ও সেবার সুযোগ। দ্বিতীয়ত তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আ। তৃতীয়তঃ জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর অপরিসীম আগ্রহ এবং অক্লান্ত চেষ্টা সাধনা।

যায়িদ ইবন সাবিত মারা গেলে হযরত আবু হুরাইরা মন্তব্য করেছিলেন 'এই উম্মাতের বিজ্ঞ আলিম মৃত্যুবরণ করলেন এবং আশা করি আল্লাহতা'আলা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করবেন।'

হযরত ইবন আব্বাস বিশিষ্ট ছাত্র ও ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের সাথে সাথে সাধারণ লোকদের সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। মাঝে মাঝে বিশেষ মাহফিলের মাধ্যমে তিনি জনসাধারণকে ওয়াজ-নসীহত করতেন।

নিজে না করে অন্যকে করতে বলেন, ইবন আব্বাস এ ধরনের লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন দিনে রোযাদার ও রাতে ইবাদাতগোযার। আবদুল্লাহ ইবন মুলাইকা বলেন "একবার আমি ইবন আব্বাসের সাথে মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত সফর করলাম। বিশ্রামের জন্য যখনই কোথাও তাঁবু গেড়েছি, রাতের একটি বিশেষ অংশ তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন। অথচ অন্য সফরসংগীরা তখন ক্লান্তি ও শ্রান্তিতে গভীর ঘুমে অচেতন। একদিন রাত্রে একাগ্রচিত্তে তাঁকে আমি পাঠ করতে শুনলাম ঃ

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ - ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ (سورة ق : ١٩)

'এবং মৃত্যুর বিকার সত্যভাবেই সমুপস্থিত। এ হচ্ছে তা-ই যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে।' (ক্বাফ ঃ ১৯)

বারবার তিনি এ আয়াতটি আওড়াচ্ছেন আর কাঁদছেন। সুবহে সাদিক পর্যন্ত তিনি এভাবে কাটিয়ে দিলেন।"

৬৮ হিজরী মুতাবিক ৬৮৬/৮৮ খ্রীস্টাব্দে তায়েফ নগরে তিনি ইনতিকাল করেন। ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল একাত্তর বছর। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। তায়েফ নগরে 'মসজিদে ইবন আব্বাস' নামক বিশাল মসজিদটি আজও তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে। এ মসজিদেরই পেছনের দিকে এক পাশে এ মহান সাহাবীর কবর। তাঁকে কবরে সমাহিত করার পর কুরআনের এ আয়াতটি পঠিত হয়েছিল ঃ

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - اِرْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ،
فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادَتِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ -(سورة الفجر: ٣٠)

'হে পরিতুষ্ট আত্মা! তুমি প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার বান্দাগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।' (আল-ফজর ঃ ২৭-৩০)

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)

রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করে আনন্দ পেতে চায়, যেমন তা অবতীর্ণ হয়েছে– সে যেন ইবন উম্মু আবদের পাঠের অনুসরণে কুরআন পাঠ করে।'

এটা সেই সময়ের কথা যখন তিনি একজন কিশোর মাত্র, তখনও যৌবনে পদার্পণ করেননি। কুরাইশ গোত্রের এক সর্দার 'উকবা ইবন আবু মু'ইতের একপাল ছাগল নিয়ে তিনি মক্কার গিরিপথগুলোতে চরিয়ে বেড়াতেন। লোকে তাঁকে 'ইবন উম্মু আবদ' বলে ডাকতো। তবে তাঁর নাম আবদুল্লাহ, পিতার নাম মাসউদ, কুনিয়াত আবু আবদির রহমান এবং মাতার নাম উম্মু আবদ।

তাঁর গোত্রে যে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটেছে, সে সম্পর্কে নানা খবর এ কিশোর ছেলে সবসময় শুনতেন। তবে অল্প বয়স এবং বেশীরভাগ সময় মক্কার সমাজ জীবন থেকে দূরে অবস্থানের কারণে সে সম্পর্কে তিনি গুরুত্ব দিতেন না। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন সকালে উঠে 'উকবার ছাগলের পাল নিয়ে বের হয়ে যেতেন আর সন্ধ্যায় ফিরতেন।

একদিন এ কিশোর ছেলেটি দেখতে পেলেন, দু'জন বয়স্ক লোক, যাদের চেহারায় আত্মমর্যাদার ছাপ বিরাজমান, দূর থেকে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। তাঁরা ছিলেন এত পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত যে, তাঁদের ঠোঁট ও গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। নিকটে এসে লোক দু'টি সালাম জানিয়ে বললেন, 'বৎস! এ ছাগলগুলি থেকে কিছু দুধ দুইয়ে আমাদেরকে দাও। আমরা পান করে পিপাসা নিবৃত্ত করি এবং আমাদের শুকনা গলা একটু ভিজিয়ে নেই।'

ছেলেটি বললেন ঃ 'এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। ছাগলগুলি তো আমার নয়। আমি এগুলির রাখাল ও আমানতদার মাত্র।' লোক দু'টি তার কথায় অসন্তুষ্ট হলেন না, বরং তাদের মুখ মণ্ডলে এক উৎফুল্লতার ছাপ ফুটে উঠলো। তাদের একজন আবার বললেন ঃ 'তাহলে এমন একটি ছাগী আমাকে দাও যা এখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি।' ছেলেটি নিকটেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট্ট ছাগীর দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। লোকটি এগিয়ে গিয়ে ছাগীটি ধরে ফেলেন এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে হাত দিয়ে ধরে তার ওলান মলতে লাগলেন। অবাক বিস্ময়ে ছেলেটি এ দৃশ্য দেখে মনে মনে বললেন ঃ 'কখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি এমন ছোট ছাগী কি দুধ দেয়? কিন্তু কি আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাগীর ওলানটি ফুলে উঠে এবং প্রচুর পরিমাণ দুধ বের হতে থাকে। দ্বিতীয় লোকটি গর্তবিশিষ্ট পাথর উঠিয়ে নিয়ে বাঁটের নীচে ধরে তাতে দুধ ভর্তি করেন। তারপর তাঁরা উভয়ে পান করেন এবং ছেলেটিকেও তাদের সাথে পান করালেন। ইবন মাসউদ বলেন ঃ আমি যা দেখছিলাম তা সবই আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। আমরা সবাই যখন পরিতৃপ্ত হলাম তখন সেই পুণ্যবান লোকটি ছাগীর ওলানটি লক্ষ্য করে বল্লেন ঃ 'চুপসে যাও।' আর অমনি সেটি পূর্বের ন্যায় চুপসে গেল।

তারপর আমি সেই পুণ্যবান লোকটিকে অনুরোধ করলাম ঃ 'আপনি যে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন, তা আমাকে শিখিয়ে দিন।' বললেন, 'তুমি তো শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক।'

ইসলামের সাথে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের পরিচিতির এটাই হলো প্রথম কাহিনী। এ মহাপুণ্যবান ব্যক্তিটি আর কেউ নন, তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর তাঁর সংগীটি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)। কুরাইশদের অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য এ সময় তাঁরা মক্কার নির্জন গিরিপথ সমূহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাসূল (সা) ও তাঁর সংগীকে যেমন ছেলেটির ভালো লেগেছিল তেমনি তাঁদের কাছেও ছেলেটির আচরণ, আমানতদারী ও বিচক্ষণতা খুব চমৎকার মনে হয়েছিল। তাঁরা ছেলেটির মধ্যে কল্যাণ ও মংগলের শুভলক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

এ ঘটনার অল্পকিছুদিন পর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেকে রাসূলুল্লাহর (সা) একজন খাদিম হিসাবে উৎসর্গ করেন। রাসূল (সা)ও তাকে খাদিম হিসাবে নিয়োগ করেন। সেইদিন থেকে এ সৌভাগ্যবান বালক ছাগলের রাখালী থেকে সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠতম মানুষের খাদিমে পরিণত হন।

অবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ছায়ার মত নিজের মনিবকে অনুসরণ করেন। সফরে বা ইকামতে, গৃহের অভ্যন্তরে বা বাইরে সব সময় তিনি তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। রাসূল (সা) ঘুমালে তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন, গোসলের সময় পর্দা করতেন, বাইরে যাবার সময় জুতো পরিয়ে দিতেন, ঘরে প্রবেশের সময় জুতো খুলে দিতেন এবং তাঁর লাঠি ও মিসওয়াক বহন করতেন। তিনি যখন হুজরায় অবস্থান করতেন তখনও তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। রাসূল (সা) তাঁকে যখনই ইচ্ছা তাঁর কামরায় প্রবেশ এবং কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংকোচ না করে তাঁর সকল বিষয় অবগত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কারণে তাকে 'সাহিবুস সির' বা রাসূলুল্লাহর (সা) সকল গোপন বিষয়ের অধিকারী বলা হয়।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ নবী-গৃহে প্রতিপালিত হন, তাঁকে অনুসরণ করেন এবং তাঁরই মত আচার-আচরণ, ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন। এ কারণে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'হিদায়াত প্রাপ্তি, আচার-আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তিনিই হচ্ছেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উত্তম ব্যক্তি।'

ইবনে মাসউদ খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) শিক্ষালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাই সাহাবীদের মধ্যে যারা কুরআনের সবচেয়ে ভালো পাঠক, তার ভাব ও অর্থের সবচেয়ে বেশী সমঝদার এবং আল্লাহর আইন ও বিধি-বিধানের সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন।

একবার হযরত উমার (রা) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ 'আমীরুল মু'মিনীন! আমি কুফা থেকে এসেছি। সেখানে আমি দেখে এসেছি, এক ব্যক্তি নিজের স্মৃতি থেকেই মানুষকে কুরআন শিখাচ্ছেন।' একথা শুনে তিনি এত রাগান্বিত হলেন যে, সচরাচর তাঁকে তেমন রাগ করতে দেখা যায় না। তিনি উটের হাওদার অভ্যন্তরে রাগে ফুলতে থাকেন। তারপর প্রশ্ন করেন– তোমার ধ্বংস হোক! কে সে লোকটি?'

– 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ।'

জ্বলন্ত আগুনে পানি ঢেলে দিলে যে অবস্থা হয়, ইবন মাসউদের নাম শুনে তাঁরও সে অবস্থা হলো। তার রাগ পড়ে গেল। তিনি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলেন। তারপর বললেন ঃ তোমার ধ্বংস হোক! আল্লাহর কসম, এ কাজের জন্য তাঁর চেয়ে অধিক যোগ্য কোন ব্যক্তি বেঁচে আছে কিনা আমি জানিনা। এ ব্যাপারে তোমাকে আমি একটি ঘটনা বলছি।' উমার (রা) বলতে লাগলেন– "একদিন রাতের বেলা রাসূল (সা) আবু বকরের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। তাঁরা মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। আমিও তাঁদের সাথে ছিলাম। কিছু সময় পর রাসূল (সা) বের হলেন, আমরাও তাঁর সাথে বেরুলাম। বেরিয়েই আমরা দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি মসজিদে নামাযে দাঁড়িয়ে; কিন্তু আমরা তাঁকে চিনতে পারলাম না। রাসূল (সা) দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করে আনন্দ পেতে চায়, যেমন তা অবতীর্ণ হয়েছে, সে যেন ইবন উম্মু আবদের পাঠের অনুরূপ কুরআন পাঠ করে।' এরপর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বসে দু'আ শুরু করলেন। রাসূল (সা) আস্তে আস্তে তাঁকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন ঃ 'চাও, দেওয়া হবে, চাও, দেওয়া হবে।'

উমার (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম, আমি আগামীকাল প্রত্যুষেই আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের নিকট গিয়ে তাঁর দু'আ সম্পর্কে রাসূলের (সা) মন্তব্যের সুসংবাদটি তাঁকে দিব। সকাল সকাল আমি তার কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমার আগেই তাঁর কাছে পৌঁছে গেছেন এবং তাঁকে সুসংবাদটি দিয়ে ফেলেছেন। সত্যিই যখনই কোন সৎকাজে আবু বকরের সাথে আমি প্রতিযোগিতা করেছি তখন তিনিই প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয়ী হয়েছেন।

আল্লাহর কিতাব কুরআনের জ্ঞানে তিনি কতখানি পারদর্শী ছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর নিজের একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই সেই আল্লাহর কসম! আল্লাহর কিতাবের এমন কোন একটি আয়াত নাযিল হয়নি যে সম্পর্কে আমি জানিনা যে, তা কোথায় নাযিল হয়েছে এবং কি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার থেকে অধিক পারদর্শী কোন ব্যক্তির কথা আমি যদি জানতে পারি এবং তাঁর কাছে পৌঁছা সম্ভব হয়, তাহলে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হই।'

নিজের সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যে কথাটি বলেছেন তাতে অতিরঞ্জন নেই। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা পাঠকদের কাছে তুলে ধরা সমীচীন বলে মনে করি। একবার হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কোন এক সফরে রাত্রিবেলা একটি অপরিচিত কাফিলার সাক্ষাত লাভ করেন। রাতের ঘোর অন্ধকারে কাফিলার কোন লোকজনকে দেখা যাচ্ছিল না। ঘটনাক্রমে সেই কাফিলায় আবদুল্লাহ ইবন মাসউদও ছিলেন; কিন্তু উমার (রা) তা জানতেন না। উমরা (রা) একজন লোককে তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, কাফিলা কোথা থেকে আসছে? অন্য কাফিলা থেকে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ জবাব দিলেন–

– 'আমীক উপত্যকা থেকে।'

– 'কোথায় যাচ্ছে?'

– 'ইলাল বাইতিল আতীক– বাইতুল আতীকে (অর্থাৎ কাবা শরীফে)।' জবাব শুনে উমার (রা) বললেন ঃ 'নিশ্চয় তাদের মধ্যে কোন আলিম ব্যক্তি আছেন।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'কুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত কোনটি?'

– 'আল্লাহু লাইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম, লা তাখুজুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম– সেই চিরন্তন চিরঞ্জীব সত্তা আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তন্দ্রাও তাকে স্পর্শ করেনা এবং নিদ্রাও তাঁকে পায়না।'

– 'সর্বাধিক ন্যায়-নীতির ভাব প্রকাশক আয়াত কোনটি?'

– ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ইতায়িজিল কুরবা– আল্লাহ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, পরোপকার এবং নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আবার প্রশ্ন হলো ঃ

– 'সর্বাধিক ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত কোনটি?'

– 'ফামাই ইয়া'মাল মিসকালা জাররাতিন খাইরাই য়ারাহ্, ওয়ামাই ইয়া'মাল মিসকালা জার্‌রাতিন শাররাই য়ারাহ'– 'যে ব্যক্তি এক বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ করবে সে তার বিনিময় লাভ করবে, তেমনিভাবে যে ব্যক্তি এক বিন্দু পরিমাণ অসৎকাজ করবে তার বিনিময়ও সে লাভ করবে।'

– 'সর্বাধিক ভীতিপ্রদ আয়াত কোনটি?'

– 'লাইসা বিআমানিয়্যিকুম ওয়ালা আমানিয়্যি আহলিল কিতাবি মান ই'মাল সূআন ইউজযা বিহি ওয়ালা ইয়াজিদ লাহু মিন দুনিল্লাহ ওয়ালিয়্যান ওয়ালা নাসীরান'– 'না তোমাদের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী, আর না আহলি কিতাবদের কামনা-বাসনা অনুযায়ী সবকিছু হবে। যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে তাঁকে তাঁর প্রতিফল ভোগ করতে হবে। আর আল্লাহ ছাড়া তার জন্য আর কোন অভিভাবকও পাবেনা এবং কোন সাহায্যকারীও না।'

'সর্বাধিক আশার সঞ্চারকারী আয়াত কোনটি?'

– 'কুল ইয়া 'ইবাদিল্লাজীনা আসরাফু 'আলা আনফুসিহিম লা-তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুজ্জুনুবা জামীয়া। ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহীম'– 'হে নবী আপনি বলুন। হে আমার বান্দারা, যারা নিজের ওপর বাড়াবাড়ি করছো, আল্লাহর রহমত ও করুণা থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ সব পাপই ক্ষমা করে দেবেন। তিনিই তো গাফুরুর রাহীম।'

– 'আচ্ছা আপনাদের মাঝে কি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ আছে?'

– হ্যাঁ।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কেবল একজন ভালো ক্বারী, আলিম, আবিদ ও যাহিদই ছিলেন না, সেইসাথে তিনি ছিলেন একজন কর্মঠ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং কঠিন বিপদ মুহূর্তে অগ্রগামী একজন মুজাহিদ। তাঁর জন্য এ গৌরবটুকুই যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহর

(সা) পর তিনিই ভূ-পৃষ্ঠের প্রথম মুসলিম যিনি প্রকাশ্যে কুরাইশদের মাঝে কুরআন পাঠ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীরা একদিন মক্কায় একত্রিত হলেন। তাঁরা তখন সংখ্যায় অল্প ও দুর্বল। নিজেদের মধ্যে তাঁরা বলাবলি করলেন, 'আল্লাহর শপথ, প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে কুরাইশদেরকে কখনও শুনানো হয়নি। তাদেরকে কুরআন শোনাতে পারে এমন কে আছে?'

আবদুল্লাহ্ উবন মাসউদ বললেন ঃ 'আমিই তাদেরকে শোনাবো।' অন্যরা বললেন, 'তোমার ব্যাপারে আমাদের ভয় হচ্ছে। আমরা এখন এক ব্যক্তিকে চাই, যার লোকজন আছে, কুরাইশরা তার ওপর কোনরূপ অত্যাচার করতে চাইলে তারা তখন বাধা দিতে পারবে।' ইবন মাসউদ বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন। আল্লাহ আমাকে হিফাজত করবেন।' একথা বলে তিনি মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন এবং মধ্যাহ্নের কিছু আগে মাকামে ইবরাহীমে এসে পৌঁছলেন। তিনি মাকামে ইবরাহীমের নিকট দাঁড়িয়ে জোরে জোরে তিলাওয়াত শুরু করলেন ঃ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আররাহমানু আল্লামাল কুরআন, খালাকাল ইনসানা আল্লামাহুল বায়ান.......।'

তিনি তিলাওয়াত করে যেতে লাগলেন। কুরাইশরা শুনে ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করলো। তারপর একে অপরকে প্রশ্ন করলো, 'ইবন উম্মু আবদ কি বলে? তার সর্বনাশ হোক! মুহাম্মাদ যা বলে তাই তো সে পাঠ করছে।' তারা সবাই উঠে তাঁর দিকে ধেয়ে গেল এবং তাঁর মুখে নির্দয়ভাবে মারতে লাগলো। এ অবস্থায় আল্লাহ যতটুকু চাইলেন ততটুকু তিনি তিলাওয়াত করলেন। তারপর রক্তাক্ত দেহে সংগীদের কাছে ফিরে এলেন। তাঁরা বললেন, 'আমরা এরই আশংকা করছিলাম।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহর শত্রুরা এখন আমার কাছে অতি তুচ্ছ যা আগে ছিলনা। আপনারা চাইলে আগামী কালও আমি এমনটি করতে পারি।' তাঁরা বললেন, 'না, যথেষ্ট হয়েছে। তাদের অপছন্দনীয় কথা তুমি তাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছ।' হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ইসলাম গ্রহণ করার পর কুরাইশদের অত্যাচারের শিকারে পরিণত হন। বাধ্য হয়ে দুইবার হাবশায় হিজরাত করেন। অবশেষে মাদীনায় চিরদিনের জন্য হিজরাত করে চলে যান। মদীনায় প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী হযরত মুয়াজ ইবন জাবালের অতিথি হন। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার পর তাঁদের দু'জনের মধ্যে দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন এবং তাঁর বসবাসের জন্য মসজিদে নববীর পাশে একখণ্ড ভূমি দান করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে দু'জন আনসারী যুবক ইসলামের কট্টর দুশমন আবু জাহলকে হত্যা করে ময়দানে ফেলে আসে। যুদ্ধশেষে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'কেউ যেয়ে আবু জাহলের অবস্থা একটু দেখে আস তো।' আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ দৌড়ে চলে গেলেন। আবু জাহলের প্রাণস্পন্দন তখনও থেমে যায়নি। আবদুল্লাহ্ তার দাড়ি সজোরে মুট করে ধরে বললেন ঃ 'বল, তুই আবু জাহল কিনা।'

– 'আমার পাপের বিরুদ্ধে।'

– 'আপনার চাওয়ার কিছু আছে কি?'

– 'আমার রবের রহমত বা করুণা।'

– 'বহু বছর যাবত আপনার ভাতা নিচ্ছেন না, তাকি আবার দেয়ার নির্দেশ দেব?'

– 'আমার কোন প্রয়োজন নেই।'

– 'আপনার মৃত্যুর পর আপনার কন্যাদের প্রয়োজনে আসবে।'

– 'আপনি কি আমার কন্যাদের দারিদ্রের ব্যাপারে ভীত হচ্ছেন? আমি তো তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি, তারা যেন প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করে। কারণ আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা আল-ওয়াকিয়া পাঠ করবে, কখনও দারিদ্র তাকে স্পর্শ করবে না।'

দিনশেষে রাত্রি নেমে এলো, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ তাঁর রফীকে 'আলা—শ্রেষ্ঠতম বন্ধুর সাথে মিলিত হলেন। খলীফা উসমান তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং হযরত উসমান ইবন মাজউনের (রা) পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আল-আরকাম ইবন আবিল আরকাম (রা)

নাম আবু আবদিল্লাহ্ আল আরকাম। পিতা আবুল আরকাম আবদু মান্নাফ, মাতা উমাইমা।

হযরত আরকামের খান্দান জাহিলী যুগের আরবে বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তাঁর দাদা আবু জুনদুব আসাদ ইবন আবদিল্লাহ তার যুগে মক্কার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

হযরত আরকাম এগারো অথবা বারো জনের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল-বিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর ইসলাম গ্রহণের পর উসমান ইবন আফ্ফান, তালহা ইবন উবাইদিল্লাহ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তাঁরা সকলে সাথে সাথে এ দাওয়াত কবুল করেন। পরদিন তিনি উসমান ইবন মাজউন, আবু উবাইদা ইবনুল জার্রাহ্, আবদুর রহমান ইবন আউফ, আবু সালামা ইবন আবদিল আসাদ এবং আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন। তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আরকাম যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সহ সকল মুসলমানের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। মক্কার পৌত্তলিক শক্তি চাচ্ছিল, শক্তি অর্জনের পূর্বেই এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে। কিন্তু ইসলাম তো নিশ্চিহ্ন হওয়ার জন্য আসেনি। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আরকামের বাড়ীটি ইসলামের গোপন ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ইসলামের প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলেই ঘুরেফিরে 'দারুল আরকাম' বা আরকামের বাড়ীর কথাটি আমাদের সামনে আসে। ইসলামের দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ বাড়ীটির এক মহান ভূমিকা রয়েছে। রাসূল (সা) এ বাড়ীতে অবস্থান নিয়ে কুরাইশদের নজর এড়িয়ে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তখন পর্যন্ত মুষ্টিমেয় যে ক'জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা এখানে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হতেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এখান থেকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এ ঐতিহাসিক বাড়ীতে বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সর্বশেষে যে ব্যক্তি এ বাড়ীতে ইসলামের ঘোষণা দেন, তিনি হলেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)। 'হায়াতুস সাহাবা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, মুসলমানদের সংখ্যা যখন ৩৮ জনে উন্নীত হলো, আবু বকর ও অন্যরা তখন রাসূলুল্লাহকে (সা) চাপ দিলেন প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। তাঁদের দাবীর মুখে রাসূল (সা) রাজী হলেন। তাঁরা আরকামের বাড়ী থেকে বেরিয়ে মসজিদে হারামে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী হযরত আবু বকর কা'বার চত্বরে উপস্থিত কুরাইশদের সম্বোধন করে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরতেই কুরাইশ গুণ্ডারা একযোগে আবু বকরের ওপর হামলা চালিয়ে আঘাত হানতে থাকে। নরাধম উতবা পায়ের জুতো খুলে হযরত আবু বকরকে জুতো-পেটা

করলো। আবু বকরের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়লো। আবু বকরের গোত্র বনু তাইম তাঁকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এলো। আবু বকর চেতনা ফিরে পেয়েই রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর মা উম্মুল খায়েরকে পাঠালেন উম্মুল জামিলের কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) খবর জানার জন্য। উম্মুল জামীল এসে চুপে চুপে খবর দিলেন, রাসূল (সা) নিরাপদে আছেন। অতঃপর রাতের অন্ধকারে তাঁরা তিনজন গোপনে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছেন। এখানে রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আর বরকতে হযরত আবু বকরের জননী উম্মুল খায়ের ইসলাম গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁরা এক মাস অবস্থান করেন। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ৪০ এ পৌঁছে যায়। যেদিন আবু বকর (রা) আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে মার খেয়েছিলেন, ঘটনাক্রমে সেদিনই হযরত হামযা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামপূর্ব যুগে রাসূলুল্লাহর (সা) নেতৃত্বে মক্কায় 'হিলফুল ফুজুল' নামে যে কল্যাণ সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আরকাম ছিলেন তার অন্যতম সদস্য।

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে হিজরাতের আদেশ হলে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে হযরত আরকাম মদীনায় পৌঁছেন। হযরত আবু তালহা ইবন সাহলের সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য রাসূল (সা) তাঁকে মদীনার বনু যুরাইক মহল্লায় এক খণ্ড ভূমি দান করেন।

হক ও বাতিলের প্রথম সংঘর্ষ বদর-যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ যুদ্ধে রাসূল (সা) তাঁকে একখানি তরবারি দান করেন। উহুদ, খন্দক, খাইবারসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে অংশগ্রহণ করে বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। রাসূল (সা) তাঁকে যাকাত আদায়কারী হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।

হিজরী ৫৩/৫৫ সনে ৮৩ বছর বয়সে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে অসীয়াত করে যান, হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস তাঁর জানাযার নামায পড়াবেন। কিন্তু হযরত সা'দ মদীনা থেকে একটু দূরে 'আকীক' নামক স্থানে ছিলেন। তাঁর উপস্থিত হতে একটু বিলম্ব হলে মদীনার তৎকালীন ওয়ালী মারওয়ান ইবন হিকাম প্রতিবাদ করে বলেন, এক ব্যক্তির প্রতীক্ষায় জানাযা কতক্ষণ পড়ে থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলেন, নিজেই এগিয়ে গিয়ে জানাযার ইমামতি শুরু করে দেন। কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইবন আরকাম অনুমতি দিলেন না। বনী মাখযুম গোত্রও উবাইদুল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনে এগিয়ে আসে। বাকবিতণ্ডা চলছে, এমন সময় হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) এসে উপস্থিত হলেন। তিনি জানাযার নামায পড়ালেন এবং লাশ মদীনার বাকী গোরস্থানে দাফন করা হলো।

তাকওয়া, দ্বীনদারী, দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসের প্রতি অনীহা ও সততা ছিল হযরত আরকামের চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইবাদাত ও শববিদারীর প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। একবার তিনি বাইতুল মা[illegible]স সফরের ইচ্ছা করলেন। সফরের প্রস্তুতি শেষ করে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এলেন বিদায় নিতে। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, না অন্য কোন প্রয়োজনে? উত্তরে আরকাম বললেন, 'আমার মা-বাবা, আপনার প্রতি কুরবান হোক, অন্য কোন প্রয়োজন নেই। শুধু বাইতুল মাকদাসে

নামায আদায় করতে চাই।' ইরশাদ হলো, 'আমার এ মসজিদের একটি নামায একমাত্র মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদের হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম।' একথা শোনামাত্র হযরত আরকাম বসে পড়েন এবং সফরের ইরাদা বাতিল করেন।

হযরত আরকামের মূল পেশা ছিল ব্যবসা বাণিজ্য। হিজরাতের পর তিনি মদীনায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। মক্কার ঐতিহাসিক বাড়ীটি তিনি সন্তান-সন্ততিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে যান। দীর্ঘ দিন যাবত এ বাড়ীটি ভ্রমণকারীদের দর্শনস্থল হিসাবে বিবেচিত হতো।

হযররত আরকামের এ বাড়ীটি ছিল সাফা পাহাড়ের পাদদেশে। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ' করার সময় ঠিক বাড়িটির দরজার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে হতো। আব্বাসী খলিফা মানসুরের সময়–১৪০ হিজরী পর্যন্ত বাড়ীটি অবিকৃত অবস্থায় ছিল। কিন্তু এ বছরই মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসান মদীনায় আব্বাসী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হযরত আরকামের পৌত্র আবদুল্লাহ ইবন 'উসমানও ছিলেন এ বিদ্রোহের একজন সমর্থক ও সহযোগী। এ কারণে খলীফা মানসুরের নির্দেশে মদীনার তৎকালীন ওয়ালী তাঁকে গ্রেফতার করেন। খলীফা মানসুর তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী শিহাব উদ্দীন ইবন আবদে বরকে পাঠালেন আবদুল্লাহর নিকট এই বাড়ীটি ক্রয়ের প্রস্তাব দিয়ে। আবদুল্লাহ প্রথমতঃ বিক্রী করতে অস্বীকার করেছিলেন; কিন্তু কয়েদ থেকে মুক্তির শর্তে এবং উচ্চ মূল্যের লোভে শেষ পর্যন্ত বিক্রী করতে সম্মত হন। মানসুর সতেরো হাজার দীনারের বিনিময়ে এ মহান, কল্যাণময় ঐতিহাসিক বাড়ীটির মালিকানা লাভ করেন। বাড়ীটির অন্য শরীকরা প্রথমতঃ রাজী না হলেও আস্তে আস্তে তাঁরাও রাজী হয়ে যান।

খলীফা মানসুরের পর খলীফা মাহদী এ বাড়ীটি তাঁর প্রিয়তমা দাসী খায়যুরানকে দান করেন। তিনি বাড়ীটির পুরানো কাঠামো ভেঙ্গে ফেলে সম্পূর্ণ নতুন অট্টালিকা তৈরী করেন। এভাবে যুগে যুগে এ বাড়ীটির সংস্কার সাধিত হয় এবং ধীরে ধীরে এই মহান গৃহটি যেখানে ইসলামের সংকট পর্বে আল্লাহর রাসূল (সা) ও মুসলমানরা আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অহী ও ফিরিশতাদের অবতরণ স্থল ছিল, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

উহুদ, খন্দক, হুদাইবিয়া, খাইবারসহ মক্কা বিজয়েও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথী ছিলেন। হুনাইন যুদ্ধে কাফিরদের অতর্কিত আক্রমণে দশ হাজারের মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। মাত্র আশিজন যোদ্ধা নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে রাসূলুল্লাহর (সা) চতুষ্পার্শে অটল থাকেন। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ সেই আশিজনের একজন। এ যুদ্ধে রাসূল (সা) মুশরিক বাহিনীকে লক্ষ্য করে যে এক মুঠো ধূলো নিক্ষেপ করেছিলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তা তুলে দিয়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর দীর্ঘদিন যাবত সকল কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকেন। তবে হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে হিজরী ১৫ সনে তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ইয়ারমুক যুদ্ধে বেরিয়ে পড়েন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন।

হিজরী ২০ সনে খলীফা উমার (রা) তাঁকে কুফার কাজী নিয়োগ করেন। কাজীর দায়িত্ব ছাড়াও বায়তুল মাল, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কুফার ওয়ালীর উযীরের দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হয়।

পুরো দশ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এতগুলি দায়িত্ব তিনি পালন করেন। এ দীর্ঘ সময়ে খলীফা উমারের (রা) শাহাদাত বরণ, হযরত উসমানের খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণসহ কুফার ওয়ালীরও রদবদল হয়েছে, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন মাসউদ স্বীয় পদে বহাল থাকেন। খলীফা উসমানের খিলাফতের শেষ পর্বে আবদুল্লাহকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তিনি সংগীসাথী ও পরিবার পরিজনসহ কুফা থেকে হিজাযের দিকে যাত্রা করেন। পথে মরুভূমিতে 'রাবজা' নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু যার গিফার (রা) সেখানে অন্তিম শয্যায়। তাঁর পৌছার অল্পক্ষণ পরেই আবু যার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন এবং কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেন। সেখান থেকে তিনি মক্কা চলে যান এবং উমরা আদায় করে মদীনায় পৌছেন। বাকী জীবন মদীনায় চুপচাপ কাটিয়ে দেন।

হিজরী ৩২ সনে আবদুল্লাহর বয়স যখন ষাট বছরের ওপরে, হঠাৎ একদিন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগলো, 'আল্লাহ্ আমাকে আপনার জানাযা থেকে বঞ্চিত না করুন। গতরাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, রাসূল (সা) একটি মিম্বরের ওপর আর আপনি তাঁর সামনে। তিনি আপনাকে বলছেন, 'ইবন মাসউদ, আমার পরে তোমাকে ভীষণ কষ্ট দেওয়া হয়েছে। এস, আমার কাছে চলে এস। এ স্বপ্ন সত্যে পরিণত হল। এর অল্প কিছুদিন পরেই তিনি রোগে আক্রান্ত হন এবং সেই রোগেই মারা যান।

হযরত উসমানের (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি যখন অন্তিম রোগ শয্যায়, তখন উসমান (রা) একদিন তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ

– 'আপনার অভিযোগ কিসের বিরুদ্ধে?'

নামায আদায় করতে চাই।' ইরশাদ হলো, 'আমার এ মসজিদের একটি নামায একমাত্র মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদের হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম।' একথা শোনামাত্র হযরত আরকাম বসে পড়েন এবং সফরের ইরাদা বাতিল করেন।

হযরত আরকামের মূল পেশা ছিল ব্যবসা বাণিজ্য। হিজরাতের পর তিনি মদীনায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। মক্কার ঐতিহাসিক বাড়ীটি তিনি সন্তান-সন্ততিদের জন্য ওয়াক্ফ করে যান। দীর্ঘ দিন যাবত এ বাড়ীটি ভ্রমণকারীদের দর্শনস্থল হিসাবে বিবেচিত হতো।

হযররত আরকামের এ বাড়ীটি ছিল সাফা পাহাড়ের পাদদেশে। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ' করার সময় ঠিক বাড়িটির দরজার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে হতো। আব্বাসী খলিফা মানসুরের সময়-১৪০ হিজরী পর্যন্ত বাড়ীটি অবিকৃত অবস্থায় ছিল। কিন্তু এ বছরই মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসান মদীনায় আব্বাসী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হযরত আরকামের পৌত্র আবদুল্লাহ ইবন 'উসমানও ছিলেন এ বিদ্রোহের একজন সমর্থক ও সহযোগী। এ কারণে খলীফা মানসুরের নির্দেশে মদীনার তৎকালীন ওয়ালী তাঁকে গ্রেফতার করেন। খলীফা মানসুর তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী শিহাব উদ্দীন ইবন আবদে বরকে পাঠালেন আবদুল্লাহর নিকট এই বাড়ীটি ক্রয়ের প্রস্তাব দিয়ে। আবদুল্লাহ প্রথমতঃ বিক্রী করতে অস্বীকার করেছিলেন; কিন্তু কয়েদ থেকে মুক্তির শর্তে এবং উচ্চ মূল্যের লোভে শেষ পর্যন্ত বিক্রী করতে সম্মত হন। মানসুর সতেরো হাজার দীনারের বিনিময়ে এ মহান, কল্যাণময় ঐতিহাসিক বাড়ীটির মালিকানা লাভ করেন। বাড়ীটির অন্য শরীকরা প্রথমতঃ রাজী না হলেও আস্তে আস্তে তাঁরাও রাজী হয়ে যান।

খলীফা মানসুরের পর খলীফা মাহদী এ বাড়ীটি তাঁর প্রিয়তমা দাসী খায়যুরানকে দান করেন। তিনি বাড়ীটির পুরানো কাঠামো ভেঙ্গে ফেলে সম্পূর্ণ নতুন অট্টালিকা তৈরী করেন। এভাবে যুগে যুগে এ বাড়ীটির সংস্কার সাধিত হয় এবং ধীরে ধীরে এই মহান গৃহটি যেখানে ইসলামের সংকট পর্বে আল্লাহর রাসূল (সা) ও মুসলমানরা আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অহী ও ফিরিশতাদের অবতরণ স্থল ছিল, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আবু হুরাইরা আদ-দাওসী (রা)

আবু হুরাইরা, এ নামটি জানে না মুসলিম জাতির মধ্যে এমন কেউ কি আছে? ইসলামপূর্ব জাহিলী যুগে লোকে তাঁকে ডাকতো– 'আবদু শামস' বলে। পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলামের দিকে হিদায়াত দান করে তাঁর ওপর অনুগ্রহ করলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ দানের মাধ্যমে তাঁকে গৌরবান্বিত করলেন, রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নাম কি?' তিনি জবাব দিলেন, 'আবদু শামস (অরুণ দাস)।'

রাসূল (সা) বললেন, 'না আজ থেকে তোমার নাম আবদুর রহমান।'

আবু হুরাইরা (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার নামে কুরবান হোক। আমার নাম আজ থেকে– আবদুর রহমান-ই হবে।'

'আবু হুরাইরা' তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম। ছোট বেলায় একটি বিড়াল শাবকের সাথে তিনি সবসময় খেলতেন। তা দেখে সাথীরা তাঁর নাম দেন আবু হুরাইরা (বিড়াল শাবকওয়ালা)। আস্তে আস্তে এ নামেই তিনি সকলের মাঝে পরিচিত হন এবং তাঁর আসল নামটি ঢাকা পড়ে যায়। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যখন তাঁর সম্পর্ক গভীর হয় তখন মাঝে মাঝে তিনি আদর করে ডাকতেন 'আবু হিররিন'। তাই তিনি– আবু হুরাইরার পরিবর্তে– আবু হিররিন নামটিকেই প্রধান্য দেন। তিনি বলতেন ঃ আমার হাবীব আল্লাহর রাসূল আমাকে এ নামেই ডেকেছেন। তাছাড়া হিররুন পুং লিঙ্গ এবং হুরাইরা স্ত্রী লিঙ্গ।

আবু হুরাইরা ইসলামে দীক্ষিত হন প্রখ্যাত সাহাবী তুফায়িল ইবন আমর আদ-দাওসীর হাতে। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি স্বীয় দাওস গোত্রের সাথেই অবস্থান করতে থাকেন। ষষ্ঠ হিজরী সনে তাঁর গোত্রের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে তিনিও এলেন মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে। আমর ইবনুল গালাস বলেন, মদীনায় তাঁর প্রথম আগমন হয় খাইবার বিজয়ের বছর সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাসে।

মদীনা আসার পর দাওস গোত্রের এ যুবক নিরবচ্ছিনভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমত ও সাহচর্য অবলম্বন করেন। রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টা মসজিদেই অবস্থান করতে থাকেন। সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) কাছ থেকে তালীম ও তারবিয়াত লাভ করতেন এবং তাঁরই ইমামতিতে নামায আদায় করতেন। রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় তাঁর স্ত্রী বা সন্তান সন্ততি ছিল না। একমাত্র তাঁর বৃদ্ধা মা ছিলেন। তখনও তিনি পৌত্তলিকতার ওপর অটল। আবু হুরাইরা স্নেহময়ী মাকে সর্বদা দাওয়াত দিতেন, আর তিনি অস্বীকার করতেন। এতে তিনি গভীর ব্যথা ও দুঃখ অনুভব করতেন। একদিন তিনি মাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানালে তিনি নবী (সা) সম্পর্কে এমন কিছু অশ্রাব্য কথা বলেন যাতে আবু হুরাইরা ভীষণ মর্মাহত হন। কাঁদতে কাঁদতে তখনই রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন। রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাঁদছো কেন?'

তিনি বললেন, 'আমি সব সময় আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিই, আর তিনি অস্বীকার করেন। প্রতিদিনকার মত আজও আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম, তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন যে আমাকে ভীষণ পীড়া দিয়েছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আবু হুরাইরার মায়ের অন্তরটি ইসলামের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন।' রাসূল (সা) দু'আ করলেন।

আবু হুরাইরা বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার থেকে বাড়ীতে ফিরে গেলাম। দেখি ঘরের দরজাটি বন্ধ, তবে ভেতরে পানি পড়ার শব্দ শুনা যাচ্ছে। আমি ভেতরে প্রবেশ করতে যাব এমন সময় মা বললেন, 'আবু হুরাইরা, একটু অপেক্ষা কর' একথা বলে তিনি কাপড় ঠিকঠাক করে নিলেন। তারপর আমাকে ভেতরে ডাকলেন। আমি প্রবেশ করলাম। তখনই তিনি পাঠ করতে লাগলেন! "আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদুআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।"

আমি আবার রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ফিরে গেলাম। আনন্দে তখন আমি কাঁদছি, যেমন কিছুক্ষণ আগে দুঃখে কেঁদেছিলাম। বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সুসংবাদ! মহান আল্লাহ আপনার দু'আ কবুল করেছেন, তিনি আবু হুরাইরার মাকে হিদায়াত দান করেছেন, আবু হুরাইরার মা ইসলাম গ্রহণ করেছেন।'

আবু হুরাইরা রাসূলকে (সা) ভালোবাসতেন। সে ভালোবাসা ছিল গভীর। তিনি রাসূলের (সা) দিকে এক দু'বার মাত্র তাকিয়ে পরিতৃপ্ত হতেন না। তিনি বলতেন, 'রাসূল (সা) অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ও দীপ্তিমান কোন কিছু আমি দেখিনি। তাঁর চেহারায় যেন সূর্যের কিরণ ঝলমল করতে থাকে।'

তিনি নবীর (সা) সাহাবী হওয়ায় মর্যাদা লাভ করেছেন এবং তাঁর দ্বীনের অনুসারী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন, এজন্য তিনি সব সময় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। বলতেন, 'আবু হুরাইরাকে যিনি ইসলামের দিকে হিদায়াত দিয়েছেন, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর। আর সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আবু হুরাইরাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাহচর্য দান করে অনুগ্রহ করেছেন।'

আবু হুরাইরা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি যেমন নিবেদিত ছিলেন, তেমনি ছিলেন জ্ঞানের প্রতিও কুরবান। জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানচর্চা তাঁর অভ্যাস ও প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল। যায়িদ বিন সাবিত (রা) বলেন ঃ

একদিন আবু হুরাইরা, আমদের এক বন্ধু ও আমি মসজিদে আল্লাহর কাছে দু'আ করছিলাম। এমন সময় রাসূলকে (সা) আমরা দেখতে পেলাম। তিনি এগিয়ে এসে আমাদের মাঝখানে বসলেন। আমরা সবাই চুপ করে গেলাম। তিনি বললেন, 'তোমরা তোমাদের কাজ আবার শুরু কর।' আমি ও আমার বন্ধুটি আবু হুরাইরার আগেই আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম। রাসূল (সা) আমাদের দু'আর সাথে সাথে আমীন বললেন। তারপর আবু হুরাইরা দু'আ করলেন ঃ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই, আমার দু'বন্ধু যা কিছু চেয়েছে। আর সেইসাথে চাই এমন জ্ঞান যা কখনও ভুলে না যাই।' এবারও রাসূল (সা) আমীন

বললেন। আমরা দু'জনও বললাম, 'আমরাও চাই ভুলে না যাই এমন জ্ঞান।' রাসূল (সা) বললেন, 'দাওস গোত্রের এ লোকটি এক্ষেত্রে তোমাদের দু'জনকে হারিয়ে দিয়েছে।'

আবু হুরাইরা নিজের জন্য যেমন জ্ঞান ভালোবাসতেন, তেমনি অপরের জন্যও। ইতিহাসে এ সম্পর্কিত একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ আছে। একদিন তিনি মদীনার বাজারে গেলেন। সেখানে বেচা-কেনা, লেন-দেন ইত্যাদির মধ্যে মানুষের নিমগ্নতা দেখে বিস্মিত হলেন। থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওহে মদীনাবাসী, তোমরা দারুণভাবে বঞ্চিত।' লোকরা জিজ্ঞেস করলো, 'আবু হুরাইরা, আপনি আমাদের বঞ্চনার কি দেখলেন?'

তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহর (সা) মীরাস (উত্তরাধিকার) বন্টিত হচ্ছে, আর তোমরা এখানে বসে আছ? সেখানে গিয়ে তোমাদের নিজ নিজ অংশগুলি নিয়ে নাও না কেন?'

তারা বলল, 'কোথায়?'

তিনি বললেন, 'মসজিদে।

লোকেরা মসজিদের দিকে ছুটে গেল। আবু হুরাইরা তাদের অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পর তারা ফিরে এসে বলল, 'আবু হুরাইরা, আমরা তো মসজিদে গিয়েছি, ভেতরেও প্রবেশ করেছি, কিন্তু কোন কিছু বন্টন হচ্ছে এমন তো দেখলাম না।'

তিনি বললেন, 'মসজিদে তোমরা কাউকে দেখনি?'

তারা বলল, 'অবশ্য দেখেছি, কিছু লোক নামাযে দণ্ডায়মান, কিছু লোক কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল এবং কিছু লোক হারাম-হালাল সম্পর্কে পরস্পর আলোচনারত।'

তিনি বললেন, 'তোমাদের ধ্বংস হোক, এ-ই তো রাসূলুল্লাহর (সা) মীরাস।'

আবু হুরাইরা মুসলিম উম্মাহর জন্য নবীর হাজার হাজার হাদীস স্মৃতিতে ধারণ করে সংরক্ষণ করে গেছেন। সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরা থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন 'রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে একমাত্র আবদুল্লাহ ইবন উমার ব্যতীত আর কেউ আমার থেকে বেশী হাদীস বর্ণনাকারী নই। আর তাও এজন্য যে, তিনি হাদীস লিখতেন, আর আমি লিখতাম না।'

রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এত বেশী হাদীস বর্ণনার ব্যাপারটি অনেকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতো। তাই তিনি বলেন, 'তোমরা হয়তো মনে করছো আমি খুব বেশী হাদীস বর্ণনা করি। আমি ছিলাম রিক্তহস্ত, দরিদ্র, পেটে পাথর বেঁধে সর্বদা রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যে কাটাতাম। আর মুহাজিররা ব্যস্ত থাকতো তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং আনসাররা তাদের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে।' তিনি আরও বলেন, "একদিন আমি বললাম : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার অনেক কথাই শুনি, কিন্তু তার অনেক কিছুই ভুলে যাই।' একথা শুনে রাসূল (সা) বল্লেন, 'তোমার চাদরটি মেলে ধর।' আমি মেলে ধরলাম। তারপর বললেন : তোমার বুকের সাথে লেপ্টে ধর। আমি লেপ্টে ধরলাম। এরপর থেকে আর কোন কথাই আমি ভুলিনি।" ইমাম বুখারী বলেন : আটশ'রও বেশী সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা তাঁর

থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে ইবন আব্বাস, ইবন উমার, জাবির, আনাস, ওয়াসিলা (রা) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞান অর্জনের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ এবং রাসূলের (সা) মজলিসে উপস্থিতির ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদানের কারণে জীবনে তিনি এত ক্ষুধা ও দারিদ্র সহ্য করছেন যে তার সমকালীনদের মধ্যে কেউ তা করেননি। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

"মাঝে মাঝে আমি এত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়তাম যে, কষ্ট সহ্য করতে না পেরে রাসূলুল্লাহর কোন কোন সাহাবীর নিকট কুরআনের কোন একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম অথচ আমি তা জানতাম। আমার উদ্দেশ্য হত, হয়ত তিনি আমার এ অবস্থা দেখতে পেয়ে আমাকে সংগে করে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আহার করাবেন।

একদিন আমার ভীষণ ক্ষুধা পেল। ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমি পেটে একটি পাথর বেঁধে নিলাম তারপর সাহাবীদের গমনাগমন পথে বসলাম। আবু বকরকে যেতে দেখে তাঁকে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। মনে করেছিলাম, তিনি আমাকে তাঁর সাথে যেতে বলবেন। কিন্তু তিনি ডাকলেন না।

তারপর এলেন উমার ইবনুল খাত্তাব। তাঁকেও একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও কিছু বললেন না। সবশেষে এলেন রাসূল (সা)। তিনি আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করলেন। বললেন, আবু হুরাইরা? বললাম লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ একথা বলে পেছনে পেছনে আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলাম। রাসূল (সা) বাড়ীতে ঢুকে এক পেয়ালা দুধ দেখতে পেলেন। বাড়ীর লোকদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'দুধ কোথা থেকে এসেছে?'

তাঁরা বললেন, 'আপনার জন্য অমুক পাঠিয়েছে।' রাসূল (সা) বললেন, 'আবু হুরাইরা তুমি আহলুস সুফফার নিকট গিয়ে তাদের একত্রিত কর।' একথা বলার পর আমি খুবই মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলাম। আমি মনে মনে বলেছিলাম ঃ মাত্র এক পেয়ালা দুধ, আহলুস সুফফার এতগুলি লোকের কি হবে? আমি চাচ্ছিলাম, প্রথমে আমি পেট ভরে পান করি, তারপর তাদের কাছে যাই। যাইহোক, আমি আহলুস সুফফার কাছে গেলাম এবং তাদের ডেকে একত্র করলাম। তারা সমবেত হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে বসলে তিনি বললেন ঃ

আবু হুরাইরা, তুমি পেয়ালাটি নিয়ে তাদের হাতে দাও। আমি এক এক করে সবার হাতে দিলাম এবং তারা সবাই পান করে পরিতৃপ্ত হল। তারপর পেয়ালাটি হাতে নিয়ে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ফিরে এলাম। তিনি মাথা উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন ঃ

'তুমি আর আমিই বাকী আছি।' বললাম ঃ 'সাদাকতা ইয়া রাসূলুল্লাহ– সত্যই বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, 'তুমি পান কর' আমি পান করলাম। তিনি বললেন, 'আরও পান কর।' আমি আরও পান করলাম। এভাবে তিনি বার বার পান করতে বললেন, আর আমি বার বার পান করলাম। শেষে আমি বললাম, 'যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ, আমি আর পান করতে পারছিনে।' অতঃপর রাসূল (সা) পেয়ালাটি হাতে নিয়ে বাকীটুকু পান করলেন।

এত চরম দারিদ্র ও দুরবস্থার মধ্যে আবু হুরাইরাকে অবশ্য বেশী দিন থাকতে হয়নি। অল্প কালের মধ্যেই মুসলমানদের হাতে ধন ও ঐশ্বর্য আসে। চতুর্দিক থেকে প্রবহমান গতিতে গনিমাতের মাল মুসলমানদের হাতে আসতে থাকে। আবু হুরাইরা অর্থ, বাড়ী, ভূ-সম্পত্তি, স্ত্রী ও সন্তানাদি– সবকিছুর অধিকারী হন। কিন্তু এসব তাঁর মহান অন্তকরণের ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তিনি তাঁর অতীত দিনের কথা একদিনের জন্যও ভুলেননি। সবসময় তিনি বলতেন ঃ

"ইয়াতীম অবস্থায় বড় হয়েছি, রিক্ত হস্তে হিজরাত করেছি। পেটেভাতে, বুসরা বিনতু গাযওয়ানের মজদুরী খেটেছি। তারা যখন কোথাও তাঁবু ফেলত, তাদের নানা রকম ফুটফরমাশ পালন করতাম আর যখন তারা বাহনে আরোহণ করত, তাদের উটগুলি তাড়িয়ে নিতাম। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বুসরাকে আমার স্ত্রী হিসাবে দান করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করেছেন এবং আবু হুরাইরাকে সে দ্বীনের একজন নেতা বানিয়ে দিয়েছেন।"

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা) আবু হুরাইরাকে বাহরাইনের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। পরে তাঁকে অপসারণ করেন। তারপর আবার নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং মদীনা ত্যাগ করে আকীক নামক স্থানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

হযরত মুয়াবিয়ার শাসনামলে আবু হুরাইরা একাধিকবার মদীনার শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে শাসন ক্ষমতা তাঁর স্বভাবগত মহত্ব, উদারতা ও অল্পেতুষ্টি ইত্যাদি গুণাবলীতে কোন পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারেনি।

আবু হুরাইরা তখন মদীনার শাসক। নিজ পরিবারের জন্য কাঠের বোঝা পিঠে চাপিয়ে মদীনার একটি রাস্তা দিয়ে তিনি চলছেন। পথে সা'লাবা ইবন মালিকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, 'সা'লাবা, আমীরের জন্য পথটা একটু ছেড়ে দাও।' সা'লাবা বললেন, 'আল্লাহ্ আপনার ওপর রহম করুন। এত প্রশস্ত পথ দিয়েও আপনি যেতে পারছেন না?' তিনি বললেন, 'তোমাদের আমীর ও তার পিঠের বোঝাটির জন্য পথটা প্রশস্ত করে দাও।'

অগাধ জ্ঞান, সীমাহীন বিনয় ও উদারতার সাথে আবু হুরাইরার মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহ্ প্রীতির এক পরম সম্মিলন ঘটেছিল। তিনি দিনে রোযা রাখতেন, রাতের তিন ভাগের প্রথম ভাগ নামাযে অতিবাহিত করতেন। তারপর স্ত্রীকে ডেকে দিতেন। তিনি রাতের দ্বিতীয় ভাগ নামাযে কাটিয়ে তাঁদের কন্যাকে জাগিয়ে দিতেন। কন্যা রাতের বাকী অংশটুকু নামাযে দাঁড়িয়ে অতিবাহিত করতেন। এভাবে তাঁর বাড়ীতে সমগ্র রাতের মধ্যে ইবাদত কখনও বন্ধ হত না।

ইকরিমা বলেন, আবু হুরাইরা প্রতিদিন বার হাজার বার তাসবীহ পাঠ করতেন। তিনি বলতেন ঃ 'আমি আমার প্রতিদিনের পাপের সম পরিমাণ তাস্বীহ পাঠ করে থাকি।'

আবু হুরাইরার একটি নিগ্রো দাসী ছিল। একদিন তার আচরণে তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। চাবুকটি উঠিয়ে

আবার থেমে গেলেন। বললেন, 'কিয়ামাতের দিন যদি এর বদলার ভয় না করতাম তাহলে চাবুক মেরে তোমাকে কষ্ট দিতাম, যেমন তুমি আমাদের দিয়েছ। তবে তোমাকে আমি এমন একজনের কাছে বিক্রি করবো যিনি আমাকে তোমার ন্যায্য মূল্যই দেবেন। আর আমিও এ মূল্যেরই অধিকতর মুখাপেক্ষী। যাও আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে আমি আযাদ করে দিলাম।'

আবু হুরাইরার মেয়ে একদিন বললেন, 'আব্বা, অন্য মেয়েরা আমাকে লজ্জা দেয়। তারা বলে তোমার আব্বা তোমাকে সোনার গহনা বানিয়ে দেন না কেন?'

তিনি বললেন, 'বেটী, তাদের তুমি বলো, আমার আব্বা জাহান্নামের লেলিহান শিখার ভয় করেন।' মেয়েকে সোনার গহনা না দেওয়ার কারণ ধন-সম্পদের প্রতি তাঁর লালসা ও কৃপণতা নয়। তিনি তো আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ব্যাপারে সবসময় ছিলেন দরাজ-হস্ত। তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে ইতিহাসে অনেক কথাই আছে। একদিন মারওয়ান ইবনুল হিকাম একশ' দিনার আবু হুরাইরার কাছে পাঠালেন। কিন্তু পরের দিনই মারওয়ান আবার লোক পাঠিয়ে জানালেন, 'আমার চাকরটি ভুলক্রমে দিনারগুলি আপনাকে দিয়ে এসেছে, ওগুলি আমি আপনাকে দিতে চাইনি, বরং অন্য এক ব্যক্তিকে দিতে চেয়েছিলাম' একথা শুনে আবু হুরাইরা লজ্জা ও বিস্ময়ের সাথে বললেন ঃ

'আমি তো সেগুলি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে ফেলেছি। রাত পোহানো পর্যন্ত একটি দিনারও আমার কাছে ছিলনা। আগামীতে বাইতুল মাল থেকে যখন আমার ভাতা দেওয়া হবে, সেখান থেকে নিয়ে নেবেন।' আসলে মারওয়ান তাঁকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই এমনটি করেছিলেন।

মা যতদিন জীবিত ছিলেন আবু হুরাইরা তাঁর সাথে সর্বদা সদাচরণ করেছেন। তিনি যখন বাড়ী থেকে বের হতেন, মায়ের ঘরের দরজায় গিয়ে বলতেন, 'মা' আস্‌সালামু আলাইকি ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।'

জবাবে মা বলতেন, 'প্রিয় সন্তান, ওয়া আলাইকাস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।'

সালাম বিনিময়ের পর আবু হুরাইরা বলতেন, 'আল্লাহ আপনার ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করুন, যেমন আপনি করেছেন ছোট্ট বেলায় আমার ওপর।' মা বলতেন, 'বড় হয়ে আমার সাথে তুমি যে সদাচরণ করেছ, তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন।' বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের পর মাতা-পুত্রের মধ্যে এরূপ দু'আ ও সালাম বিনিময় হতো।

আবু হুরাইরা নিজে যেমন মুরুব্বিজনদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন, তেমনি সকলকে তিনি উপদেশ দিতেন মাতাপিতার সাথে সদাচরণের, আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক কায়েম রাখার। একদিন তিনি দেখতে পেলেন, দু'জন লোক রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন অন্যজন থেকে অধিকতর বয়স্ক। কনিষ্ঠজনকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সংগের লোকটি তোমার কি হয়?'

সে বলল 'আব্বা।'

তিনি বললেন, 'তুমি কখনও তার নাম ধরে ডাকবে না, তাঁর আগে আগে চলবে না এবং তাঁর বসার আগে কোথাও বসবে না।'

অন্তিম রোগ শয্যায় তিনি আকুল হয়ে কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করা হলো কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, 'তোমাদের এ দুনিয়ার জন্য আমি কাঁদছি না। কাঁদছি, দীর্ঘ ভ্রমণ ও স্বল্প পাথেয়'র কথা চিন্তা করে। যে রাস্তাটি জান্নাতে বা জাহান্নামে গিয়ে পৌঁছেছে, আমি এখন সে রাস্তার শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছি। জানিনে, আমি সেই দু'টি রাস্তার কোনটিতে যাব।'

অন্তিম রোগ শয্যায় তিনি শায়িত। মারওয়ান ইবনুল হিকাম তাঁকে দেখতে এলেন। বললেন, 'আবু হুরাইরা, আল্লাহ আপনাকে শিফা দান করুন।'

উত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহ, আমি আপনার দিদার ভালবাসি, আপনিও আমার দিদার পছন্দ করুন এবং আমার জন্য তা তাড়াতাড়ি করুন।'

মারওয়ান তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বের হতে না হতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন, 'ওয়ালিদ বিন উকবা' আসরের নামাযের পর তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। হযরত ইবন উমার, আবু সাঈদ খুদরী (রা) প্রমুখ সাহাবী তাঁর জানাযায় উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ালিদ তাঁর মৃত্যুর খবর হযরত মুয়াবিয়াকে অবহিত করলে তিনি তাঁকে লিখেন, 'তাঁর উত্তরাধিকারীদের খুঁজে বের করে দশ হাজার দিরহাম দাও এবং তাঁর প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ কর। কারণ, উসমানের গৃহবন্দী অবস্থায় তিনি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

আল্লামা ইবন হাজার আসকিলানী *'আল ইসাবা'* গ্রন্থে আবু সুলাইমানের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, আবু হুরাইরা আটাত্তর বছর জীবন লাভ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবন কালে তাঁর বয়স হয়েছিল তিরিশ বছরের কিছু বেশী। অনেকের মতে তিনি ৫৫ হিজরীতে ইনতিকাল করেন; কিন্তু ওয়াকিদীর মতে তাঁর মৃত্যুসন ৫৯ হিজরী। তবে ইমাম বুখারীর মতে তাঁর মৃত্যুসন হিজরী ৫৭।

আবু যার আল-গিফারী (রা)

বাইরের জগতের সাথে মক্কার সংযুক্তি ঘটিয়েছে যে 'অদ্দান' উপত্যকাটি, সেখানেই ছিল 'গিফার' গোত্রের বসতি। মক্কার কুরাইশদের বাণিজ্য কাফিলা ওখান দিয়ে সিরিয়া যাতায়াত করত। এসব কাফিলার নিরাপত্তার বিনিময়ে যে সামান্য অর্থ লাভ করতো তা দিয়েই তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। ডাকাতি, রাহাজানিও ছিল তাদের পেশা। যখন কোন বাণিজ্য কাফিলা তাদের দাবী অনুযায়ী খাদ্যসামগ্রী বা অর্থ আদায় করত না তখন তারা লুটতরাজ চালাতো।

জুনদুব ইবন জুনাদাহ, আবু যার নামেই যিনি পরিচিত– তিনিও ছিলেন এ কবীলারই সন্তান। বাল্যকাল থেকেই তিনি অসীম সাহস, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টির জন্য ছিলেন সকলের থেকে স্বতন্ত্র। জাহিলী যুগে জীবনের প্রথম ভাগে তাঁর পেশাও ছিল রাহাজানি। 'গিফার' গোত্রের একজন দুঃসাহসী ডাকাত হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর জীবনে ঘটে গেল এক বিপ্লব। তাঁর গোত্রীয় লোকেরা এক আল্লাহ ছাড়া যে সকল মূর্তির পূজা করত, তাতে তিনি গভীর ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেন। সমগ্র আরব বিশ্বে সে সময় যে ধর্মীয় অনাচার, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের সয়লাব চলছিল তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি অধীরভাবে অপেক্ষা করতে থাকেন এমন একজন নবীর, যিনি মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ও অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে তাদের নিয়ে আসবেন।

তিনি রাহাজানি পরিত্যাগ করে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে ঝুঁকে পড়েন, যখন সমগ্র আরব দেশ গুমরাহীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল। হযরত আবু মা'শার বলেন ঃ 'আবু যার জাহিলী যুগেই মুওয়াহহিদ বা একত্ববাদী ছিলেন। এক আল্লাহ ছাড়া কাকেও তিনি উপাস্য বলে বিশ্বাস করতেন না, অন্য কোন মূর্তি বা দেবদেবীর পূজাও করতেন না। তাঁর বিশ্বাস ও আল্লাহর ইবাদাত মানুষের কাছে পরিচিত ছিল। এ কারণে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাবের সংবাদ তাঁকে দিয়েছিল, বলেছিল ঃ

"আবু যার, তোমার মত মক্কার এক ব্যক্তি 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে থাকেন।"

তিনি কেবল মুখে মুখেই তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন না, সেই জাহিলী যুগে নামাযও আদায় করতেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাতের তিন বছর পূর্ব থেকেই নামায আদায় করতাম।' লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কাকে উদ্দেশ্য করে?' বললেন ঃ 'আল্লাহকে।' আবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'কোন দিকে মুখ করে?' বলেছিলেন ঃ 'যে দিকে আল্লাহ ইচ্ছা করতেন।'

তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটিও বেশ চমকপ্রদ। ইবন হাজার *'আল-ইসাবা'* গ্রন্থে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়, তিনি তাঁর গোত্রের সাথে বসবাস করছিলেন। একদিন সংবাদ পেলেন, মক্কায় এক নতুন নবীর আবির্ভাব হয়েছে। তিনি তাঁর ভাই আনিসকে ডেকে বললেন ঃ

'তুমি একটু মক্কায় যাবে। সেখানে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করেন এবং

আসমান থেকে তাঁর কাছে ওহী আসে বলে প্রচার করে থাকেন, তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করবে, তাঁর মুখের কিছু কথা শুনবে। তারপর ফিরে এসে আমাকে অবহিত করবে।'

আনিস মক্কায় চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে নিজ গোত্রে ফিরে এলেন। আবু যার খবর পেয়ে তখুনি ছুটে গেলেন আনিসের কাছে। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে নতুন নবী সম্পর্কে নানান কথা তাকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। আনিস বললেন ঃ

– 'কসম আল্লাহর। আমি তো লোকটিকে দেখলাম, মানুষকে তিনি মহৎ চরিত্রের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। আর এমন সব কথা বলেন যা কাব্য বলেও মনে হলো না।'

– 'মানুষ তাঁর সম্পর্কে কী বলাবলি করে?'

– 'কেউ বলে তিনি একজন যাদুকর, কেউ বলে গণক, আবার কেউ বলে কবি।'

– 'আল্লাহর কসম! তুমি আমার তৃষ্ণা মেটাতে পারলে না, আমার আকাঙ্খাও পূরণ করতে সক্ষম হলে না। তুমি কি পারবে আমার পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে, যাতে আমি মক্কায় গিয়ে স্বচক্ষেই তাঁর অবস্থা দেখে আসতে পারি?'

– 'নিশ্চয়ই। তবে আপনি মক্কাবাসীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন।'

পরদিন প্রত্যুষে আবু যার চললেন মক্কার উদ্দেশ্যে। সংগে নিলেন কিছু পাথেয় ও এক মশক পানি। সর্বদা তিনি শঙ্কিত, ভীতচকিত। না জানি কেউ জেনে ফেলে তাঁর উদ্দেশ্য। এ অবস্থায় তিনি পৌঁছলেন মক্কায়। কোন ব্যক্তির কাছে মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞেস করা তিনি সমীচীন মনে করলেন না। কারণ, তাঁর জানা নেই এ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিটি মুহাম্মাদের (সা) বন্ধু না শত্রু।

দিনটি কেটে গেল। রাতের আঁধার নেমে এল। তিনি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তিনি শুয়ে পড়লেন মাসজিদুল হারামের এক কোণে। আলী ইবন আবী তালিব যাচ্ছিলেন সে পথ দিয়েই। দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, লোকটি মুসাফির। ডাকলেন, 'আসুন, আমার বাড়ীতে।' আবু যার গেলেন তাঁর সাথে এবং সেখানেই রাতটি কাটিয়ে দিলেন। সকাল বেলা পানির মশক ও খাবারের পুটলিটি হাতে নিয়ে আবার ফিরে এলেন মসজিদে। তবে দু'জনের একজনও একে অপরকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না।

পরের দিনটিও কেটে গেল। কিন্তু নবীর সংগে পরিচয় হলো না। আজও তিনি মাসজিদেই শুয়ে পড়লেন। আজও আলী (রা) আবার সে পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন। বললেন ঃ ব্যাপার কি, লোকটি আজও তাঁর গন্তব্যস্থল চিনতে পারেনি? তিনি তাকে আবার সংগে করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এ রাতটিও সেখানে কেটে গেল। এদিনও কেউ কাউকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। একইভাবে তৃতীয় রাতটি নেমে এলো। আলী (রা) আজ বললেন ঃ

– 'বলুন তো আপনি কি উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছেন?'

তিনি বললেন, 'আপনি যদি আমার কাছে অঙ্গীকার করেন আমার কাঙ্খিত বিষয়ের

দিকে আমাকে পথ দেখাবেন, তাহলে আমি বলতে পারি।' আলী (রা) অঙ্গীকার করলেন। আবু যার বললেন।

'আমি অনেক দূর থেকে মক্কায় এসেছি, নতুন নবীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং তিনি যেসব কথা বলেন তার কিছু শুনতে।'

আলীর (রা) মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'আল্লাহর কসম, তিনি নিশ্চিত সত্য নবী।' একথা বলে তিনি নানাভাবে নবীর (সা) পরিচয় দিলেন। তিনি আরও বললেন, "সকালে আমি যেখানে যাই, আপনি আমাকে অনুসরণ করবেন। যদি আমি আপনার জন্য আশংকাজনক কোন কিছু লক্ষ্য করি তাহলে প্রস্রাবের ভান করে দাঁড়িয়ে যাব। আবার যখন চলবো, আমাকে অনুসরণ করে চলতে থাকবেন। এভাবে আমি যেখানে প্রবেশ করি আপনিও সেখানে প্রবেশ করবেন।"

প্রিয় নবীর দর্শন লাভ ও তাঁর ওপর অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ শ্রবণ করার প্রবল আগ্রহ ও উৎকণ্ঠায় আবু যার সারাটি রাত বিছানায় স্থির হতে পারলেন না। পরদিন সকালে মেহমান সংগে করে আলী (রা) চললেন রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীর দিকে। আবু যার তাঁর পেছনে পেছনে। পথের আশপাশের কোন কিছুর প্রতি তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এভাবে তাঁরা পৌঁছলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট। আবু যার সালাম করলেন।

– 'আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।' রাসূল (সা) জবাব দিলেন,

– 'ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।'

এভাবে আবু যার সর্বপ্রথম ইসলামী কায়দায় রাসূলুল্লাহকে (সা) সালাম পেশ করার গৌরব অর্জন করেন। অতঃপর সালাম বিনিময়ের এ পদ্ধতিই গৃহীত ও প্রচারিত হয়।

রাসূল (সা) আবু যারকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআনের কিছু আয়াতও তিলাওয়াত করে শুনালেন। সেখানে বসেই আবু যার কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে নতুন দ্বীনের মধ্যে প্রবেশের ঘোষণা দিলেন।

এর পরের ঘটনা আবু যার এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে আমি মক্কায় অবস্থান করতে লাগলাম। তিনি আমাকে ইসলামের নানান বিষয় শিক্ষা দিলেন, কুরআনের কিছু আয়াত পাঠের প্রশিক্ষণও দিলেন। আমাকে বললেন ঃ 'মক্কায় কারও কাছে তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করবে না। কেউ জানতে পেলে আমি তোমার জীবনের আশংকা করছি।'

বললাম, 'যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমি মক্কা ছেড়ে যাবনা, যতক্ষণ না মাসজিদে গিয়ে কুরাইশদের মাঝে প্রকাশ্যে সত্যের দাওয়াত দিচ্ছি।' রাসূল (সা) চুপ হয়ে গেলেন।

আমি মাসজিদে এলাম। কুরাইশরা তখন একত্রে বসে গল্প গুজব করছে। আমি তাদের মাঝখানে হাজির হয়ে যতদূর সমস্ত উচ্চকণ্ঠে সম্বোধন করে বললাম, "কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল।"

আমার কথাগুলি তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই তারা ভীত-চকিত হয়ে পড়লো।

একযোগে তারা লাফিয়ে উঠে বলল ঃ এই ধর্মত্যাগীকে ধর। তারা দৌড়ে এসে আমাকে বেদম প্রহার শুরু করলো। রাসূলের (সা) চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব দেখে চিনতে পারলেন। তাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তারপর তাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা নিপাত যাও! গিফারী গোত্রের এবং তোমাদের বাণিজ্য কাফিলার গমনাগমন পথের লোককে হত্যা করছো? তারা আমাকে ছেড়ে দিল।

একটু সুস্থ হয়ে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ফিরে গেলাম। আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন, 'তোমাকে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলাম না?' বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিজের মধ্যে আমি প্রবল ইচ্ছা অনুভব করছিলাম। সে ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছি মাত্র।' তিনি বললেন, "তোমার গোত্রের কাছে ফিরে যাও। যা দেখে গেলে এবং যা কিছু শুনে গেলে তাদের অবহিত করবে, তাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবে। হতে পারে আল্লাহ তোমার দ্বারা তাদের উপকৃত করবেন এবং তোমাকে প্রতিদান দেবেন। যখন তুমি জানবে, আমি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিচ্ছি, আমার কাছে চলে আসবে।"

আমি ফিরে এলাম আমার গোত্রীয় লোকদের আবাসভূমিতে। আমার ভাই আনিস এলো আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ 'কি করলেন?' বললাম, 'ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বাসী হয়েছি।' তক্ষুণি আল্লাহ তার অন্তর-দুয়ার উন্মুক্ত করে দিলেন। সে বলল, 'আপনার দ্বীন প্রত্যাখ্যান করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বাসী হলাম।' তারপর আমরা দু'ভাই একত্রে আমাদের মায়ের কাছে গিয়ে তাঁকেও ইসলামের দাওয়াত দিলাম।' 'তোমাদের দু'ভাইয়ের দ্বীনের প্রতি আমার কোন অনীহা নেই'– একথা বলে তিনিও ইসলাম কবুল করার ঘোষণা দিলেন।

সেইদিন থেকে এই বিশ্বাসী পরিবার নিরলসভাবে গিফার গোত্রের মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকে। এ কাজে কখনও তারা হতাশ হননি, কখনও মনোবল হারাননি। তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টায় এ গোত্রের বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্যে নামাযের জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এক দল লোক বলে, আমরা আমাদের ধর্মের ওপর অটল থাকবো। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। রাসূলের (সা) মদীনায় হিজরাতের পর তারাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ গিফার গোত্র সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "গিফার গোত্র– আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেছেন, আর আসলাম গোত্র- আল্লাহ তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়েছেন।"

আবু যার মক্কা ফিরে এসে গোত্রীয় লোকদের সাথে মরুভূমিতে অবস্থান করতে থাকেন। একে একে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি মদীনায় এলেন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য অবলম্বন করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আবেদন করলেন তাঁর খিদমতের সুযোগ দানের জন্য। তাঁর এ আবেদন মঞ্জুর করা হল। মদীনায় অবস্থানকালে সবটুকু সময় তিনি অতিবাহিত করতেন রাসূলুল্লাহর (সা) সেবায়। এটাই ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয় কাজ। তিনি নিজেই বলতেন ঃ

“রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমত করতাম, আর অবসর সময়ে মাসজিদে এসে বিশ্রাম নিতাম।”

ইবন ইসহাক বলেন ঃ আবু যার হিজরাত করে মদীনায় এলে রাসূল (সা) মুনজির ইবন ‘আমর ও আবু যারের মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তবে এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর মত হল, আবু যার মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পর মদীনায় হিজরাত করে এসেছিলেন। সুতরাং ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপনের নিয়মটি তখন রহিত হয়ে গিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে তাঁর যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিস্তারিত তথ্য জানা যায় না। তবে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের একটি ঘটনা আল্লামা ইবন হাজার আসকিলানী– *‘আল-ইসাবা’* গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, তখন লোকেরা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে গমনের ব্যাপারে ইতঃস্তত ভাব প্রকাশ করতে লাগলো। কোন ব্যক্তিকে দেখা না গেলে সাহাবীরা বলতেন ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক আসেনি।’ জবাবে তিনি বলতেন, ‘যদি তার উদ্দেশ্য মহৎ হয় তাহলে শিগগিরই আল্লাহ তাকে তোমাদের সাথে মিলিত করবেন। অন্যথায় আল্লাহ তাকে তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার দিক থেকে তোমাদের নিরাপদ করেছেন।’ এক সময় আবু যারের নামটি উল্লেখ করে বলা হল ‘সেও পিঠটান দিয়েছে।’ প্রকৃত ঘটনা হল, তাঁর উটটি ছিল মন্থরগতি। প্রথমে তিনি উটটিকে দ্রুত চালাবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে নিজের কাঁধে উঠিয়ে পায়ে হাঁটা শুরু করেন এবং অগ্রবর্তী মানযিলে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন। এক সাহাবী দূর থেকে তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, রাস্তা দিয়ে কে যেন একজন আসছে।’ তিনি বললেন ঃ ‘আবু যারই হবে।’ লোকেরা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে চিনতে পারল। বলল, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, এতো আবু যারই।’ তিনি বললেন ঃ

يَرْحَمُ اللّٰهُ اَبَاذَرٍ يَمْشِىْ وَحْدَهُ وَيَمُوْتُ وَحْدَهُ وَيُحْشَرُ وَحْدَهُ-

– ‘আল্লাহ আবু যারের ওপর রহম করুন। সে একাকী চলে, একাকীই মরবে, কিয়ামাতের দিন একাই উঠবে।’ (তারীখুল ইসলাম ঃ আল্লামা জাহাবী, ৩য় খণ্ড) রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

হযরত আবু যার ছিলেন প্রকৃতিগতভাবেই সরল, সাদাসিধে, দুনিয়া বিরাগী ও নির্জনতা-প্রিয় স্বভাবের। এ কারণে রাসূলে পাক (সা) তাঁর লকব দিয়েছিলেন– ‘মসিহুল ইসলাম’। রাসূলের (সা) ওফাতের পর তিনি দুনিয়ার সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন হয়ে পড়েন। প্রিয় নবীর বিচ্ছেদে তাঁর অন্তর অভ্যন্তরে যে দাহ শুরু হয়েছিল তা আর কখনও প্রশমিত হয়নি। এ কারণে হযরত আবু বকরের ইনতিকালে তাঁর ভগ্ন হৃদয় আরও চুরমার হয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টিতে তখন মদীনার সুশোভিত উদ্যানটি পত্র-পল্লববিহীন বলে প্রতিভাত হয়। তিনি মদীনা ত্যাগ করে শামে (সিরিয়া) প্রবাসী হন।

আবু বকর ও উমারের (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত ইসলামের সহজ ও সরল জীবন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। বিজয় ও ইসলামী খিলাফতের বিস্তৃতির সাথে যখন ধন ও ঐশ্বর্যের

প্রাচুর্য দেখা দেয় তখন স্বাভাবিকভাবেই চাকচিক্য ও জৌলুস সে স্থান দখল করে নেয়। হযরত উসমানের (রা) যুগেই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শানশওকাতের সূচনা হয়। সাধারণ জনজীবনেও এর কিছুটা প্রভাব পড়ে। তাদের মধ্যে নবীর (সা) আমলের সরলতার পরিবর্তে ভোগ ও বিলাসিতার ছাপ ফুটে ওঠে। আবু যার মানুষের কাছে নবীর (সা) আমলের সেই সহজসরল আড়ম্বরহীন জীবনধারার অনুসরণ আশা করতেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল সকলেই তাঁর মত ধন-দৌলতের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হউক। তাঁর আল্লাহ নির্ভর বিশ্বাস ও মতবাদে আগামীকালের জন্য কোন কিছুই আজ সঞ্চয় করা যাবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, অন্যকে অভুক্ত ও উলংগ রেখে সম্পদ পুঞ্জিভূত করার কোন অধিকার কোন মুসলিমের নেই। হযরত মুআবিয়া (রা) ও অন্যান্য আমীরগণ মনে করতেন, সম্পদশালী লোকদের ওপর আল্লাহ যে যাকাত ফরয করেছেন তা সঠিকভাবে আদায় করার পর অতিরিক্ত অর্থ জমা করার ইখতিয়ার প্রতিটি মুসলিমের আছে। এ মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেয়ে শেষ পর্যন্ত ঝগড়া ও বচসার রূপ লাভ করে। আবু যার অত্যন্ত নির্ভীকভাবে ঐ সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হওয়ার কারণে তাদের কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের লক্ষ্যবস্তু বলে গণ্য করতে থাকেন। وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -(التوبة: ٣٤)

– 'আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।' (আত্‌ তাওবাহ ঃ ৩৪)

এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে ইয়াহুদী ও নাসারাদের আলোচনা এসেছে। এ কারণে আমীর মুআবিয়ার বক্তব্য ছিল, এ আয়াতের সম্পর্ক ঐ সব বিধর্মীদের সাথে। আর আবু যার মনে করেন, আয়াতটির উদ্দেশ্য মুসলিম অমুসলিম সকলেই। দ্বিতীয়তঃ আবু যার আল্লাহর পথে ব্যয় না করার অর্থ এই বুঝাতেন যে, সে নিজের ধন সম্পদ আল্লাহর পথে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেয় না। আর আমীর মুআবিয়ার ধারণা ছিল এটা কেবল যাকাতের সাথে সম্পৃক্ত। এভাবে হযরত আবু যার স্বীয় চিন্তা-দর্শন ও মত অনুযায়ী অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচনা আরম্ভ করেন। হযরত মুআবিয়া (রা) মনে করেন, এ অবস্থা চলতে থাকলে শামে যে কোন সময় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তিনি খলীফা উসমানকে (রা) নাজুক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং অনুরোধ করলেন তিনি যেন আবু যারকে মদীনায় তলব করেন। হযরত উসমান তাঁকে মদীনায় ডেকে পাঠান।

একদিন আবু যার বসে আছেন। তাঁরই সামনে খলীফা 'উসমান (রা) কা'বকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'যে ব্যক্তি সম্পদ পুঞ্জিভূত করে, তার যাকাত দেয় এবং আল্লাহর পথে ব্যয়ও করে– এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন?' কা'ব (রা) বললেন ঃ 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো আশা পোষণ করা যায়।' এ কথা শুনে আবু যার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। কা'বের মাথার ওপর হাতের লাঠিটি তুলে ধরে বললেন, 'ইয়াহুদী নারীর সন্তান, (কা'ব ইয়াহুদীর সন্তান ছিলেন) তুমি এর মর্ম কি বুঝবে।

কিয়ামাতের দিন এমন ব্যক্তির অন্তরকেও বৃশ্চিক দংশন করবে।' হযরত উসমান শেষ পর্যন্ত আবু যারকে বললেন, 'আপনি আমার কাছে থাকুন, দুগ্ধবতী উটনী প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় আপনার দরজায় হাজির হবে।' জবাবে তিনি বললেন ঃ 'তোমার এ দুনিয়ার কোন প্রয়োজন আমার নেই।' এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন। অবশেষে হযরত উসমান তাঁকে অনুরোধ জানালেন, মদীনা থেকে বহুদূরে মরুভূমির মাঝখানে 'রাবজা' নামক স্থানে গিয়ে বসবাস করার জন্য। অনেকের মতে তিনি স্বেচ্ছায় সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। লোকালয়ে থেকে বহুদূরে নির্জন প্রান্তরে ভোগ বিলাসী জীবনকে পরিহার করে আল্লাহর রাসূলের (সা) পরকাল-আসক্ত জীবনকে কঠোরভাবে অনুসরণ করে আমরণ সেখানে পড়ে থাকেন। হযরত আবু যারের ওফাতের কাহিনীটিও অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং চমকপ্রদও বটে। হিজরী ৩১ মতান্তরে ৩২ সনে তিনি 'রাবজা'র মরুভূমিতে ইনতিকাল করেন। তাঁর সহধর্মিনী তাঁর অন্তিমকালীন অবস্থা বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

"আবু যারের অবস্থা যখন খুবই খারাপ হয়ে পড়লো, আমি তখন কাঁদতে শুরু করলাম। তিনি বললেন, কাঁদছো কেন? বললাম ঃ এক নির্জন মরুভূমিতে আপনি পরকালের দিকে যাত্রা করছেন। এখানে আমার ও আপনার ব্যবহৃত বস্ত্র ছাড়া অতিরিক্ত এমন বস্ত্র নেই যা দ্বারা আপনার কাফন দেওয়া যেতে পারে। তিনি বললেন ঃ কান্না থামাও। তোমাকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। রাসূল (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি, 'যে মুসলিমের দুই অথবা তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য তাই-ই যথেষ্ট। তিনি কতিপয় লোকের সামনে, তার মধ্যে আমিও ছিলাম, বলেছিলেন ঃ তোমাদের মধ্যে একজন মরুভূমিতে মৃত্যুবরণ করবে এবং তার মরণ সময়ে মুসলিমদের একটি দল সেখানে অকস্মাৎ উপস্থিত হবে।' আমি ছাড়া সেই লোকগুলির সকলেই লোকালয়ে ইন্তিকাল করেছে। এখন একমাত্র আমিই বেঁচে আছি। তাই নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সে ব্যক্তি আমি। আমি কসম করে বলছি, আমি মিথ্যা বলছিনা এবং যিনি এ কথা বলেছিলেন তিনিও কোন মিথ্যা বলেননি। তুমি রাস্তার দিকে চেয়ে দেখ গায়েবী সাহায্য অবশ্যই এসে যাচ্ছে।' আমি বললাম ঃ 'এখন তো হাজীদেরও প্রত্যাবর্তন শেষ হয়েছে, রাস্তায়ও লোক চলাচল বন্ধ।' তিনি বললেন, 'না' তুমি যেয়ে দেখ।' সুতরাং এক দিকে দৌড়ে গিয়ে টিলার ওপর উঠে দূরে তাকিয়ে দেখছিলাম, অপর দিকে ছুটে এসে তাঁর শুশ্রূষা করছিলাম। এরূপ ছুটাছুটি ও অনুসন্ধান চলছিল। এমন সময় দূরে কিছু আরোহী দৃষ্টিগোচর হলো। আমি তাদেরকে ইশারা করলে তারা দ্রুতগতিতে আমার নিকট এসে থেমে গেল। আবু যার সম্পর্কে তারা প্রশ্ন করলো, 'ইনি কে?' বললাম ঃ 'আবু যার।' 'রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী?' বললাম ঃ 'হাঁ।' 'মা বাবা কুরবান হউক'– একথা বলে তারা আবু যারের কাছে গেল। আবু যার প্রথমে তাদেরকে রাসূলের (সা) ভবিষ্যৎ বাণী শুনালেন। তারপর অসিয়ত করলেন, 'যদি আমার নিকট অথবা আমার স্ত্রীর নিকট থেকে কাফনের পরিমাণ কাপড় পাওয়া যায় তাহলে তা দিয়েই আমাকে দাফন দেবে।' তারপর তাদেরকে কসম দিলেন, যে ব্যক্তি সরকারের ক্ষুদ্রতম পদেও অধিষ্ঠিত সে যেন তাঁকে কাফন না পরায়। ঘটনাক্রমে এক আনসারী

যুবক ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য সকলেই কোন না কোন সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। আবু যার তাকেই কাফন পরাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কাফিলাটি ছিল ইয়ামনী। তারা কুফা থেকে আসছিল। আর তাদের সাথে ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)। এ কাফিলার সাথে তিনি ইরাক যাচ্ছিলেন। তিনিই আবু যারের জানাযার ইমামতি করেন এবং সকলে মিলে তাঁকে 'রাবজার' মরুভূমিতে দাফন করেন।'

হযরত আবু যার থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট আটাশ। তন্মধ্যে বারোটি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। দু'টি বুখারী ও সাতটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যদের তুলনায় তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত কম হওয়ার কারণ তিনি সবসময় চুপচাপ থাকতেন, নির্জনতা পছন্দ করতেন এবং মানুষের সাথে মেলামেশা কম করতেন। এ কারণে তাঁর জ্ঞানের তেমন প্রচার হয়নি। অথচ হযরত আনাস ইবন মালিক, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস প্রমুখের ন্যায় বিদ্বান সাহাবীগণ তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। ইবন আসাকির তাঁর *'তারীখে দিমাশক'* গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হযরত আলীকে (রা) আবু যারের জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন, 'এমন জ্ঞান তিনি লাভ করেছেন যা মানুষ অর্জন করতে অক্ষম। তারপর সে জ্ঞান আগুনে সেক দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু তা থেকে কোন খাদ বের হয়নি।' এ মহান সাধক ও দুনিয়া নিরাসক্ত সাহাবী সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'আসমানের নীচে ও যমীনের ওপরে আবু যার সর্বাধিক সত্যবাদী ব্যক্তি।'

হযরত উসমানের খিলাফতকালে আবু যার একবার হজ্জে গেলেন। এক ব্যক্তি এসে বলল, 'উসমান মিনায় অবস্থানকালে চার রাকা'আত নামায আদায় করেছেন (অর্থাৎ কসর করেননি)।' বিষয়টি তাঁর মনঃপূত হলো না। অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দা করে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর ও উমারের পেছনে আমি নামায আদায় করেছি। তাঁরা সকলে দু'রাকা'আত পড়েছেন।' একথা বলার পর তিনি নিজেই ইমামতি করলেন এবং চার রাকা'আতই আদায় করলেন। লোকেরা বলল, 'আপনিইতো আমীরুল মু'মিনীনের সমালোচনা করলেন আর এখন নিজেই চার রাকাআত আদায় করলেন।' তিনি বললেন, "মতভেদ খুবই খারাপ বিষয়। রাসূল (সা) বলেছেন, 'আমার পরে যারা আমীর হবে তাদের অপমান করবেনা। যে ব্যক্তি তাদের অপমান করার ইচ্ছা করবে সে ইসলামের সুদৃঢ় রজ্জু স্বীয় কাঁধ থেকে ছুড়ে ফেলবে এবং নিজের জন্য তাওবার দরজা বন্ধ করে দেবে।" (মুসনাদে আহমাদ, ৫/১৬৫)

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর যখনই পবিত্র নামটি তাঁর জিহ্বায় এসে যেত, চোখ থেকে অঝোরে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতো। আহনাফ বিন কায়েস বর্ণনা করেন, "আমি একবার বাইতুল মাকদাসে এক ব্যক্তিকে একের পর এক সাজদাহ করতে দেখলাম। এতে আমার অন্তরে এক বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। আমি যখন দ্বিতীয়বার তার কাছে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম 'আপনি কি বলতে পারেন আমি জোড় না বেজোড় নামায আদায় করেছি?' তিনি বললেন, 'আমি না জানলেও আল্লাহ নিশ্চয়ই জানেন।'

তারপর বললেন ঃ 'আমার বন্ধু আবুল কাসিম আমাকে বলেছেন' এতটুকু বলেই তিনি কাঁদতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'আমার বন্ধু আবুল কাসিম আমাকে বলেছেন।' এবারও কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। অবশেষে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে বললেন ঃ 'আমার বন্ধু আবুল কাসিম (সা) বলেছেন ঃ যে বান্দা আল্লাহকে একটি সাজদাহ করে, আল্লাহ তার একটি দরজা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি পাপ মোচন করে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন।' জিজ্ঞেস করলাম, – আপনি কে? তিনি বললেন ঃ আবু যার- রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী।"

একদিন এক ব্যক্তি আবু যারের নিকট এলো। সে তাঁর ঘরের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখলো। গৃহস্থালীর কোন সামগ্রী দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলো,

– 'আবু যার, আপনার সামান-পত্র কোথায়?

– 'আখিরাতে আমার একটি বাড়ী আছে। আমার সব উৎকৃষ্ট সামগ্রী সেখানেই পাঠিয়ে দিই।'

একদা সিরিয়ার আমীর তাঁর নিকট তিনশ' দীনার পাঠালেন। আর বলে পাঠালেন, এ দ্বারা আপনি আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করুন। 'শামের আমীর কি আমার থেকে অধিকতর নীচ কোন আল্লাহর বান্দাকে পেলনা?'– একথা বলে তিনি দীনারগুলি ফেরত পাঠালেন।

সালমান আল-ফারেসী (রা)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'সালমান নবী পরিবারেরই একজন।'

এটি একজন সত্য-সন্ধানী ও আল্লাহকে পাওয়ার অভিলাষী এক ব্যক্তির জীবন কথা। তিনি হযরত সালমান আল-ফারেসী। সালমান আল-ফারেসীর যবানেই তাঁর সেই সত্য প্রাপ্তির চমকপ্রদ বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

আমি তখন পারস্যের ইসফাহান অঞ্চলের একজন পারসী নওজোয়ান। আমার গ্রামটির নাম 'জায়্যান'। বাবা ছিলেন গ্রামের দাহকান-সর্দার। সর্বাধিক ধনবান ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। জন্মের পর থেকেই আমি ছিলাম তাঁর কাছে আল্লাহর সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচে বেশী প্রিয়। আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমার প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালবাসাও বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে কোন অমঙ্গলের আশংকায় তিনি আমাকে মেয়েদের মত ঘরে আবদ্ধ করে রাখেন।

আমার বাবা-মার মাজুসী ধর্মে আমি কঠোর সাধনা শুরু করলাম এবং আমাদের উপাস্য আগুনের তত্বাবধায়কের পদটি খুব তাড়াতাড়ি অর্জন করলাম। রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা উপাসনার সেই আগুন জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্বটি আমার ওপর অর্পিত হয়।

আমার বাবা ছিলেন বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক। তিনি নিজেই তা দেখাশুনা করতেন। তাতে আমাদের প্রচুর শস্য উৎপন্ন হতো। একদিন কোন কারণবশত তিনি বাড়িতে আটকে গেলেন, গ্রামের খামারটি দেখাশুনার জন্য যেতে পারলেন না। আমাকে ডেকে তিনি বললেন ঃ

'বেটা, তুমি তো দেখতেই পাচ্ছো, বিশেষ কারণে আজ আমি খামারে যেতে পারছিনা। আজ বরং তুমি একটু সেখানে যাও এবং আমার তরফ থেকে সেখানকার কাজকর্ম তদারক কর।'

আমি খামারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথে খৃষ্টানদের একটি গীর্জার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের কিছু কথার আওয়ায আমার কানে ভেসে এলো। তারা তখন প্রার্থনা করছিলো। এ আওয়াযই আমাকে সচেতন করে তোলে।

দীর্ঘদিন ঘরে আবদ্ধ থাকার কারণে খৃষ্টান অথবা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। তাদের কথার আওয়ায শুনে তারা কি করছে তা দেখার জন্য আমি গীর্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। গভীরভাবে তাদেরকে আমি নিরীক্ষণ করলাম। তাদের প্রার্থনা পদ্ধতি আমার খুবই ভালো লাগলো এবং আমি তাদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। মনে মনে বললাম ঃ আমরা যে ধর্মের অনুসারী তা থেকে এ ধর্ম অতি উত্তম। আমি খামারে না গিয়ে সে দিনটি তাদের সাথেই কাটিয়ে দিলাম। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

– এ ধর্মের মূল উৎস কোথায়?

– শামে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। আমি বাড়িতে ফিরে আসলাম। সারাদিন আমি কি কি করেছি,

বাবা তা আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

বললাম ঃ 'বাবা কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখতে পেলাম তারা তাদের উপাসনালয়ে প্রার্থনা করছে। তাদের ধর্মের যেসব ক্রিয়াকাণ্ড আমি প্রত্যক্ষ করেছি তা আমার খুবই ভালো লেগেছে। বেলা ডোবা পর্যন্ত আমি তাদের সাথেই কাটিয়ে দিয়েছি।' আমার কথা শুনে বাবা শংকিত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন ঃ

'বেটা, সে ধর্মে কোন কল্যাণ নেই, তোমার ও তোমার পিতৃপুরুষের ধর্ম তা থেকেও উত্তম।' বললাম, 'আল্লাহর শপথ, কখনো তা নয়। তাদের ধর্ম আমাদের ধর্ম থেকেও উত্তম।'

আমার কথা শুনে বাবা ভীত হয়ে পড়লেন এবং আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি বলে তিনি আশংকা করলেন। তাই আমার পায়ে বেড়ী লাগিয়ে ঘরে বন্দী করে রাখলেন।

আমি সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিছুদিনের মধ্যেই সে সুযোগ এসে গেল। গোপনে খৃষ্টানদের কাছে এই বলে সংবাদ পাঠালাম যে, শাম অভিমুখী কোন কাফিলা তাদের কাছে এলে তারা যেন আমাকে খবর দেয়।

কিছুদিনের মধ্যেই শাম অভিমুখী একটি কাফিলা তাদের কাছে এলো। তারা আমাকে সংবাদ দিল। আমি আমার বন্দীদশা থেকে পালিয়ে গোপনে তাদের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। তারা আমাকে শামে পৌঁছে দিল। শামে পৌঁছে আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ

— এ ধর্মের সর্বোত্তম ও সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ব্যক্তি কে?

তারা বললো ঃ বিশপ, গীর্জার পুরোহিত।

আমি তাঁর কাছে গেলাম। বললাম ঃ আমি খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আমার ইচ্ছা, আপনার সাহচর্যে থেকে আপনার খিদমত করা, আপনার নিকট থেকে শিক্ষালাভ ও আপনার সাথে প্রার্থনা করা। তিনি বললেন ঃ ভেতরে এসো।

আমি ভেতরে ঢুকে তার কাছে গেলাম এবং তার খিদমত শুরু করে দিলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই আমি বুঝতে পারলাম লোকটি অসৎ। কারণ সে তার সংগী সাথীদেরকে দান-খয়রাতের নির্দেশ দেয়, সওয়াব লাভের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে; কিন্তু যখন তারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য তার হাতে কিছু তুলে দেয়, তখন সে নিজেই তা আত্মসাত করে এবং নিজের জন্য পুঞ্জিভূত করে রাখে। গরীব মিসকীনদের সে কিছুই দেয় না। এভাবে সে সাত কলস স্বর্ণ পুঞ্জিভূত করে।

তার এ চারিত্রিক অধপতন দেখে আমি তাকে ভীষণ ঘৃণা করতাম। কিছু দিনের মধ্যেই লোকটি মারা গেল। এলাকার খৃষ্টান সম্প্রদায় তাকে দাফনের জন্য সমবেত হলো। তাদেরকে আমি বললাম ঃ তোমাদের এ বন্ধুটি খুবই অসৎ প্রকৃতির লোক ছিল। তোমাদের সে দান খয়রাতের নির্দেশ দিত এবং সেজন্য তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতো। কিন্তু তোমরা যখন তা তার হাতে তুলে দিতে সে সবই আত্মসাত করতো। গরীব-মিসকীনদের কিছুই দিত না।

তারা জিজ্ঞেস করলো ঃ তুমি তা কেমন করে জানলে?

বললাম ঃ তোমাদেরকে আমি তার পুঞ্জিভূত সম্পদের গোপন ভাণ্ডার দেখাচ্ছি।

তারা বললো ঃ ঠিক আছে, তাই দেখাও।

আমি তাদেরকে গোপন ভাণ্ডারটি দেখিয়ে দিলে তারা সেখান থেকে সাত কলস সোনা-চান্দি উদ্ধার করে। এ দেখে তারা বললো ঃ

— আল্লাহর কসম আমরা তাকে দাফন করবো না।

তাকে তারা শুলিতে লটকিয়ে পাথর মেরে তার দেহ জর্জরিত করে দিল। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা অন্য এক ব্যক্তিকে তার স্থলাভিষিক্ত করলো। আমি তাঁরও সাহচর্য গ্রহণ করলাম। এ লোকটি অপেক্ষা দুনিয়ার প্রতি অধিক উদাসীন, আখিরাতের প্রতি অধিক অনুরাগী ও রাতদিন ইবাদতের প্রতি বেশী নিষ্ঠাবান কোন লোক আমি এর আগে আর দেখিনি। আমি তাঁকে অত্যধিক ভালোবাসতাম। একটা দীর্ঘ সময় তাঁর সাথে আমি কাটালাম। যখন তাঁর মরণ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, আমি তাঁকে বললাম ঃ

— জনাব, আপনার মৃত্যুর পর কার সাহচর্যে কাটাবার উপদেশ দিচ্ছেন আমাকে?

বললেন ঃ বেটা আমি যে সত্যকে আঁকড়ে রেখেছিলাম, এখানে সে সত্যের ধারক আর কাউকে আমি জানিনা। তবে মাওসেলে এক ব্যক্তি আছেন, নাম তাঁর অমুক, তিনি এ সত্যের এক বিন্দুও পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেননি। তুমি তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করো।

আমার সে বন্ধুটির মৃত্যুর পর মাওসেলে গিয়ে তাঁর বর্ণিত লোকটিকে আমি খুঁজে বের করি। আমি তাঁকে আমার সব কথা খুলে বলি। একথাও তাঁকে আমি বলি যে, অমুক ব্যক্তি তাঁর অন্তিম সময়ে আমাকে আপনার সাহচর্য অবলম্বনের কথা বলে গেছেন। আর তিনি আমাকে একথাও বলে গেছেন যে, তিনি যে সত্যের ওপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আপনি সে সত্যকেই গভীরভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। আমার কথা শুনে তিনি বললেন ঃ তুমি আমার কাছে থাক।

আমি তাঁর কাছে থেকে গেলাম। তাঁর চালচলন আমার ভালোই লাগলো। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। তাঁর মরণ সময় নিকটবর্তী হলে আমি তাঁকে বললাম ঃ

— জনাব, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আল্লাহর ফায়সালা আপনার কাছে এসে গেছে। আর আমার ব্যাপারটি তো আপনি অবগত আছেন। এখন আমাকে কার কাছে যাওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন?

বললেন ঃ বেটা, আমরা যে জিনিসের ওপর ছিলাম, তার ওপর অটল আছে এমন কাউকে তো আমি জানিনা। তবে 'নাস্‌সিবীনে' অমুক নামে এক ব্যক্তি আছেন, তুমি তাঁর সাথে মিলতে পার।

তাঁকে কবর দেওয়ার পর আমি নাস্‌সিবীনের সেই লোকটির সাথে সাক্ষাত করলাম এবং আমার সমস্ত কাহিনী তাঁকে খুলে বললাম। তিনি আমাকে তাঁর কাছে থেকে যেতে বললেন। আমি থেকে গেলাম। এ ব্যক্তিকেও পূর্ববর্তী দু'বন্ধুর মত নিষ্কলুষ চরিত্রের দেখতে পেলাম। আল্লাহর কি মহিমা, অল্পদিনের মধ্যে তিনি মারা গেলেন। অন্তিম

সময়ে তাঁকে আমি বললাম ঃ আমার সম্পর্কে আপনি মোটামুটি সব কথা জানেন। এখন আমাকে কার কাছে যেতে বলেন?

তিনি বললেন ঃ অমুক নামে 'আম্মুরিয়াতে' এক লোক আছেন, তুমি তাঁরই সুহবত অবলম্বন করবে। এছাড়া আমাদের এ সত্যের ওপর অবশিষ্ট আর কাউকে তো আমি জানিনা। তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে আমি আমার সব কথা বললাম।

আমার কথা শুনে তিনি বললেন ঃ আমার কাছে থাক। আল্লাহর কসম, তাঁর কাছে থেকে আমি দেখতে পেলাম তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সংগীদের মত একই মত ও পথের অনুসারী। তাঁর কাছে থাকাকালেই আমি অনেকগুলি গরু ও ছাগলের অধিকারী হয়েছিলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পূর্ববর্তী সংগীদের যে পরিণতি দেখেছিলাম, সেই একই পরিণতি তাঁরও ভাগ্যে আমি দেখতে পেলাম। তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে আমি তাঁকে বললাম ঃ আমার অবস্থা তো আপনি ভালোই জানেন। এখন আমাকে কি করতে বলেন, কার কাছে যেতে পরামর্শ দেন?

বললেন ঃ বৎস! আমরা যে সত্যকে ধরে রেখেছিলাম, সে সত্যের ওপর ভূ-পৃষ্ঠে অন্য কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট আছে বলে আমার জানা নেই। তবে, অদূর ভবিষ্যতে আরব দেশে একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তিনি ইবরাহীমের দ্বীন নতুনভাবে নিয়ে আসবেন। তিনি তাঁর জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে বড় বড় কালো পাথরের যমীনের মাঝখানে খেজুর উদ্যানবিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরাত করবেন। দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শনও তাঁর থাকবে। তিনি হাদিয়ার জিনিস তো খাবেন; কিন্তু সাদকার জিনিস খাবেন না। তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে নবুওয়াতের মোহর থাকবে। তুমি পারলে সে দেশে যাও।

এরপর তিনি মারা গেলেন। আমি আরো কিছুদিন আম্মুরিয়াতে কাটালাম। একদিন সেখানে 'কালব' গোত্রের কিছু আরব ব্যবসায়ী এলো। আমি তাদেরকে বললাম ঃ আপনারা যদি আমাকে সংগে করে আরব দেশে নিয়ে যান, বিনিময়ে আমি আপনাদেরকে আমার এ গরু ছাগলগুলি দিয়ে দেব। তাঁরা বললেন ঃ ঠিক আছে, আমরা তোমাকে সংগে করে নিয়ে যাব।

আমি তাঁদেরকে গরু-ছাগলগুলি দিয়ে দিলাম। তাঁরা আমাকে সংগে নিয়ে চললেন। যখন আমরা মদীনা ও শামে'র মধ্যবর্তী 'ওয়াদী আল-কুরা' নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন তাঁরা আমার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে এক ইহুদীর কাছে আমাকে বিক্রি করে দিল। আমি তার দাসত্ব শুরু করে দিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই বনী কুরাইজা গোত্রের তার এক চাচাতো ভাই আমাকে খরীদ করে এবং আমাকে 'ইয়াসরিবে' (মদীনা) নিয়ে আসে। এখানে আমি আম্মুরিয়ার বন্ধুটির বর্ণিত সেই খেজুর গাছ দেখতে পেলাম এবং তিনি স্থানটির যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, সে অনুযায়ী শহরটিকে চিনতে পারলাম। এখানে আমি আমার মনিবের সাথে কাটাতে লাগলাম।

নবী (সা) তখন মক্কায় দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। কিন্তু দাস হিসাবে সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁর সম্পর্কে কোন কথা বা আলোচনা আমার কানে পৌঁছেনি। কিছুদিনের

মধ্যে রাসূল (সা) মক্কা থেকে হিজরাত করে ইয়াসরিবে এলেন। আমি তখন একটি খেজুর গাছের মাথায় উঠে কি যেন কাজ করছিলাম, আমার মনিব গাছের নীচেই বসে ছিলো। এমন সময় তার এক ভাতিজা এসে তাকে বললো ঃ

আল্লাহ বনী কায়লাকে (আউস ও খাজরাজ গোত্র) ধ্বংস করুন। কসম খোদার, তারা এখন কুবাতে মক্কা থেকে আজই আগত এক ব্যক্তির কাছে সমবেত হয়েছে, যে কিনা নিজেকে নবী বলে মনে করে।

তার কথাগুলি আমার কানে যেতেই আমার গায়ে যেন জ্বর এসে গেল। আমি ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করলাম। আমার ভয় হলো, গাছের নীচে বসা আমার মনিবের ঘাড়ের ওপর ধপাস করে পড়ে না যাই। তাড়াতাড়ি আমি গাছ থেকে নেমে এলাম এবং সেই লোকটিকে বললাম ঃ

– তুমি কি বললে? কথাগুলি আমার কাছে আবার বলো তো।

আমার কথা শুনে আমার মনিব রেগে ফেটে পড়লো এবং আমার গালে সজোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে বললো ঃ

– এর সাথে তোমার সম্পর্ক কি? যাও, তুমি যা করছিলে তাই কর।

সেদিন সন্ধ্যায় আমার সংগৃহীত খেজুর থেকে কিছু খেজুর নিয়ে রাসূল (সা) যেখানে অবস্থান করছিলেন সেদিকে রওয়ানা হলাম। রাসূলের (সা) নিকট পৌঁছে তাঁকে বললাম ঃ

– আমি শুনেছি আপনি একজন পুণ্যবান ব্যক্তি। আপনার কিছু সহায়-সম্বলহীন সঙ্গী-সাথী আছেন। এ সামান্য কিছু জিনিস সদকার উদ্দেশ্যে আমার কাছে জমা ছিল, আমি দেখলাম অন্যদের তুলনায় আপনারাই এগুলি পাওয়ার অধিক উপযুক্ত। এ কথা বলে খেজুরগুলি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। তিনি সঙ্গীদের বললেন ঃ তোমরা খাও। কিন্তু তিনি নিজের হাতটি গুটিয়ে নিলেন, কিছুই খেলেন না। মনে মনে আমি বললাম ঃ এ হলো একটি।

সেদিন আমি ফিরে এলাম। আমি আবারও কিছু খেজুর জমা করতে লাগলাম। রাসূল (সা) কুবা থেকে মদীনায় এলেন। আমি একদিন খেজুরগুলি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম ঃ 'আমি দেখেছি, আপনি সদকার জিনিস খাননা। তাই এবার কিছু হাদিয়া নিয়ে এসেছি, আপনাকে দেয়ার উদ্দেশ্যে।' এবার তিনি নিজে খেলেন এবং সঙ্গীদের আহ্বান জানালেন তাঁরাও তাঁর সাথে খেলেন। আমি মনে মনে বললাম ঃ এ হলো দ্বিতীয়টি।

তারপর অন্য একদিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গেলাম। তিনি তখন 'বাকী আল-গারকাদ' গোরস্থানে তাঁর এক সঙ্গীকে দাফন করছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি গায়ে 'শামলা' (এক ধরনের ঢিলা পোশাক) জড়িয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর আমি তাঁর পেছনের দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে লাগলাম। আমি খুঁজতে লাগলাম, আমার সেই আম্মুরিয়ার বন্ধুটির বর্ণিত নবুওয়াতের মোহরটি।

রাসূল (সা) আমাকে তাঁর পিঠের দিকে ঘন ঘন তাকাতে দেখে আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁর পিঠের চাদরটি সরিয়ে নিলেন এবং আমি মোহরটি স্পষ্ট

দেখতে পেলাম। আমি তখন পরিষ্কারভাবে তাঁকে চিনতে পারলাম এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাঁকে চুমুতে চুমুতে ভরে দিলাম ও কেঁদে চোখের পানিতে বুক ভাসালাম। আমার এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ

– তোমার খবর কি?

আমি সব কাহিনী খুলে বললাম। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং আমার মুখ দিয়েই এ কাহিনীটি তাঁর সংগীদের শোনাতে চাইলেন। আমি তাঁদেরকেও শোনালাম। তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন, খুবই আনন্দিত হলেন।

দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার কারণে সালমান (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। ফলে তিনি খুবই মর্মজ্বালা ভোগ করতে থাকেন। সালমান বলেন ঃ 'একদিন রাসূল (সা) আমাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি তোমার মনিবের সাথে মুকাতাবা (চুক্তি) কর। আমি চুক্তি করলাম, তাকে আমি তিন শ' খেজুরের চারা লাগিয়ে দেব এবং সেই সাথে চল্লিশ 'উকিয়া স্বর্ণও দেব। আর বিনিময়ে আমি মুক্তি লাভ করবো। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) এ চুক্তির কথা অবহিত করলাম। তিনি সাহাবীদেরকে ডেকে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের এ ভাইকে সাহায্য কর। তারা প্রত্যেকেই আমাকে পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশটি করে যে যা পারলেন চারা দিলেন। এভাবে আমার তিনশ' চারা সংগ্রহ হয়ে গেল। তারপর আমি রাসূলের (সা) নির্দেশে গর্ত খুড়লাম। তিনি নিজেই একদিন আমার সাথে সেখানে গেলেন। আমি তাঁর হাতে একটি করে চারা তুলে দিলাম, আর তিনি সেটা রোপন করলেন। আল্লাহর কসম, তাঁর একটি চারাও মারা যায়নি। (ঐতিহাসিকরা বলছেন, সালামান (রা) একটি মাত্র চারা রোপন করেছিলেন, আর সেটাই মারা যায়। বাকী সবগুলিই রাসূল (সা) রোপন করেছিলেন এবং সবগুলিই বেঁচে যায়।) এভাবে আমি আমার চুক্তির একাংশ পূরণ করলাম, বাকী থাকলো অর্থ।

একদিন রাসূল (সা) আমাকে ডেকে মুরগীর ডিমের মত দেখতে স্বর্ণজাতীয় কিছু পদার্থ আমার হাতে দিয়ে বললেন, যাও, তোমার চুক্তি মুতাবিক পরিশোধ কর। আমি বললাম, এতে কি তা পরিশোধ হবে? তিনি বললেন ঃ 'ধর, আল্লাহ এতেই পরিশোধ করবেন।' আল্লাহর কসম, আমরা ওজন করে দেখলাম তাতে চল্লিশ উকিয়াই আছে।

এভাবে সালমান (রা) তার চুক্তি পূরণ করে মুক্তিলাভ করেন। গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে হযরত সালমান (রা) মুসলমানদের সাথে বসবাস করতে থাকেন। তখন তাঁর কোন ঘড়-বাড়ী ছিল না। রাসূল (সা) অন্যান্য মুহাজিরদের মত প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী আবু দারদার (রা) সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। গোলামীর কারণে হযরত সালমান (রা) বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। গোলামী থেকে মুক্ত হওয়ার পর খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে পূর্ববর্তী দু'টি যুদ্ধে অনুপস্থিতির ক্ষতি পুষিয়ে নেন। সারা আরবের বিভিন্ন গোত্র কুরাইশদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। খবর পেয়ে রাসূল (সা) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দেন। হযরত সালমান বলেন, পারস্যে পরিখা খনন করে নগরের হিফাজত করা হয়। মদীনার অরক্ষিত দিকে পরিখা

খনন করে নগরীর হিফাজত করা সমীচীন। এ পরামর্শ রাসূলুল্লাহর (সা) মনঃপূত হয়। মদীনার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে সুদীর্ঘ পরিখা খনন করে বিশাল কুরাইশ বাহিনীর আক্রমণ সহজে প্রতিরোধ করা হয়। রাসূল (সা) নিজেও এই পরিখা বা খন্দক খননের কাজে অংশগ্রহণ করেন। কুরাইশ বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে এসে এ অপূর্ব রণ-কৌশল দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। ২১/২২ দিন মদীনা অবরোধ করে বসে থাকার পর শেষে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। খন্দকের পর যত যুদ্ধ হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে হযরত সালমান অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হযরত সালমান বেশ কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করেন। সম্ভবতঃ হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতের শেষ অথবা হযরত 'উমারের খিলাফতের প্রথম দিকে তিনি ইরাকে এবং তাঁর দ্বীনী ভাই আবু দারদা (রা) সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি হযরত উমারের যুগে ইরান বিজয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম মুজাহিদদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ করেন। জালুলু বিজয়েও তিনি অংশগ্রহণ করেন। হযরত উমার (রা) তাঁকে মাদায়েনের ওয়ালী নিযুক্ত করেন। হযরত উসমানের খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সালমানের জীবনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হয় রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবতে। এ কারণে তিনি ইলম ও মা'রেফাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। হযরত আলীকে (রা) তাঁর ইল্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন ঃ 'সালমান ইলম ও হিকমতের ক্ষেত্রে লুকমান হাকীমের সমতুল্য।' অন্য একটি বর্ণনা মতে তিনি বলেন ঃ 'ইলমে আউয়াল ও ইলমে আখের সকল ইলমের আলিম ছিলেন তিনি।' ইলমে আখের অর্থ কুরআনের ইলম। আরবে তার কোন আত্মীয় ও খান্দান ছিল না, তাই রাসূল (সা) তাঁকে আহলে বাইতের সদস্য বলে ঘোষণা করেন। হযরত মুয়াজ বিন জাবাল, যিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলিম ও মুজতাহিদ সাহাবী, বলেন ঃ চার ব্যক্তি থেকে ইলম হাসিল করবে। সেই চারজনের একজন সালমান।

হযরত সালমান থেকে ষাটটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি মুত্তাফাক আলাইহি, একটি মুসলিম ও তিনটি বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী, আবুত তুফাইল, ইবন আব্বাস, আউস বিন মালিক ও ইবন আজযা (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী তাঁর ছাত্র ছিলেন।

হযরত সালমান সেইসব বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ 'রাসূল (সা) যেদিন রাতে সালমানের সাথে নিভৃতে আলোচনা করতে বসতেন, আমরা তাঁর স্ত্রীরা ধারণা করতাম সালমান হয়তো আজ আমাদের রাতের সান্নিধ্যটুকু কেড়ে নেবে।'

যুহ্দ ও তাকওয়ার তিনি ছিলেন বাস্তব নমুনা। ক্ষণিকের মুসাফির হিসেবে তিনি জীবন যাপন করেছেন। জীবনে কোন বাড়ী তৈরী করেননি। কোথাও কোন প্রাচীর বা গাছের ছায়া পেলে সেখানেই শুয়ে যেতেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে ইজাযত চাইলো, তাঁকে একটি ঘর বানিয়ে দেওয়ার। তিনি নিষেধ করলেন। বার বার পীড়াপীড়িতে শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন ঘর বানাবে? লোকটি বললো ঃ এত ছোট যে, দাঁড়ালে মাথায়

চাল বেঁধে যাবে এবং শুইয়ে পড়লে দেয়ালে পা ঠেকে যাবে। এ কথায় তিনি রাজী হলেন। তাঁর জন্য একটি ঝুপড়ি ঘর তৈরী করা হয়। হযরত হাসান (রা) বলেন ঃ 'সালমান যখন পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা পেতেন, তিরিশ হাজার লোকের উপর প্রভুত্ব করতেন তখনও তাঁর একটি মাত্র 'আবা' ছিল। তার মধ্যে ভরে তিনি কাঠ সংগ্রহ করতেন। ঘুমানোর সময় আবাটির এক পাশ গায়ে দিতেন এবং অন্য পাশ বিছাতেন।'

হযরত সালমান (রা) যখন অন্তিম রোগ শয্যায়, হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) তাঁকে দেখতে যান। সালমান (রা) কাঁদতে শুরু করলেন। সা'দ বললেন ঃ আবু আবদিল্লাহ, কাদছেন কেন? রাসূল (সা) তো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। হাউজে কাওসারের নিকট তাঁর সাথে আপনি মিলিত হবেন। বললেন ঃ আমি মরণ ভয়ে কাঁদছিনে। কান্নার কারণ হচ্ছে, রাসূল (সা) আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমাদের সাজ-সরঞ্জাম যেন একজন মুসাফিরের সাজ-সরঞ্জাম থেকে বেশী না হয়। অথচ আমার কাছে এতগুলি জিনিসপত্র জমা হয়ে গেছে। সা'দ বলেন ঃ সেই জিনিসগুলি একটি বড় পিয়ালা, তামার একটি থালা ও একটি পানির পাত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

উসামা ইবন যায়িদ (রা)

হিজরাতের পূর্বে মক্কায় নবুওয়াতের সপ্তম বছর চলছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা তখন কুরাইশদের চরম বাড়াবাড়ির শিকার। ইসলামী দাওয়াতের কঠিন দায়িত্ব ও বোঝা পালন করতে গিয়ে পদে পদে তিনি নানা রকম দুঃখ বেদনা ও মুসীবতের সম্মুখীন হচ্ছেন। এমন সময় তাঁর জীবনে একটু খুশির আলোক আভা দেখা দিল। সুসংবাদ দানকারী খুশীর বার্তা নিয়ে এলো, 'উম্মু আয়মন' একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সেই সৌভাগ্যবান নবজাতক, যার ধরাপৃষ্ঠে আগমন সংবাদে আল্লাহর রাসূল এত উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তিনি উসামা ইবন যায়িদ।

শিশুটির ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদে রাসূলুল্লাহর (সা) এত উৎফুল্ল হওয়াতে সাহাবীরা কিন্তু বিস্মিত হননি। কারণ, রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট শিশুটির মাতা-পিতার স্থান সম্পর্কে সবাই অবগত ছিলেন। শিশুটির মা 'বারাকা আল হাবাশিয়্যা'– যিনি 'উম্মু আয়মান' নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) জননী হযরত আমিনার দাসী। তাঁর জীবনকালে এবং ওয়াফাতের পরও এ মহিলা রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রতিপালন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) দুনিয়াতে চোখ মেলে তাঁকেই মা বলে বুঝতে শেখেন। অত্যন্ত গভীর ও অকৃত্রিমভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ভালোবাসেন। প্রায়ই তিনি বলতেন ঃ 'আমার মায়ের পর ইনিই আমার মা এবং আমার আহলদের অবশিষ্ট ব্যক্তি। এ সম্মানিত মহিলাই হচ্ছেন এ নবজাতকের গৌরবান্বিত মা।

শিশুটির পিতা হলেন রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহভাজন, ইসলাম-পূর্ব যুগের ধর্মপুত্র, বিশ্বস্ত সংগী, ইসলামের পর রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি— যায়িদ ইবন হারিসা (রা)।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মক্কার সমগ্র মুসলিম সমাজ শিশুটির ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদে উৎফুল্ল হয়েছিল। শিশুর পিতাকে যেমন তারা উপাধি দিয়েছিল 'হিববু রাসূলিল্লাহ', তেমনি তারা তাকে উপাধি দিল 'ইবনুল হিব্ব' বা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রীতিভাজনের পুত্র। তাদের এ উপাধি দান কিন্তু যথার্থই হয়েছিল। রাসূল (সা) তাকে এত অধিক ভালোবেসেছিলেন যে, তা দেখে বিশ্ববাসীর ঈর্ষা হয়। উসামা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) দৌহিত্র হাসান ইবন ফাতিমার সমবয়সী। হাসান ছিলেন তাঁর নানা রাসূলুল্লাহর (সা) মত দারুণ সুন্দর। আর উসামা ছিলেন তাঁর হাবশী মা'র মত কালো ও খাঁদা নাক বিশিষ্ট। কিন্তু রাসূল (সা) তাদের দু'জনকে স্নেহ ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে মোটেই কম বেশী করতেন না। তিনি উসামাকে বসাতেন এক উরুর ওপর এবং হাসানকে অন্য উরুর ওপর। তারপর দু'জনকে একসাথে বুকের মাঝে চেপে ধরে বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ, আমি তাদের দু'জনকে ভালোবাসি, তুমিও তাদের উভয়কে ভালোবাস।'

শিশু উসামার প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহ ও ভালোবাসা কত গভীর ও প্রবল ছিল তা বুঝা যায় একটি ঘটনা দ্বারা। শিশু উসামা একবার দরজার চৌকাঠে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। তার কপাল কেটে রক্ত বের হতে লাগলো। রাসূল (সা) প্রথমে হযরত

আয়িশাকে (রা) রক্ত মুছে দিতে বললেন। কিন্তু তাতে স্বস্তি পেলেন না। তিনি নিজেই উঠে গিয়ে রক্ত মুছে ক্ষতস্থানে চুমু দিতে লাগলেন এবং মিষ্টি মধুর ও দরদ মিশ্রিত কথা বলে তাকে শান্ত করতে লাগলেন।

শৈশবের মত যৌবনেও উসামা রাসূলুল্লাহর (সা) ভালোবাসা লাভ করেন। একবার কুরাইশদের অন্যতম নেতা হাকীম ইবন হিযাম ইয়ামনের 'যী ইয়াযিন' বাদশার একখানা মূল্যবান চাদর ইয়ামন থেকে পঞ্চাশ দীনার দিয়ে খরীদ করেন। চাদরখানি তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) উপহার দিতে চাইলে তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ, হাকীম তখনও মুশরিক ছিলেন। তবে রাসূল (সা) তাঁর নিকট থেকে অর্থের বিনিময়ে চাদরখানি খরিদ করেন। এক জুমআর দিন একবার মাত্র সে চাদরখানি রাসূল (সা) পরেন। তারপর তিনি তা উসামার গায়ে পরিয়ে দেন। উসামা সে চাদরখানি প'রে তার সমবয়সী মুহাজির ও আনসার যুবকদের সাথে সকাল সন্ধ্যা ঘুরে বেড়াতেন।

যৌবনে উসামার মধ্যে এমন সব চারিত্রিক সৌন্দর্য ও গুণাবলী বিকশিত হলো যা সহজেই রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহ ও ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তীক্ষ্ণ মেধা, দুঃসাহস, বিচক্ষণতা, পূতঃপবিত্র চরিত্র এবং তাকওয়া ও পরহিযগারী ছিল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

উহুদ যুদ্ধের দিন উসামা তাঁর সমবয়সী আরো কতিপয় কিশোর সাহাবীর সাথে উপস্থিত হলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে। তাদের সবার ইচ্ছা জিহাদে অংশগ্রহণ করা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের মধ্য থেকে কয়েক জনকে নির্বাচন করলেন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে অন্যদের ফিরিয়ে দিলেন। উসামা প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাড়ীতে ফিরছেন। চোখ দু'টি তাঁর পানিতে টলমল। তাঁর ব্যথা, রাসূলুল্লাহর (সা) পতাকাতলে জিহাদের সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন।

খন্দকের যুদ্ধ সমুপস্থিত। উসামাও হাজির। তাঁর সাথে আরো কয়েকজন কিশোর সাহাবী। রাসূলুল্লাহ (সা) সৈনিক বাছাই করছেন। উহুদের মত এবারো তাঁকে ছোট বলে বাদ দেওয়া না হয়, এজন্য পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর আগ্রহ দেখে রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তর নরম হলো। তাকে নির্বাচন করলেন। তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে উসামা চললেন জিহাদে। তিনি তখন ১২/১৩ বছরের এক কিশোর।

কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে প্রথম পর্যায়ের অভিযান সমূহে তিনি অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি। 'হারকা' অভিযানে তিনি সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ করেন। সাত অথবা আট হিজরীতে এ অভিযান পরিচালিত হয়। তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ। কিন্তু তাঁর সীমাহীন যোগ্যতার কারণে রাসূল (সা) তাঁকে অভিযানের নেতৃত্ব দান করেন। এ অভিযানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন ঃ 'রাসূল (সা) আমাদেরকে 'হারকা'র দিকে পাঠালেন। শত্রুরা পরাজিত হয়ে পালাতে শুরু করলো। আমি এক আনসারী সিপাহীর সাথে পলায়নরত এক সৈনিকের পিছু ধাওয়া করলাম। যখন সে আমাদের নাগালের মধ্যে এসে গেল, জোরে জোরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে উঠলো। তার এ ঘোষণায় আনসারী হাত গুটিয়ে নিল; কিন্তু আমি বর্শা ছুড়ে তাকে গেঁথে ফেললাম। সে মারা গেল। অভিযান থেকে ফেরার পর বিষয়টি রাসূলুল্লাহর (সা)

কর্ণগোচর হলো। তিনি আমাকে বললেন ঃ উসামা, কালিমা তাইয়্যেবা পড়ার পর তুমি একটি লোককে হত্যা করেছ! আমি বললাম, প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে এমনটি করেছে। তিনি আমার কথায় কান দিলেন না। একই কথা বার বার আওড়াতে লাগলেন। আমি তখন এত অনুতপ্ত হলাম যে, মনে মনে বললাম, 'হায়! আজকের পূর্বে যদি আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) তাঁকে বলেন ঃ 'তুমি তার অন্তর ফেঁড়ে দেখলে না কেন?'

হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়ে পালাতে লাগলো। উসামা তখন রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা আব্বাস, আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিসসহ মাত্র ছ'জন সাহাবীর সাথে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে অটল হয়ে রুখে দাঁড়ালেন। বীর বিশ্বাসীদের ক্ষুদ্র এই দলটির সাহায্যে রাসূলুল্লাহ (সা) সেদিন নিশ্চিত পরাজয়কে বিজয়ের রূপদান করেন এবং পলায়নরত মুসলিম বাহিনীকে মুশরিক বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেন।

মক্কা বিজয়েও উসামা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সংগী। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একই বাহনে সওয়ার হয়ে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে উসামা, বিলাল ও উসমান ইবন তালহা এ তিন ব্যক্তিই সেদিন কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এ চারজনের পরই কা'বার দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

উসামা তাঁর পিতা সেনাপতি যায়িদ ইবন হারিসার সাথে মুতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন তার বয়স আঠারো বছরেরও কম। এ যুদ্ধে তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন পিতার শাহাদাত। তবে তিনি মুষড়ে পড়েননি। পিতার শাহাদাত বরণের পর যথাক্রমে জা'ফর ইবন আবী তালিব ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার নেতৃত্বে বাহাদুরের মত লড়াই করেন। যায়িদের মত এ সেনাপতিও শাহাদাত বরণ করলে তিনি সেনাপতি খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন এবং মুসলিম বাহিনীকে রোমান বাহিনীর পাঞ্জা থেকে উদ্ধার করেন। মুতার প্রান্তরে পিতা যায়িদের মরদেহ আল্লাহর হাওয়ালা করে যে ঘোড়ার ওপর তিনি শহীদ হয়েছিলেন, তার ওপর সওয়ার হয়ে তিনি মদীনায় ফিরে এলেন।

একাদশ হিজরীতে রাসূল (সা) রোমান বাহিনীর সাথে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু বকর, 'উমার, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্ প্রমুখ প্রথম কাতারের সমর বিশারদ সাহাবী এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হলেন। রাসূল (সা) উসামা বিন যায়িদকে এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করেন। তখন তাঁর বয়স বিশের কাছাকাছি। রাসূল (সা) গাযা উপত্যকার নিকটবর্তী 'বালকা' ও 'দারূম আল কিলয়ার' আশে পাশে সীমান্তে ছাউনি ফেলার নির্দেশ দিলেন।

বাহিনী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো। এদিকে রাসূল (সা) পীড়িত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহর (সা) রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাহিনীসহ তিনি যাত্রাবিরতি করে মদীনার উপকণ্ঠে 'জুরুফ' নামক স্থানে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। সেখান থেকে প্রতিদিন তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখতে আসতেন। উসামা বলেন 'রাসূলুল্লাহর (সা) রোগ বৃদ্ধি পেলে আমি দেখতে গেলাম। আরো অনেকে আমার সংগে ছিলেন। ঘরে প্রবেশ করে

দেখলাম, রাসূল (সা) চুপ করে আছেন। রোগের প্রচণ্ডতায় তিনি কথা বলতে পারছেন না। আমাকে দেখে প্রথমে তিনি আসমানের দিকে হাত উঠালেন, তারপর আমার শরীরের ওপর হাত রাখলেন। আমি বুঝলাম, তিনি আমার জন্য দু'আ করছেন।'

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল হলো। খবর পেয়ে তিনি মদীনায় ছুটে এলেন এবং কাফন দাফনে অংশগ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মরদেহ কবরে নামানোর সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন।

হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন। তিনি উসামাকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আনসারদের ছোট্ট একটি দল মনে করলেন এ মুহূর্তে বাহিনীর যাত্রা একটু বিলম্ব করা উচিত। এ ব্যাপারে খলীফার সাথে কথা বলার জন্য তাঁরা হযরত উমারকে (রা) অনুরোধ করলেন। তাঁরা উমারকে এ কথাও বললেন, যদি তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, তাহলে অন্ততঃ তাঁকে অনুরোধ করবেন, উসামা থেকে একজন অধিক বয়সের লোককে যেন আমাদের সেনাপতি নিয়োগ করেন।

হযরত আবু বকর বসে ছিলেন। হযরত 'উমারের (রা) মুখে আনসারদের বক্তব্য শোনার সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং ফারুকে আজমের দাঁড়ি মুট করে ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ 'ওহে খাত্তাবের পুত্র! আপনার মা নিপাত যাক! আপনি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিয়োগ করা ব্যক্তিকে অপসারণ করতে? আল্লাহর কসম, আমার দ্বারা কক্ষণো তা হবেনা।'

'উমার (রা) ফিরে এলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, সমাচার কি? বললেন ঃ তোমাদের সকলের মা নিপাত যাক! তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের খলীফার নিকট থেকে অনেক কিছুই আমাকে শুনতে হলো।

যুবক কমাণ্ডারের নেতৃত্বে বাহিনী মদীনা থেকে রওয়ানা হলো। খলীফা আবু বকর (রা) চললেন কিছুদূর এগিয়ে দিতে। উসামা ঘোড়ার পিঠে, খলীফা পায়ে হেঁটে। উসামা বললেন ঃ 'হে রাসূলুল্লাহর (সা) খলীফা! আল্লাহর কসম, হয় আপনি ঘোড়ায় উঠুন, না হয় আমি নেমে পড়ি।' খলীফা বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম, তুমিও নামবে না, আমিও উঠবো না। কিছুক্ষণ আল্লাহর পথে আমার পদযুগল ধুলিমলিন হতে দোষ কি?' তারপর উসামাকে বললেন ঃ 'তোমার দ্বীন, তোমার আমানতদারী এবং তোমার কাজের সমাপ্তি আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) যে নির্দেশ তোমাকে দিয়েছেন, তা কার্যকর করার উপদেশ তোমাকে দিচ্ছি।' তারপর উসামার দিকে একটু ঝুঁকে বললেন ঃ 'তুমি যদি 'উমারের দ্বারা আমাকে সাহায্য করা ভালো মনে কর, তাকে আমার কাছে থেকে যাওয়ার অনুমতি দাও।' উসামা আবু বকরের আবেদন মঞ্জুর করলেন। উমারকে মদীনায় খলীফার সংগে থাকার অনুমতি দিলেন।

উসামা রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেন। মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী ফিলিস্তিনের 'বালকা' ও 'কিলায়াতুত দারূম' সীমান্ত পদানত করে। ফলে এ অঞ্চল থেকে মুসলমানদের জন্য রোমান ভীতি চিরতরে দূরীভূত হয় এবং গোটা সিরিয়া, মিসর ও উত্তর আফ্রিকাসহ কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের বিজয়দ্বার উন্মুক্ত হয়।

এ অভিযানে তিনি তাঁর পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেন। যে ঘোড়ার ওপর তাঁর পিতা শহীদ হয়েছিলেন, তার পিঠে বিপুল পরিমাণ গনিমাতের ধন সম্পদ বোঝাই করে তিনি বিজয়ীর বেশে মদীনায় ফিরে এলেন। খলীফা আবু বকর (রা) মুহাজির ও আনসারদের বিরাট একটি দল সহ মদীনার উপকণ্ঠে তাঁকে স্বাগত জানান। উসামা মদীনায় পৌঁছে মসজিদে নববীতে দু'রাকায়াত নামায আদায় করে বাড়ী যান। ঐতিহাসিরা তাঁর এ বিজয় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ 'উসামার বাহিনী অপেক্ষা অধিকতর নিরাপদ ও গনিমাত লাভকারী অন্য কোন বাহিনী আর দেখা যায়নি।'

রাসূলুল্লাহর (সা) অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন এবং প্রখর ব্যক্তিত্বের জন্য উসামা মুসলিম সমাজের ব্যাপক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা) নিজ পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার অপেক্ষা উসামার ভাতা বেশী নির্ধারণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগ করেন ঃ 'আব্বা, উসামার ভাতা চার হাজার, আর আমার ভাতা তিন হাজার। আমার পিতা অপেক্ষা তাঁর পিতা অধিক মর্যাদাবান ছিলেন না এবং আমার থেকেও তাঁর মর্যাদা বেশী নয়।' জবাবে হযরত উমার বলেন ঃ 'আফসোস! তোমার পিতার চেয়ে তার পিতা রাসূলুল্লাহর (সা) অধিক প্রিয় ছিলেন এবং তোমার থেকেও সে রাসূলুল্লাহর (সা) বেশী প্রিয় ছিল।' হযরত আবদুল্লাহ (রা) আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি।

উসামার সাথে খলীফা 'উমারের দেখা হলেই বলতেন ঃ 'স্বাগতম, আমার আমীর।' এমন সম্বোধনে কেউ বিস্মিত হলে তিনি বলতেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে আমার আমীর বা নেতা বানিয়েছিলেন।

হযরত উসমানের (রা) খিলাফতকালে ফিতনা-ফাসাদের আশংকায় রাষ্ট্রীয় কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। তবে হিতাকাংখী মুসলিম হিসাবে সর্বদা খলীফাকে সৎ পরামর্শ দিতেন এবং গোপনে গণ-অসন্তোষের বিষয়ে খলীফার সাথে আলোচনা করতেন।

হযরত উসমানের শাহাদাতের পর যখন বিশৃংখলা দেখা দিল, তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলেন। হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার বিরোধ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকলেন। এ সময় হযরত আলীকে একবার তিনি বলে পাঠালেন, 'আপনি যদি বাঘের চোয়ালের মধ্যে ঢুকতেন, আমিও সন্তুষ্টচিত্তে ঢুকে যেতাম। কিন্তু এ ব্যাপারে অংশগ্রহণের আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।' মুসলমানদের রক্তপাতের ভয়ে যদিও তিনি এ দ্বন্দ্বে জড়াতে চাননি, তবে তিনি আলীকে (রা) সত্যপন্থী বলে মনে করতেন। এ কারণে, আলীকে সাহায্য না করার জন্য শেষ জীবনে তাওবাহ করেছেন।

হযরত উসামা প্রতিপালিত হয়েছিলেন নবীগৃহে। এ কারণে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া তাঁর উচিত ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) ওয়াফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র আঠারো বছর। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহর (সা) দীর্ঘ সাহচর্য লাভের সুযোগ তিনি পাননি। এ কারণে, এ ক্ষেত্রে তিনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন উমার প্রমুখ বিদ্বান সাহাবীদের মত আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেননি। তা সত্ত্বেও যা তিনি অর্জন করেছিলেন তা মোটেও অকিঞ্চিৎকর নয়। তিনি নবীর (সা) বহু বাণী স্মৃতিতে

সংরক্ষণ করেছিলেন। বিশিষ্ট সাহাবীরাও মাঝে মাঝে শরীয়াতের নির্দেশ জানার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হতেন। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস 'তাউন' বা প্লেগ সম্পর্কে শরীয়াতের কোন নির্দেশ না পেয়ে উসামাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তাউন' বা প্লেগ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে কিছু শুনেছেন কি? তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি বাণী সা'দের নিকট বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সর্বমোট একশ' আটাশটি। তন্মধ্যে পনেরটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। হযরত হাসান, মুহাম্মাদ ইবন আব্বাস, আবু হুরাইরা, কুরাইব, আবু উসমান নাহদী, 'আমর ইবন উসমান, আবু ওয়ায়িল, আমের ইবন সা'দ, হাসান বসরী (রা) প্রমুখ সাহাবী ও তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যেহেতু নবীগৃহে তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তাঁর যাতায়াত ছিল অবাধ, এ কারণে নবীর (সা) শিক্ষার যথেষ্ট প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল। অধিকাংশ সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একই বাহনে আরোহী হওয়ার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাতের সুযোগও বেশী পরিমাণে লাভ করেন। অজু ও পাক পবিত্রতার পানি তিনিই অধিকাংশ সময় এগিয়ে দিতেন।

অল্প বয়স্ক হওয়া সত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। ইফ্‌ক বা হযরত আয়িশার (রা) প্রতি মুনাফিকদের বানোয়াট ও অশালীন উক্তি ছড়িয়ে পড়লে রাসূল (সা) ঘনিষ্ঠ যে দু'ব্যক্তির সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন, তারা ছিলেন হযরত আলী ও উসামা (রা)।

এ মহান সেনানায়ক হযরত মুয়াবিয়ার খিলাফত কালের শেষ দিকে হিজরী ৫৪ সনে ৬০ বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন।

আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম (রা)

মুয়ায্যিনুর রাসূল হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম সেই মহান সাহাবী যাঁর জন্য সপ্তম আকাশের ওপর থেকে নবী করীমকে (সা) তিরস্কার করা হয়েছে এবং যাঁর শানে আল্লাহর নিকট থেকে হযরত জিবরীল (আ) অহী নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট অবতরণ করেছেন। তিনি সেই গর্বিত মহাপুরুষ যাঁর সম্পর্কে আল-কুরআনের সর্বমোট ষোলটি আয়াত নাযিল হয়েছে।

মদীনাবাসীরা তাঁকে ডাকতেন আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম বলে। তবে ইরাকীদের নিকট তিনি 'উমার ইবন উম্মে মাকতুম' নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশ গোত্রের সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা বিনতু খুওয়ালিদের মামাতো ভাই। তাঁর পিতা কায়েস বিন যায়িদ ও মাতা আতিকা বিনতু আবদিল্লাহ। আবদুল্লাহকে অন্ধ অবস্থায় প্রসব করেন, এ কারণে মা 'আতিকা উম্মু মাকতুম' নামে পরিচিতি লাভ করেন। মাকতুম অর্থ অন্ধ এবং উম্মু মাকতুম— অন্ধের মা।

বাহ্যিক চক্ষু তাঁর ছিল না। তবে একটি তীক্ষ্ম অন্তর্চক্ষু তিনি লাভ করেছিলেন। মক্কায় ইসলামের আলোকরশ্মি আত্মপ্রকাশের সূচনা কালটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তর্চক্ষু উন্মুক্ত করে দেন। তিনি ঈমান আনেন। এভাবে তিনি হলেন ইসলামের প্রথম পর্বের বিশ্বাসীদের অন্যতম। মক্কার মুসলমানদের কুরবানী, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার অংশীদার ছিলেন তিনিও। অন্যদের মত তিনিও শিকার হয়েছিলেন কুরাইশদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের। তাদের হাজারো জুলুম-অত্যাচারে তিনি একটুও দমেননি, একটুও সাহসহারা হননি, অথবা বলা যায়, তাঁর ঈমান কখনো দুর্বল হয়ে পড়েনি। তাদের জুলুম-অত্যাচার যতই বৃদ্ধি পেয়েছিল, তিনিও তত বেশী করে আল্লাহর-দ্বীনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। আর সংগে সংগে আল্লাহর কিতাবের সাথে সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছিল, শরীয়াতের সমঝও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তাঁর সময় অসময়ে যাতায়াতও বেড়ে গিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তাঁর ভক্তি-ভালোবাসা ও পবিত্র কুরআন হিফ্জ করার প্রতি তাঁর আগ্রহ এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, এ ব্যাপারে প্রতিটি সুযোগকে তিনি গনিমত মনে করতেন এবং প্রতিটি মুহূর্তে কাজে লাগাতেন। আগ্রহের আতিশয্যের কারণে অনেক সময় রাসূলুল্লাহর (সা) নিজের জন্য এমনকি অন্যের জন্য নির্ধারিত সময়টুকুতেও তিনি ভাগ বসাতেন।

এটা সেই সময়ের কথা যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার কুরাইশ নেতৃবর্গের ভীষণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তিনি দারুণ আগ্রহী। একদিন তিনি মিলিত হলেন, 'উতবা ইবন রাবীয়া, শায়বা ইবন রাবীয়া, আমর ইবন হিশাম উরফে আবু জাহল, উমাইয়া ইবন খালফ এবং খালিদ সাইফুল্লাহর পিতা ওয়ালিদ ইবন মুগীরার

সাথে। তিনি একেক জনের কাছে যাচ্ছেন, শরাপরামর্শ করছেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন। তিনি আশা করছেন, তারা তাঁর দাওয়াত কবুল করুক অথবা কমপক্ষে তাঁর সংগী-সাথীদের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে বিরত থাকুক। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি ব্যস্ত, এমন সময় সম্পূর্ণ অনাহূতভাবে আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম এসে হাজির। বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তার কিছু আমাকে শিখিয়ে দিন। রাসূল (সা) তাঁর কথায় বিশেষ একটা গুরুত্ব না দিয়ে কুরাইশ নেতৃবর্গের প্রতি মনোযোগী থাকলেন। এই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তাতে আল্লাহর দ্বীনের সম্মান বৃদ্ধি পাবে ও দাওয়াতী কাজের সুবিধা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সাথে আলোচনা-পরামর্শ শেষ করে যেইনা গৃহের দিকে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়েছেন অমনি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পাকড়াও করলেন। তিরস্কার করে অহী নাযিল করলেন ঃ

'সে ভ্রু কুঞ্চিত করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি এলো। তুমি কেমন করে জানবে— সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো। ফলে উপদেশ তার উপকারে আসতো। পক্ষান্তরে যে পরওয়া করেনা, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছো। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নেই। অন্যদিকে যে তোমার দিকে ছুটে এলো, আর সে সশংকচিত্ত, তাকে তুমি অবজ্ঞা করলে। না, এরূপ আচরণ অনুচিত। এ তো উপদেশবাণী। যে ইচ্ছে করবে স্মরণ রাখবে। তা আছে মহান লিপিসমূহে, যা উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন, পবিত্র, মহান, পূত-চরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।' ('আবাসা ঃ ১-১৬)

এই অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুমের শানে মোট ষোলটি আয়াত সহ হযরত জিবরীল আল-আমীন সেদিন অবতরণ করেছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তঃকরণে। আয়াতগুলি আজ পর্যন্ত পঠিত হয়ে আসছে এবং যতদিন এ ধরাপৃষ্ঠে মানব জাতির জীবনধারা অব্যাহত থাকবে ততদিন তা পঠিত হবে। সেই দিন থেকে রাসূল (সা) আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুমকে বিশেষ সমাদর করতেন। তিনি এলে ডেকে কাছে বসাতেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁর কিছু প্রয়োজন থাকলে তা পূরণ করতেন। হযরত আয়িশা (রা) তাঁকে লেবু ও মধুর সরবত বানিয়ে পান করাতেন, তিনি বলেন ঃ 'আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ ছিল তাঁর জন্য নির্ধারিত।' এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, তিনি তো সেই ব্যক্তি যাঁর কারণে সপ্তম আকাশের ওপর থেকে তাঁকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে।

রাসূল (সা) ও মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের কঠোরতা ও অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছেড়ে গেল, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে হিজরাতের অনুমতি প্রদান করলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম ছিলেন তাঁদেরই একজন যারা খুব দ্রুত দ্বীনের খাতিরে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি এবং হযরত মুসয়াব ইবন 'উমাইর (রা) সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা থেকে মদীনায় উপনীত হন। আবদুল্লাহ ইবন উম্মে

মাকতুম মদীনায় পৌঁছে বন্ধু মুসয়াব ইবন উমাইরকে সংগে নিয়ে মানুষের বাড়ীতে যেয়ে যেয়ে কুরআন ও আল্লাহর দ্বীন শিক্ষা দিতে শুরু করেন। হযরত বাররা ইবন আযিব (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হিজরাত করে মদীনায় আমাদের নিকট আসেন মুসয়াব ইবন উমাইর ও ইবন উম্মে মাকতুম (রা)। তাঁরা মদীনায় এসেই আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।'

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করে এলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম ও বিলাল ইবন রাবাহকে মুসলমানদের মুয়ায্‌যিন নিয়োগ করেন। তাঁরা দু'জন ছিলেন মুসলিম উম্মাতের প্রথম মুয়ায্‌যিন। এভাবে তাঁরা প্রতিদিন পাঁচবার কালেমাতুত তাওহীদের প্রচার, মানুষকে সৎকর্মের দিকে আহ্বান ও কল্যাণের প্রতি উৎসাহদানের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন। বিলাল আযান দিতেন, আর ইবন উম্মে মাকতুম দিতেন ইকামাত। মাঝে মাঝে আযান দিতেন ইবন উম্মে মাকতুম, আর ইকামাত দিতেন বিলাল (রা)। রমযান মাসে তাঁরা অন্য একটি কাজও করতেন। মদীনার মুসলমানরা তাঁদের একজনের আযান শুনে সেহরী খাওয়া শুরু করতেন এবং অন্যজনের আযান শুনে খাওয়া বন্ধ করতেন। বিলালের আযান শুনে লোকেরা সেহরীর জন্য জেগে উঠতো। এদিকে আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম প্রতীক্ষায় থাকতেন সুবহে সাদিকের। সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথে তিনি আযান দিতেন, আর সে আযান শুনে লোকেরা খাওয়া বন্ধ করতো।

রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের পর যুদ্ধ-বিগ্রহের পালা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ইবন উম্মে মাকতুম স্বীয় অক্ষমতার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণে অপরাগ ছিলেন। বদর যুদ্ধের পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীর ওপর কিছু আয়াত নাযিল করেন। আয়াতগুলি মুজাহিদদের সুমহান মর্যাদা ও জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে যারা গৃহে অবস্থান করেন, তাদের ওপর মুজাহিদদের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়। আয়াতগুলির বিষয়বস্তু ইবন উম্মে মাকতুমের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুজাহিদদের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তিনি ভীষণ ব্যথিত হন। যখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

—'গৃহে অবস্থানকারী মু'মিনগণ এবং আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদগণ সমমর্যাদার অধিকারী হবে না।' রাসূলুল্লাহ (সা) কাতিবে অহী হযরত যায়িদ বিন সাবিতকে (রা) আয়াতটি লিখতে বললেন। এমন সময় ইবন উম্মে মাকতুম সেখানে পৌঁছলেন। আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সক্ষম হলে আমিও তো জিহাদে অংশগ্রহণ করে মুজাহিদদের মর্যাদা লাভ করতে পারতাম।'

তারপর অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ আমার অপারগতা সম্পর্কে অহী নাযিল করুন, হে আল্লাহ আমার ওজর সম্পর্কে অহী নাযিল করুন।' তাঁর এ আকাঙ্খা আল্লাহর নিকট এতই মনঃপূত হয়েছিল যে, সংগে সংগে

অহী নাযিল করে অনন্তকালের জন্য জগতের সকল অক্ষম ব্যক্তিদের জিহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দান করেন।

নাযিল হয়ঃ لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ اُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ-(سورة النساء ٩٥)

–'ওজরগ্রস্তরা ছাড়া যেসব মুসলমান গৃহে অবস্থান করে, মর্যাদায় তারা তাদের সমকক্ষ নয়, যারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।' এখানে [غَيْرَ اُوْلِى الضَّرَرِ] বাক্যাংশ দ্বারা সকল অক্ষম ব্যক্তিকে জিহাদের হুকুম থেকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করা হয়েছে।

তবে এই হুকুমের কারণে তাঁর জিহাদে গমনের উৎসাহ কমার পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি পেল। তাঁর মহান অন্তঃকরণ অক্ষমদের সাথে ঘরে বসে থাকতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ, মহান অন্তঃকরণ সর্বদাই মহৎ কাজ ছাড়া পরিতুষ্ট হতে পারে না। ইবন হাজার আসকিলানী *'আল ইসাবা'* গ্রন্থে বলেন ঃ অন্ধ হওয়া সত্বেও তিনি কখনও কখনও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। মানুষকে তিনি বলতেন, 'আমার হাতে পতাকা দিয়ে তোমরা আমাকে দু' সারির মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দাও। আমি অন্ধ, পালানোর কোন ভয় নেই।'

হযরত ইবন উম্মে মাকতুম যদিও অক্ষমতার কারণে জিহাদের মর্যাদা লাভে বঞ্চিত ছিলেন, তবে তার থেকে বড় গৌরব ও সম্মান তিনি অর্জন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসারদের সংগে নিয়ে মদীনার বাইরে কোন অভিযানে গমন করতেন, তখন ইবন উম্মে মাকতুমকে স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। এ সময় তিনি মসজিদে নববীতে নামাযের ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। সুতরাং আবওয়ার, বাওয়াত, যুল আসীর, জুহাইনা, সুয়াইক, গাতফান, হামরাউল আসাদ, নাজরান, যাতুর রুকা প্রভৃতি অভিযানের সময় মোট তের বার এ গৌরব তিনি অর্জন করেন। বদর যুদ্ধের সময় কিছুদিন তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরে হযরত আবু লুবাবাকে এ দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর থেকে হযরত উমারের (রা) খিলাফত কালের শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কেবল এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীর পতাকা সমুন্নত রেখেছিলেন। ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর মতে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। তবে ইবন সা'দ তাঁর 'তাবাকাতে' যুবাইর ইবন বাককারের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। অধিকাংশ সীরাত লেখক এই বর্ণনাকে অধিকতর সহীহ মনে করেছেন।

চতুর্দশ হিজরী সনে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সিদ্ধান্ত নিলেন পারস্য বাহিনীর সাথে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের। তিনি বিভিন্ন প্রদেশের ওয়ালীদের লিখলেন ঃ

'যার একখানা হাতিয়ার, একটি ঘোড়া বা উষ্ট্রী অথবা বুদ্ধিমত্তা আছে, এমন কাউকে বাদ দিবে না। তাদের প্রত্যেককে আমার নিকট জলদি পাঠিয়ে দেবে।'

মুসলিম জনগণ হযরত ফারুকে আজমের এ আহ্বানে ব্যাপকভাবে সাড়া দিল। চর্তুদিক থেকে মানুষ বন্যার স্রোতের ন্যায় মদীনার দিকে আসতে লাগলো। অন্ধ আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুমও ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে চলে এলেন মদীনায়। খলীফা উমার (রা) এই বিশাল বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করলেন হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসকে (রা)। যাত্রাকালে খলীফা তাঁকে নানা বিষয়ে উপদেশ দান করে বিদায় জানালেন।

মুসলিম বাহিনী যখন কাদেসিয়ায় পৌঁছলো, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম বর্ম পরে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে সামনে এলেন এবং মুসলিম বাহিনীর আলাম বা পতাকা বহনের দায়িত্বটি তাঁকে দেয়ার আহ্বান জানালেন। বললেন ঃ হয় এ পতাকা সমুন্নত রাখবো, নয় মৃত্যুবরণ করবো।

এই কাদেসিয়া প্রান্তরে মুসলিম ও পারস্য বাহিনীর মধ্যে যে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় বিশ্বের সমর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে। অবশেষে চূড়ান্ত যুদ্ধের তৃতীয় দিনে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের মাধ্যমে তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য ও সর্বাধিক গৌরবময় সিংহাসনের পতন ঘটে। আর সেইসাথে তাওহীদের পতাকা পত্ পত্ করে উড়তে থাকে এই সুবিশাল পৌত্তলিক ভূমিতে। অসংখ্য শহীদের প্রাণের বিনিময়ে এ মহাবিজয় অর্জিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাকতুমও ছিলেন সেই অগণিত শহীদদের একজন। যুদ্ধশেষে দেখা গেল রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তিনি মুসলমানদের পতাকাটি জড়িয়ে ধরে মাটিতে পড়ে আছে।

ইবন উম্মে মাকতুম ছিলেন অন্ধ। মসজিদে নববী থেকে তাঁর বাড়ীটিও ছিল একটু দূরে। পথে নালা নর্দমা ঝোপ জংগল পড়তো। সব সময়ের জন্য কোন সাহায্যকারীও তাঁর ছিলনা। এত অসুবিধা সত্ত্বেও নিয়মিত মসজিদে নববীতে এসে নামাজ আদায় করতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ একদিন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন অন্ধ, আমার বাড়ীটিও মসজিদ থেকে বেশ দূরে, আমাকে পথ দেখিয়ে নেওয়ার জন্য একজন লোকও আছে, তবে সে আমার মনঃপূত নয়। এমতাবস্থায় আপনি আমাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দেবেন কি? তিনি বললেন ঃ 'তুমি আযান শুনতে পাও?' বললাম ঃ হ্যাঁ। বললেন ঃ তোমার জন্য আমি কোন অনুমতির পথ দেখতে পাচ্ছিনা। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাড়ী ও মসজিদের মধ্যে খেজুর বাগান ও ঝোপ-জংগল রয়েছে। সব সময় পথ দেখানো লোকও আমি রাখতে পারিনে। এমতাবস্থায় আমি কি ঘরে নামায আদায় করতে পারি? তিনি বললেন ঃ তুমি কি ইকামাত শুনতে পাও? বললাম ঃ হ্যাঁ, রাসূল (সা) বললেন ঃ তা হলে তুমি মসজিদে এসেই নামায আদায় করো। (হায়াতুস সাহাবা, ৩য়, ১২১) আযান ও ইকামতের আওয়াজ তাঁর ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতো এ কারণে তিনি অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঘরে নামায আদায়ের অনুমতি পাননি। হযরত উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাঁকে একজন রাহনুমা (পথ প্রদর্শক) দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম ছিলেন পবিত্র কুরআনের হাফেজ। হযরত আনাস ও যার বিন জাইশ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাহজীবুল কামাল, ২৮৯)

তুফাইল ইবন 'আমর আদ-দাওসী (রা)

নাম তাঁর তুফাইল। 'যুন-নূর' উপাধি। 'দাওস' গোত্রের সন্তান হওয়ার কারণে দাওসী বলা হয়। কবীলা-দাওস ইয়ামনে বসবাসকারী একটি শক্তিশালী গোত্র। তিনি ছিলেন এ গোত্রের 'রয়িস' বা সরদার। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল তাঁর পেশা। এ কারণে মাঝে মধ্যে তাঁকে মক্কায় আসা-যাওয়া করতে হতো।

তুফাইল ছিলেন জাহিলী যুগের আরবের সম্ভ্রান্ত ও আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। তাঁর চুলো থেকে হাঁড়ি কখনো নামতো না। অতিথির জন্য তাঁর বাড়ীর দরজা থাকতো সর্বদা উন্মুক্ত।

তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, সহজাত কাব্য প্রতিভা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী। ভাষার মধুরতা, তিক্ততা ও ভাষার ইন্দ্রজাল সম্পর্কে তিনি ছিলেন সুবিজ্ঞ।

একবার তুফাইল ইবন 'আমর ব্যবসা উপলক্ষে তাঁর গোত্রের আবাস স্থল তিহামা অঞ্চল থেকে মক্কায় উপস্থিত হলেন। মক্কায় তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ও কুরাইশদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। দু'টি দলই নিজ নিজ মতের সমর্থক সংগ্রহে তৎপর। একদিকে রাসূল (সা) আহ্বান জানাচ্ছেন মানুষকে তাঁর প্রভুর দিকে। অন্যদিকে কাফিররা সব ধরনের উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করে মানুষকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। বলা চলে, তিনি সম্পূর্ণ অনভিপ্রেতভাবে এ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়লেন। কারণ, তিনি তো এ উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেননি। ইতিপূর্বে মুহাম্মাদ ও কুরাইশদের এ দ্বন্দ্বের কথা তাঁর মনে একবারও উদয় হয়নি। এ সংঘাতের সাথে তাঁর জীবনের এক অভিনব কাহিনী জড়িত আছে। তিনি বলেন, 'আমি মক্কায় প্রবেশ করলাম। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে সর্বোত্তম সম্ভাষণে আমাকে স্বাগত জানালো । আমাকে তারা তাদের সর্বাধিক সম্মানিত বাড়ীতে আশ্রয় দিল। তারপর তাদের নেতৃবৃন্দ ও জ্ঞানী-গুণীরা আমার কাছে এসে বললো ঃ 'তুফাইল, আপনি এসেছেন আমাদের এ আবাসভূমিতে। এই লোকটি, যে নিজেকে একজন নবী বলে মনে করে, আমাদের সকল ব্যাপারে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে। আমাদের ভয় হচ্ছে, আপনিও তার কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে পড়েন এবং আপনার নেতৃত্বে আপনার গোত্রেও আমাদের মত একই সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে না উঠে। সুতরাং আপনি এই লোকটির সাথে কোন রকম আলাপ-আলোচনা করবেন না, তার কোন কথায় কান দেবেন না। কারণ, তার কথা যাদুর মত কাজ করে। সে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয় পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।'

তুফাইল বলেন, 'আল্লাহর কসম, তারা আমার কাছে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে অভিনব কাহিনী ও তাঁর নানা রকম আশ্চর্য কার্যাবলী বর্ণনা করে আমাকে ও আমার গোত্রকে সতর্ক করে দিল। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, তাঁর কাছে আমি ঘেঁষবোনা, তাঁর সাথে কথা বলবো না বা তাঁর কোন কথাও শুনবো না। সে সময় আমরা কা'বার তাওয়াফ করতাম এবং সেখানে রক্ষিত মূর্তিসমূহের পূজাও করতাম। যখন আমি কা'বার

তাওয়াফ ও মূর্তি পূজার জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলাম, আমার দু'কানে ভালো করে তুলো ভরে নিলাম যাতে কোনভাবেই মুহাম্মাদের (সা) কথা আমার কানে প্রবেশ করতে না পারে।

মাসজিদুল হারামে ঢুকেই আমি দেখতে পেলাম তিনি কা'বার পাশেই নামাযে দাঁড়িয়ে। তবে তাঁর সে নামায আমাদের নামাযের মত, তাঁর সে ইবাদাত আমাদের ইবাদাতের মত ছিল না। এ দৃশ্য আমাকে পুলকিত করলো, তাঁর সে ইবাদাত আমাকে আন্দোলিত করলো। আমার ইচ্ছে হলো তাঁর নিকটে যাই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক পা দু'পা করে তাঁর কাছে গিয়ে পৌছলাম। আল্লাহর ইচ্ছে ছিল তাঁর কিছু কথা আমার কানে পৌছে দেয়া। তাই, কানে তুলো ভরা সত্ত্বেও তাঁর কিছু উত্তম বাণী আমি শুনতে পেলাম। মনে মনে বললাম ঃ 'তুফাইল, তোর মা নিপাত যাক, তুই একজন বুদ্ধিমান কবি। ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা তোর আছে। এ লোকটির কথা শুনতে তোর বাধা কিসে? যদি সে ভালো কথা বলে, গ্রহণ করবি, আর মন্দ হলে প্রত্যাখান করবি।'

তুফাইল বলেন, আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা) বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে পৌছলাম। বললাম ঃ ইয়া মুহাম্মাদ, আপনার কাওমের লোকেরা আপনার সম্পর্কে এইসব কথা আমাকে বলেছে। তারা আমাকে আপনার সম্পর্কে এত ভয় দেখিয়েছে যে, আপনার কোন কথা যাতে আমার কানে ঢুকতে না পারে সেজন্য আমি কানে তুলো ভরে নিয়েছি। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা আপনার কিছু কথা না শুনিয়ে ছাড়লেন না। যা শুনেছি, ভালোই মনে হয়েছে। আপনি আপনার ব্যাপারটি আমার কাছে একটু খুলে বলুন। তিনি তাঁর বক্তব্য সুষ্ঠুভাবে বলার পর সূরা ইখলাস ও সূরা আল-ফালাক তিলাওয়াত করে আমাকে শুনালেন। সত্যি কথা বলতে কি, এর থেকে সুন্দর কথা ও অনুপম বিষয় আর কখনো আমি শুনিনি। সেই মুহূর্তে আমার হাত তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম এবং কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠ করে ইসলামের ঘোষণা দিলাম।

ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার কুরাইশরা তাঁকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। তখন তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে সুন্দর একটি কবিতা রচনা করেন। কুরাইশদের নিন্দা, আল্লাহর একত্ব ও রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসা—এই ছিল সেই কবিতার বিষয়বস্তু। ইবন হাজার *'আল-ইসাবা'* গ্রন্থে তার কয়েকটি চরণ সংকলন করেছেন।

তুফাইল বলেন, তারপর আমি মক্কায় বেশ কিছুদিন অবস্থান করে ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা করলাম, সাধ্যানুযায়ী কুরআনের কিছু অংশও হিফজ করলাম। আমি আমার গোত্রে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমার প্রত্যাবর্তনের খবর শুনে আমার বৃদ্ধ পিতা দৌড়ে এলেন। আমি বললাম ঃ আব্বা, আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন। আমি আপনার কেউ নই বা আপনি আমার কেউ নন।

এ কথা শুনে তিনি বললেন ঃ এ কথা কেন, বেটা? বললাম ঃ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, মুহাম্মাদের (সা) দ্বীনের অনুসারী হয়েছি। বললেন ঃ বেটা, তোমার দ্বীনই আমার

দ্বীন। বললাম ঃ যান, গোসল করে পবিত্র পোশাক পরে আমার কাছে আসুন। যা আমি শিখেছি, আপনাকে শেখাবো। তিনি চলে গেলেন। গোসল করে পবিত্র পোশাক পরে আমার কাছে ফিরে এলে আমি তাঁর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলাম। তিনি সাথে সাথে ইসলাম কবুল করলেন। তারপর এলো আমার সহধর্মিনী। তাকেও আমি দূরে সরে যেতে বললাম। 'আপনার প্রতি আমার মা-বাবা কুরবান হোক'—এ কথা বলে সে এর কারণ জানতে চায়। আমি বললাম ঃ ইসলাম তোমার ও আমার মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। আমি ইসলাম গ্রহণ করে দ্বীনে মুহাম্মাদীর অনুসারী হয়েছি। সে বললো ঃ তাহলে আপনার দ্বীনই আমার দ্বীন। বললাম ঃ যুশশারা ঝর্ণার পানি দিয়ে গোসল করে পবিত্র হয়ে এসো। ('যুশ-শারা' দাওস গোত্রের দেবী-মূর্তি। তার পাশেই ছিল পাহাড় থেকে প্রবাহিত একটি ঝর্ণা) সে বললো ঃ আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক, ধর্ম ত্যাগের ব্যাপারে আপনি কি যুশ-শারাকে একটুও ভয় পাচ্ছেন না? বললাম ঃ 'যুশ-শারা ও তুমি নিপাত যাও। যাও, সেখানে গিয়ে মানুষের ভীড় থেকে একটু দূরে থেকে গোসল করে এসো। এই বধির প্রস্তর-মূর্তি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, সে যিম্মাদারী আমি নিলাম। সে চলে গেল একটু পরে গোসল সেরে ফিরে এলো। আমি তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলাম। সে সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করলো। তারপর আমি দাওস গোত্রের সকল মানুষের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলাম। কিন্তু একমাত্র আবু হুরাইরা ছাড়া প্রত্যেকেই ইতস্ততঃ ভাব প্রকাশ করলো। দাওস গোত্রের মধ্যে একমাত্র তিনিই খুব তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করেন।

তুফাইল (রা) বলেন, 'অতঃপর আমি মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলাম। এবার আমার সংগে আবু হুরাইরা। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুফাইল, তোমার পেছনের খবর কি? বললাম ঃ 'তাদের অন্তরে মরচে পড়ে গেছে, তারা মারাত্মক কুফরীতে লিপ্ত। দাওস গোত্রের ওপর পাপাচার ও নাফরমানী ভর করে বসেছে।'

আমার এ কথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ (সা) উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অজু করে নামায আদায় করলেন এবং আকাশের দিকে হাত উঠালেন। আবু হুরাইরা বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহকে (সা) এমনটি করতে দেখলাম, আমার ভয় হলো এই ভেবে যে, তিনি হয়তো আমার গোত্রের ওপর বদদুআ করবেন, আর তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। মনে মনে আমি বললাম ঃ আল্লাহ আমার কাওমকে হিফাজত করুন। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনলাম ঃ 'হে আল্লাহ, দাওস কবীলাকে তুমি হিদায়াত দান কর', এভাবে তিনি তিনবার বললেন। তারপর তুফাইলের দিকে ফিরে বললেন ঃ এবার তুমি তোমার কাওমের কাছে ফিরে যাও। তাদের সাথে কোমল আচরণ কর এবং তাদেকে ইসলামের দাওয়াত দাও।'

রাসূল (সা) যখন দাওস গোত্রের জন্য হাত উঠিয়ে দুআ করছিলেন, তুফাইল বললেন ঃ 'আমি এমনটি চাইনে।' এ কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ তোদের মধ্যে তোমার মত আরো অনেক লোক আছে।' কথিত আছে, জুনদুব ইবন 'আমর আদ-দাওসী জাহিলী যুগেই বলতেন ঃ এ সৃষ্টি জগতের একজন স্রষ্টা নিশ্চয়ই আছেন, তবে

তিনি কে, তা আমরা জানিনে। রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাবের খবর শুনে তিনি ৭৫ জন লোকসহ মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

তুফাইল বলেন, আমি ফিরে এসে দাওস কবীলায় ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করলেন। একে একে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। তারপর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমমে হাজির হলাম, আমার সংগে তখন দাওস কবীলার আশিটি পরিবার। তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমাদের দেখে রাসূল (সা) ভীষণ খুশী হলেন এবং খাইবারের গণীমতের অংশও তিনি আমাদের দিলেন। আমরা বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এখন থেকে যত যুদ্ধে আপনি অংশ নেবেন, দক্ষিণ ভাগের দায়িত্ব থাকবে আমাদের ওপর।' তুফাইল বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংগে থেকে গেলাম। অবশেষে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় মক্কা বিজয় হলো।

তুফাইল (রা) তার গোত্রের উপাস্য যুল-কাফ্ফাইন মূর্তিটি ভস্মিভূত করে দেন। সাথে সাথে দাওস গোত্রের অবশিষ্ট শিরকও নিঃশেষ হয়ে যায়, তাদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। এদিকে রাসূল (সা) তায়িফ অভিযানে রওয়ানা হয়েছেন। তুফাইল (রা) তার গোত্রের আরো চার শ' সশস্ত্র লোককে সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তায়িফে মিলিত হন। তুফাইল ছিলেন তাঁর দলটির অধিনায়ক। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পতাকাবাহী হবে কে?' তিনি বললেন, 'নুমান ইবন রাবিয়া যেহেতু দীর্ঘকাল যাবত এ দায়িত্ব পালন করে আসছে, তাই এ ক্ষেত্রেও সে এ দায়িত্বটি পালন করবে।' রাসূল (সা) তাঁর এ যুক্তি পছন্দ করলেন।

এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) যতদিন জীবিত ছিলেন তুফাইল ইবন আমর তার সার্বক্ষণিক সংগী হিসেবে ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের খিলাফাতকালে তিনি তাঁর জীবন, তরবারি ও সন্তান-সন্ততি সবই খলীফার আনুগত্যে উৎসর্গ করেন। রিদ্দার যুদ্ধের আগুন চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে তিনি ভণ্ডনবী মুসাইলামা আল-কাজ্জাবের বিরুদ্ধে প্রেরিত একটি বাহিনীর অগ্রসৈনিক হিসেবে পুত্র আমরকে সংগে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনি যখন ইয়ামামার পথে, তখন একটি স্বপ্ন দেখলেন। সংগী-সাথীদের কাছে তিনি এর ব্যাখ্যা চাইলেন। সংগীরা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দেখেছো?' তিনি বললেন, 'দেখেছি, আমার মাথা ন্যাড়া করা হয়েছে; একটি পাখী আমার মুখ থেকে বের হয়ে গেল, আমার স্ত্রী আমাকে তাঁর পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল, আমার পুত্র আমর আমাকে দ্রুত টেনে বের করতে চাইলো; কিন্তু তার ও আমার মধ্যে প্রাচীর খাড়া হয়ে গেল।'

তাঁরা মন্তব্য করলেন, 'স্বপ্নটি ভালো।' তুফাইল বলেন, 'তবে আমি স্বপ্নের তাবীর করলাম এভাবে ঃ ন্যাড়া মাথার অর্থ ঘাড় থেকে আমার মাথা বিচ্ছিন্ন হবে। মুখ থেকে পাখী বের হওয়ার অর্থ আমার রূহটি বের হয়ে যাবে। স্ত্রীর পেটের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার অর্থ মাটি খুড়ে কবর তৈরী করে আমাকে দাফন করা হবে। আমার প্রবল বাসনা, আমি যেন শহীদের মৃত্যু বরণ করতে পারি। আর আমার পুত্র 'আমর, সেও আমার মত শাহাদাত চাইবে; কিন্তু একটু দেরীতে সে তা লাভ করবে।' তাঁর এ ব্যাখ্যা সত্যে

পরিণত হয়েছিল। হিজরী ১১ সনে ইয়ামামার যুদ্ধে এই মহান সাহাবী বীরত্বের সাথে লড়াই করেন এবং যুদ্ধের ময়দানেই শাহাদাত বরণ করেন। এ যুদ্ধে তাঁর একমাত্র পুত্র 'আমরের ডান হাতের কব্জিটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। এভাবে তিনি যুদ্ধের ময়দানে নিজের হাতটি ও পিতাকে হারিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) খিলাফাতকালে একবার 'আমর ইবন তুফাইল এলেন তাঁর কাছে। খলীফার জন্য খাবার উপস্থিত হলে তিনি তাঁর কাছে উপবিষ্ট সকলকে আহ্বান জানালেন খাবারের জন্য। সকলে সাড়া দিলেও 'আমর সাড়া দিলেন না। খলীফা তাঁকে বললেন, 'তোমার কী হলো? সম্ভবতঃ হাতের জন্য লজ্জা পাচ্ছ?' 'আমর বললেন, 'হ্যা, তাই।' খলীফা বললেন, 'আল্লাহর কসম, তোমার ঐ কাটা হাতটি দিয়ে এ খাবার ঘেঁটে না দেওয়া পর্যন্ত আমি মুখে দেবনা। আল্লাহর কসম, একমাত্র তুমি ছাড়া মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এমন আর কেউ নেই যার এক অংশ জান্নাতে। অর্থাৎ তোমার হাতটি।' পিতার মৃত্যুর পর সব সময় তিনি শাহাদাতের স্বপ্ন দেখতেন। অবশেষে হিজরী ১৫ সনে রোমান বাহিনীর সাথে ইয়ারমুকের প্রান্তরে মুসলমানদের যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেখানে তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। এভাবে বাপ-বেটা দু'জনেই শাহাদাতের গৌরব অর্জন করেন।

মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের ওপর যখন যুলুম-অত্যাচারের মাত্রা চরমে পৌঁছে, তখন একদিন তুফাইল প্রস্তাব দিলেন রাসূলকে (সা) তাঁদের গোত্রে হিজরাত করে তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নেওয়ার জন্য। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হিফাজতের পূর্ণ যিম্মাদারীর আশ্বাসও তাঁকে দান করেন। কিন্তু এ গৌরব আল্লাহ তায়ালা মদীনার আনসারদের ভাগ্যে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। তাই তিনি তুফাইলের আহ্বানে সাড়া দেননি।

ইসলাম গ্রহণের পর স্বীয় গোত্রে ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যস্ত থাকায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যে দীর্ঘদিন কাটাবার সুযোগ তিনি পাননি। তবে তাঁরই চেষ্টায় গোটা দাওস গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। কবি হিসেবেও তিনি তৎকালীন কাব্য জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সাঈদ ইবন 'আমের আল-জুমাহী (রা)

ঐতিহাসিকরা বলেছেন ঃ সাঈদ ইবন 'আমের এমন ব্যক্তি যিনি দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাত খরিদ করে নেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে (সা) অন্য সব কিছুর ওপর প্রাধ্যান্য দান করেন।

তাঁর পিতার নাম 'আমের এবং মাতা আরওয়া বিনতু আবী মুয়ীত। খাইবার বিজয়ের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

মক্কার কুরাইশরা ধোঁকা দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী খুবাইব ইবন আদীকে (রা) বন্দী করে মক্কায় নিয়ে আসে এবং সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে প্রকাশ্যে জীবিত অবস্থায় অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে তাঁকে শুলবিদ্ধ করে। এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য উপভোগ করার জন্য মক্কায় ঢেড়া পিটিয়ে দেওয়া হয়। এ দৃশ্য দেখার জন্য মক্কার তানয়ীম এলাকা থেকে আগত লোকদের মধ্যে সাঈদ ইবন 'আমের আল-জুমাহীও ছিলেন।

তাঁর ধমনীতে তখন যৌবনের টগবগে রক্ত। মানুষের ভীড় ঠেলে তিনিও চলেছেন সামনের দিকে। এক সময় তিনি এসে দাঁড়ালেন প্রথম সারির কুরাইশ নেতৃবৃন্দ–আবু সুফিয়ান ইবন হারব, সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা প্রমুখের পাশপাশি। কুরাইশদের বন্দীকে তিনি দেখলেন বেড়ী লাগানো অবস্থায়। নারী-পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ-বণিতা তাঁকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর আংগিনার দিকে। তাঁর হত্যার মাধ্যমে বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশদের বদলা নেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য। তাই তারা পৈশাচিক উল্লাসে মাতোয়ারা।

বন্দীকে সংগে নিয়ে অগণিত মানুষ বধ্যভূমিতে উপস্থিত হল। দীর্ঘদেহী যুবক সাঈদ ইবন 'আমের দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। নারী ও শিশুদের চীৎকার ও শোরগোলের মধ্যে তাঁর কানে ভেসে এল খুবাইবের দৃঢ় ও শান্ত কণ্ঠস্বর। বলছেন ঃ 'আমাকে শূলীতে চড়াবার পূর্বে তোমরা যদি অনুমতি দাও, আমি দু'রাকা'আত নামায আদায় করে নিতে পারি।' তারা অনুমতি দিল।

সাঈদ ইবন 'আমের দেখলেন, তিনি কা'বার দিকে মুখ করে দু'রাকা'আত নামায আদায় করলেন। সে নামায কতই না সুন্দর, কতই না চমৎকার! তারপর কুরাইশ নেতৃবৃন্দের দিকে ফিরে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম! তোমরা যদি মনে না করতে, আমি মরণ-ভয়ে নামায দীর্ঘ করছি, তাহলে আমি নামায আরও দীর্ঘ করতাম।'

অতঃপর সাঈদ ইবন 'আমের স্বচক্ষে দেখলেন, তাঁর গোত্রের লোকেরা জীবিত অবস্থায় খুবাইবের দেহ থেকে একটার পর একটা অংগ কেটে ফেলছে। আর তাঁকে জিজ্ঞেস করছে ঃ

'তোমার স্থানে মুহাম্মাদকে আনা হোক, আর তুমি মুক্তি পেয়ে যাও, তা কি তুমি পছন্দ কর?'

তাঁর দেহ থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, আর তিনি বলছেন ঃ

'আল্লাহর কসম, আমি আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করি, আর বিনিময়ে মুহাম্মাদের (সা) গায়ে একটি কাঁটার আঁচড় লাগুক তাও আমার মনঃপূত নয়।' একথা শুনে চতুর্দিক থেকে লোকেরা হাত ওপরে উঠিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগল ঃ 'হত্যা কর, ওকে হত্যা করা।'

অতঃপর সাঈদ ইবন 'আমর দেখলেন, শূলীকাষ্ঠের ওপর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বলছেন ঃ

'আল্লাহুম্মা আহসিহিম আদাদা– ওয়াকতুলহুম বাদাদা ওয়ালা তুগাদির মিনহুম আহাদা–ইয়া আল্লাহ, তাদের সংখ্যা তুমি গুণে রাখ, তাদেরকে তুমি এক এক করে হত্যা কর এবং কাউকে তুমি ছেড়ে দিও না।' এই ছিল তাঁর অন্তিম দু'আ। তারপর তরবারি ও বর্শার অসংখ্য আঘাতে তাঁর দেহ জর্জরিত করা হয়।

কিছুদিনের মধ্যে কুরাইশরা বড় বড় ঘটনাবলীতে লিপ্ত হয়ে খুবাইব ও তাঁর শূলীর কথা ভুলে গেল। কিন্তু যুবক সাঈদ ইবন 'আমের আল জুমাহীর অন্তর থেকে খুবাইবের স্মৃতি এক মুহূর্তের জন্য দূরীভূত হলনা। ঘুমালে স্বপ্নের মধ্যে, জেগে থাকলে কল্পনায় তিনি খুবাইবকে দেখতেন। তিনি যেন দেখতে পেতেন, খুবাইব শূলীকাষ্ঠের সামনে অত্যন্ত ধীর-স্থির ও প্রশান্তভাবে দু'রাকাআত নামায আদায় করছেন। কুরাইশদের ওপর অন্তিম বদ-দু'আর বিনীত সুরও যেন তিনি দু'কান দিয়ে শুনতে পেতেন। তাঁর ভয় হত এখনই হয়ত তাঁর ওপর বজ্রপাত হবে অথবা আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হবে।

তাছাড়া খুবাইবের নিকট থেকে তিনি এমন কিছু শিক্ষালাভ করেন, এর পূর্বে যা তিনি জানতেন না। যেমন ঃ বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের পথে আমরণ জিহাদই হচ্ছে প্রকৃত জীবন। মজবুত ঈমান অনেক অভিনব ও অলৌকিক বিষয় সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া একজন মানুষ যাঁকে তাঁর সংগীরা এত গভীরভাবে মুহাব্বাত করতে পারে, তিনি আল্লাহ প্রেরিত নবী ছাড়া আর কিছু নন।

সেই সময় থেকে আল্লাহ তা'আলা সাঈদ ইবন আমেরের অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। একদিন তিনি জনমণ্ডলীর সামনে উঠে দাঁড়িয়ে কুরাইশদের দেব-দেবী ও মূর্তির সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করে ইসলাম গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দেন। খাইবার যুদ্ধের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাঈদ ইবন আমের হিজরাত করে মদীনায় এলেন এবং সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য অবলম্বন করেন। তিনি খাইবারসহ পরবর্তী সব যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) তিরোধানের পর তাঁর দু'খলীফা আবু বকর (রা) ও উমারের (রা) খিলাফতকালে সাঈদ ইবন 'আমের উন্মুক্ত তরবারি হাতে তাঁদের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন। হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে সেনাপতি আবু উবাইদা (রা) ইয়ারমুক যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য তলব করেন। খলীফা মদীনা থেকে

সাঈদের নেতৃত্বে এক বাহিনী পাঠিয়ে দেন। ইয়ারমুকে সাঈদ (রা) উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে ক্রয় ক'রে এবং আল্লাহর রিজামন্দীকে অন্তর ও দেহের সকল কামনা বাসনার ওপর প্রাধান্য দান ক'রে মুসলিমদের জন্য তিনি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রথম দু'খলিফা সাঈদ ইবন 'আমেরের সততা ও আল্লাহ্-ভীতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এ কারণে সব সময় তাঁরা তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন।

খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালের প্রথম পর্ব তখন চলছে। একদিন সাঈদ ইবন আমের খলীফাকে বললেন ঃ

"ওহে উমার, আমি আপনাকে মানুষের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দান করছি। তবে আল্লাহর ব্যাপারে মানুষকে ভয় করবেন না। আপনার কথা আপনার কাজের পরিপন্থী যেন না হয়। কারণ, কর্মদ্বারা সত্যায়িত কথাই সর্বোৎকৃষ্ট কথা।

ওহে উমার, দূর ও নিকটের যে মুসলিম উম্মার শাসক আল্লাহ্ আপনাকে বানিয়েছেন, তাদের ব্যাপারে সর্বদা আপনি সজাগ থাকবেন। আপনার নিজের ও পরিবার বর্গের জন্য যা আপনি পছন্দ করবেন তাদের জন্যও তা আপনি পছন্দ করবেন। আপনার নিজের ও পরিবার বর্গের জন্য যা অপছন্দ করবেন তাদের জন্যও তা অপছন্দ করবেন। সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করবেন। আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় আপনি করবেন না।"

উমার জিজ্ঞেস করলেন,

'সাঈদ, এ কাজ করতে সক্ষম কে?'

তিনি বললেন ঃ

'আপনার মত ব্যক্তি। আল্লাহ যাঁকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর কর্তৃত্ব দান করেছেন এবং আল্লাহ ও আপনার মাঝে অন্য কোন প্রতিবন্ধক নেই।'

তখনই তিনি সাঈদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বললেন ঃ

'সাঈদ, আমি আপনাকে হিমসের ওয়ালী নিযুক্ত করছি।'

সাঈদ বললেন, 'উমার, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমার ওপর এ বিপদ চাপাবেন না, আমাকে এ দুনিয়ার দিকে টেনে আনবেন না।'

উমার রেগে গিয়ে বললেন,

'আপনাদের ধ্বংস হোক! খিলাফতের এ দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়ে এখন আমার থেকে দূরে থাকতে চান? আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে ছাড়বো না।' একথা বলে তিনি সাঈদকে হিমসের ওয়ালী নিযুক্ত করেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার ভাতা নির্ধারণ করে দেব কি?' সাঈদ বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন, আমি তা দিয়ে কি করব? বাইতুল মাল থেকে যে ভাতা আমি লাভ করে থাকি তাইতো আমার প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হয়ে যায়।' সাঈদ হিমসে চলে গেলেন।

কিছুদিন পর আমীরুল মু'মিনীন উমারের কতিপয় বিশ্বস্ত লোক হিমস থেকে মদীনা

এল। উমার তাদেরকে বললেন ঃ

'তোমাদের গরীব মিসকিনদের একটা তালিকা তোমরা আমাকে দাও। আমি তাদেরকে কিছু সাহায্য করব। তারা একটি তালিকা প্রস্তুত করে 'উমারকে দিল। তাতে অন্যান্যের সংগে সাঈদ ইবন আমেরের নামটিও ছিল। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সাঈদ ইবন আমের কে?' তারা বলল, 'আমাদের আমীর।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের আমীরও কি এতো গরীব?'

তারা বলল ঃ 'হাঁ। আল্লাহর কসম! একাধারে কয়েকদিন যাবত তাঁর বাড়ীতে উনুনে হাড়ি চড়ে না।'

একথা শুনে খলীফা 'উমার এত কাঁদলেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। তারপর এক হাজার দিনার একটি থলিতে ভরে বললেন, 'আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম জানিয়ে বলবে; আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য আমীরুল মু'মিনীন এ অর্থ পাঠিয়েছেন।'

দিনার ভর্তি থলি নিয়ে তারা সাঈদের নিকট উপস্থিত হল। থলির মুখ খুলেই তিনি দেখতে পেলেন তাতে দিনার। অমনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইলাইহি রাজিউন' বলতে বলতে থলিটি এমনভাবে দূরে সরিয়ে দিলেন যেন তাঁর ওপর বড় ধরনের কোন বিপদ আপতিত হয়েছে। তাঁর স্ত্রী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন।

'সাঈদ, কি হয়েছে আপনার? আমীরুল মু'মিনীন কি ইন্তিকাল করেছেন?'

তিনি বললেন, 'না। বরং তার থেকেও বড় কিছু।'

'মুসলিমদের ওপর কি কোন বিপদ আপতিত হয়েছে?'

তিনি বললেন, 'না। তাঁর থেকেও বড় কিছু।'

স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই বড় জিনিস কি?'

তিনি বললেন, 'আমার পরকালের সর্বনাশের জন্য দুনিয়া আমার কাছে ঢুকে পড়েছে। আমার ঘরে বিপদ এসে পড়েছে।'

স্ত্রী বললেন, 'বিপদ দূর করে দিন।' তখনও তিনি দিনারের ব্যাপারটি জানতেন না।

সাঈদ বললেন, 'এ ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করবে?'

স্ত্রী জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই।'

তারপর দিনারগুলি কয়েকটি থলিতে ভরে তিনি গরীব মুসলিমদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

কিছুদিন পর হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) স্বচক্ষে সিরিয়ার অবস্থা দেখার জন্য হিমসে এলেন। সেকালে হিমসকে বলা হত 'কুয়াইফা'। কারণ কুফাবাসীদের মত হিমসবাসীরাও তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে সব সময় অতিরিক্ত অভিযোগ উত্থাপন করতো। তাই বলা হত হিমসও যেন ছোট-খাট একটা কুফা। যাই হোক, খলীফার আগমনের পর হিমসবাসীরা তাঁকে সালাম জানাতে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

'তোমাদের আমীরকে কেমন পেলে?'

তারা আমীরের (সাঈদ) চারটি কাজের কথা উল্লেখ করে তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করল। গুরুত্বের দিক দিয়ে সে চারটি কাজের প্রত্যেকটি সমান।

'উমার বলেন, 'আমি হিমসবাসী ও তাদের আমীরকে একসাথে উপস্থিত হতে বললাম। আল্লাহর কাছে আমি দু'আ করলাম, তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা যেন হতাশাব্যঞ্জক না হয়। কারণ তাঁর প্রতি ছিল আমার দারুণ বিশ্বাস।'

হিমসবাসী ও তাদের আমীর আমার নিকট এলে আমি জিজ্ঞেস করলাম,

'তোমাদের আমীরের বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ কি?'

তারা বলল, 'বেশ খানিক বেলা না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে দেখা দেন না।'

উমার জিজ্ঞেস করলেন, 'সাঈদ, এ অভিযোগ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি'

তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন,

"আল্লাহর কসম! বিষয়টি কারও কাছে প্রকাশ করা আমার পছন্দনীয় নয়। তবে না বললেই নয়, তাই বলছি। আমার পরিবারের জন্য কোন চাকর-বাকর নেই। সকালে বাড়ীর সব কাজই আমাকে নিজ হাতে করতে হয়। আটা মাখা ও রুটি তৈরীর কাজও আমি করে থাকি। তারপর হাত মুখ ধুয়ে মানুষকে সাক্ষাৎ দিই। তখন খানিকটা বেলা হয়ে যায়।"

উমার জিজ্ঞেস করলেন,

'তোমাদের আরও অভিযোগ আছে কি?'

তারা বলল,

'তিনি রাতের বেলা কাউকে সাক্ষাৎ দান করেন না।'

'উমার জিজ্ঞেস করলেন,

'সাঈদ, এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?'

তিনি বললেন,

'আল্লাহর কসম! এ বিষয়টিও প্রকাশ করা আমার মনঃপূত নয়। তবুও বলছি, আমি দিন মানুষের জন্য ও রাত আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করেছি।'

'উমার জিজ্ঞেস করলেন,

'তোমাদের আর কি অভিযোগ?'

তারা বলল,

'মাসে একটি দিন তিনি কাকেও সাক্ষাৎ দান করেন না।'

উমার জিজ্ঞেস করলেন, 'সাঈদ, বিষয়টি কি?'

তিনি বললেন, "আমীরুল মুমিনীন, আমার কোন খাদেম নেই। পরনের এ কাপড় ছাড়া অন্য কোন কাপড়ও আমার নেই। মাসে একবার আমি নিজ হাতে তা পরিষ্কার করি এবং শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করি। এজন্য দিনের প্রথমভাগে লোকদের সাক্ষাৎ দিতে পারিনা। তবে শেষ ভাগে সাক্ষাৎ দিই।'

উমার আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তাঁর বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ আছে?'

তারা বলল,

'মজলিসে মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন।'

উমার জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি সাঈদ?'

তিনি বললেন,

"আমি মুশরিক অবস্থায় খুবাইব ইবন আদীকে শূলীতে চড়ানোর দৃশ্য দেখেছিলাম। আমি আরও দেখেছিলাম কুরাইশরা তাঁর অংগ-প্রত্যংগ এক এক করে কেটে ফেলছে। সে সময় কুরাইশরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল,

'তোমার স্থানে মুহাম্মাদকে (সা) আনা হোক তা কি তুমি পছন্দ কর?'

উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহর কসম, আমি আমার পরিবার বর্গ ও সন্তান সন্ততির মাঝে নিরাপদে ফিরে যাই, আর এর বিনিময়ে মুহাম্মাদের (সা) গায়ে কাঁটার একটি আঁচড়ও লাগুক তাও আমার মনঃপূত নয়।, আল্লাহর কসম! যখনই আমার সে দিনটির স্মৃতি মনে পড়ে এবং কেন আমি সেদিন তাঁকে সাহায্য করিনি– এ অনুভূতি আমার মধ্যে জেগে ওঠে, তখন আমি চেতনা হারিয়ে ফেলি। আমার মনে হয়, আল্লাহ আমার এ অপরাধ ক্ষমা করবেন না।'

উমার তখন বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমার ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেননি। তারপর তিনি সাঈদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এক লাখ দিনার পাঠালেন। তাঁর সহধর্মিনী দিনারগুলি দেখে বলে উঠলেন ঃ

'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে আপনার সেবা গ্রহণ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। যান, আমাদের জন্য খাদ্য-খাবার কিনে আনুন এবং একটি চাকর রাখুন।'

একথা শুনে তিনি স্ত্রীকে বললেন ঃ

'এর থেকে উত্তম কিছু লাভ কর তাকি তুমি চাওনা? স্ত্রী বললেন, 'সেই উত্তম বস্তু কী?"

তিনি বললেন, 'আমরা এ দিনারগুলি আল্লাহকে করজে হাসানা দিয়ে দিই। তিনি আমাদের উত্তম বিনিময় দান করবেন, আমরা তো সেই বিনিময়ের সর্বাধিক মুখাপেক্ষী।'

স্ত্রী বললেন, 'হাঁ, তা দিন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।'

সেই মজলিসে বসে তিনি দিনারগুলি কয়েকটি থলিতে ভরলেন। তারপর পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের হাতে একটি করে থলি দিয়ে তিনি বললেন ঃ অমুক বিধবা, অমুক ইয়াতিম, অমুক গোত্রের মিসকীন এবং অমুক গোত্রের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিলি করে এস।

নিজের প্রয়োজন সত্বেও অন্যকে যাঁরা প্রাধান্য দেয়, সাঈদ সেই মহান ব্যক্তিদের একজন।

হিমসের ওয়ালী থাকা অবস্থায় খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁকে একবার মদীনায় ডেকে পাঠান। তিনি মদীনায় এলেন। হাতে তাঁর একটি লাঠি এবং খাওয়ার জন্য একটি মাত্র পিয়ালা। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাজ-সরঞ্জাম এতটুকুই? জবাব দিলেন, এর চেয়ে বেশী জিনিসের প্রয়োজন কি জন্য? পিয়ালায় খাই এবং লাঠিতে সাজ-সরঞ্জাম ঝুলিয়ে নিই।

ইবন সা'দের মতে, হিমসের ওয়ালী থাকা অবস্থায় হিজরী ২০ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। আবু উবাইদার মতে তাঁর মৃত্যু সন হিজরী ২১।

সুরাকা ইবন মালিক (রা)

কুরাইশদের মাঝে যখন এ কথাটি ছড়িয়ে পড়লো যে, মুহাম্মাদ (সা) মক্কায় নেই তখন একদিকে যেমন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ খবরটি বিশ্বাসই করতে পারছিলনা, অন্য দিকে মক্কায় একটা ভীতির ভাবও ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে তারা বনু হাশিমের প্রতিটি বাড়ীতে তল্লাশী শুরু করে দেয়। মুহাম্মাদের (সা) ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বাড়ী-ঘর তল্লাশী করতে করতে তারা আবু বকরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। তাদের সাড়া পেয়ে আবু বকরের মেয়ে আসমা বেরিয়ে আসেন। কুরাইশ নেতা আবু জাহল তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার আব্বা কোথায়?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তিনি এখন কোথায় তাতো আমি জানিনা।'

নরাধম আবু জাহল আসমার গালে সজোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলে তাঁর কানের দুলটি ছিট্‌কে পড়ে এবং তিনিও মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

কুরাইশদের যখন স্থির বিশ্বাস হলো যে, মুহাম্মাদ (সা) সত্যি সত্যি মক্কা থেকে চলে গেছেন, তখন তাদের অস্থিরতা আরও বেড়ে যায়। তারা একদল পদচিহ্ন বিশারদকে পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাঁদের খুঁজে বের করার জন্য লাগিয়ে দেয়। পদচিহ্ন বিশারদরা 'সাওর' পর্বতের গুহার কাছে এসে কুরাইশদের বললো, আল্লাহর কসম, তোমাদের সাথী মুহাম্মাদ (সা) এ গুহা ছেড়ে এখনও কোথাও যায়নি।' আসলে তাদের এ অনুমান সঠিক ছিল। মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সাথী আবু বকর তখনও সেই গুহার মধ্যে। আর কুরাইশরা তাঁদের মাথার ওপরে। এমন কি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) গুহার ওপরের দিকে তাদের মাথার ওপর বিচরণকারী কুরাইশদের পা-ও দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর চোখ দু'টি পানিতে ঝাপসা হয়ে গেল। ভালোবাসা, দরদ ও ভর্ৎসনা মিশ্রিত দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দিকে তাকালেন। ফিস ফিস করে আবু বকর বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, আমার নিজের জানের ভয়ে নয়, আপনার প্রতি তাদের কোন দুর্ব্যবহার আমাকে দেখতে হয়, এ ভয়ে আমি কাঁদছি। তাঁকে আশ্বস্ত করে রাসূল (সা) বললেন, 'আবু বকর, দুশ্চিন্তা করোনা, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'

আল্লাহ তায়ালা আবু বকরের অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন। তবে তিনি বার বার মাথার ওপর চলাচলরত কুরাইশদের পায়ের দিকে তাকাতে লাগলেন। এক সময় তিনি রাসূলকে (সা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাদের কেউ তার দু'পায়ের পাতার দিতে তাকালেই আমাদের দেখে ফেলবে।' জবাবে রাসূল (সা) বললেন, 'তুমি কি মনে করেছো আমরা মাত্র দু'জন? তৃতীয় একজন, আল্লাহও আমাদের সাথে আছেন।'

সেই মুহূর্তে তাঁরা দু'জন কুরাইশদের এক যুবককে বলতে শুনলেন, 'তোমরা সবাই গুহার দিকে এসো, আমরা একটু ভেতরটা দেখবো।' উমাইয়্যা ইবন খালফ তাকে একটু বিদ্রূপ করে বললো, 'গুহার মুখে এই মাকড়সা ও তার বাসা দেখতে পাওনা? এগুলি মুহাম্মাদের জন্মেরও আগে থেকে এখানে আছে।' তবে আবু জাহল বললো, লাত

ও উজ্জার শপথ, আমার মনে হচ্ছে তারা আমাদের ধারে কাছে কোথাও আছে। আমাদের কথা তারা শুনছে এবং আমাদের কার্যকলাপও তারা দেখছে। কিন্তু তার ইন্দ্রজালে আমাদের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাই আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না।'

যা হোক, কুরাইশরা মুহাম্মাদকে (সা) খুঁজে বের করার ব্যাপারে একেবারে হাত গুটিয়ে নিলনা এবং তাঁর পিছু ধাওয়া করার সিদ্ধান্তেও তাদের কোন নড়চড় হলো না। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসরত গোত্রগুলিতে তারা ঘোষণা করে দিল, কোন ব্যক্তি মুহাম্মাদকে জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থায় ধরে দিতে পারলে তাকে একশ'টি উন্নত জাতের উট পুরস্কার দেয়া হবে।

সুরাকা ইবন মালিক আল-মাদলাজী তখন মক্কার অনতিদূরে 'কুদাইদ' নামক স্থানে তার গোত্রের একটি আড্ডায় অবস্থান করছিল। এমন সময় কুরাইশদের একজন দূত সেখানে উপস্থিত হয়ে মুহাম্মাদকে (সা) জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দেয়ার ব্যাপারে কুরাইশদের ঘোষিত পুরস্কারের কথা প্রচার করলো।

একশ' উটের কথা শুনে সুরাকার মধ্যে লালসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। কিন্তু অন্যের মধ্যেও এ লালসা সঞ্চার হতে পারে এ ভয়ে সে কোন কথা না বলে নিজেকে সামলে নিল।

সুরাকা আড্ডা থেকে ওঠার আগেই সেখানে তার গোত্রের অন্য একটি লোক এসে বললো 'আল্লাহর শপথ, আমার পাশ দিয়ে এখনই তিন জন লোক চলে গেল, আমার ধারণা তারা মুহাম্মাদ, আবু বকর ও তাদের গাইডই হবে।'

সুরাকা বললো 'না, তা না। তারা হচ্ছে অমুক গোত্রের লোক। তাদের উট হারিয়ে গেছে তাই তারা তালাশ করছে।' 'তা হতে পারে'— এ কথা বলে লোকটি চুপ করে গেল।

আড্ডা থেকে সংগে সংগে উঠে গেলে অন্যদের মনে সন্দেহ হতে পারে, এ কারণে সে আরও কিছুক্ষণ সেখানে বসে থাকলো। আড্ডায় উপস্থিত লোকেরা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত হলে এক সুযোগে সে চুপে চুপে বেরিয়ে গেল। আড্ডা থেকে বেরিয়েই সে বাড়ীর দিকে গেলো। বাড়ীতে পৌঁছেই দাসীকে বললো, 'তুমি চুপে চুপে মানুষে না দেখে এমনভাবে আমার ঘোড়াটি অমুক উপত্যকায় বেঁধে রাখবে।' আর দাসকে বললো, 'তুমি এ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়ীর পিছন দিক থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেন কেউ না দেখে এবং ঘোড়ার আশে পাশে কোন একস্থানে রেখে দেবে।'

সুরাকা বর্ম পরে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলো এবং মুহাম্মাদকে পাকড়াও করার জন্য দ্রুত ঘোড়া হাঁকালো, যাতে মুহাম্মাদকে (সা) ধরে দিয়ে অন্য কেউ এ পুরস্কার ছিনিয়ে নিতে না পারে। সে ছিল তার গোত্রের দক্ষ ঘোড় সওয়ারদের অন্যতম। সে ছিল দীর্ঘদেহী, বিশাল বপুধারী, পদচিহ্ন বিশারদ ও বিপদে দারুণ ধৈর্যশীল। সর্বোপরি সে ছিল একজন বুদ্ধিমান কবি। তার ঘোড়াটি ছিল উন্নত জাতের।

সুরাকা সামনে এগিয়ে চললো। কিছুদূর যাওয়ার পর ঘোড়াটি হোঁচট খেলো এবং সে

পিঠ থেকে দূরে ছিট্‌কে পড়লো। এটাকে সে অশুভ লক্ষণ মনে করে বলে উঠলো, 'একি? ওরে ঘোড়া, তুই নিপাত যা।' এই বলে সে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠলো। কিছু দূর যেতে না যেতেই ঘোড়াটি আবার হোঁচট খেলো। এবার তার অশুভ লক্ষণের ধারণা আরও বেড়ে গেল। সে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করলো; কিন্তু এক শ' উটের লোভ তাকে এ চিন্তা থেকে বিরত রাখলো।

দ্বিতীয়বার ঘোড়াটি যেখানে হোঁচট খেয়েছিল সেখান থেকে সামান্য দূরে সে দেখতে পেল মুহাম্মাদ (সা) তাঁর দু'সঙ্গীকে, সংগে সংগে সে তার হাত ধনুকের দিকে বাড়ালো; কিন্তু সে হাতটি যেন একেবারে অসাড় হয়ে গেল। সে দেখতে পেল তার ঘোড়ার পা যেন শুকনো মাটিতে দেবে যাচ্ছে এবং সামনে থেকে প্রচণ্ড ধোঁয়া উঠে ঘোড়া ও তার চোখ আচ্ছন্ন করে ফেলছে। সে দ্রুত ঘোড়াটি হাঁকানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘোড়াটি এমন স্থির হয়ে গেল, যেন তার পা লোহার পেরেক দিয়ে মাটিতে গেঁথে দেয়া হয়েছে।

অতঃপর সুরাকা রাসূল (সা) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের দিকে ফিরে অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'ওহে' তোমরা তোমাদের প্রভুর দরবারে আমার ঘোড়ার পা মুক্ত হওয়ার জন্য দুআ করো। আমি তোমাদের কোন অকল্যাণ করবো না।' রাসূল (সা) দুআ করলেন। তার ঘোড়া মুক্ত হয়ে গেল। সংগে সংগে তার লালসাও আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। সে তার ঘোড়াটি আবার রাসূলের (সা) দিকে হাঁকালো। এবার পূর্বের চেয়েও মারাত্মকভাবে তার ঘোড়ার পা মাটিতে আটকে গেল। এবারও সে রাসূলের (সা) সাহায্য কামনা করে বললো, 'আমার এ খাদ্য সামগ্রী, আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র তোমরা নিয়ে নাও। আমি আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করছি, মুক্তি পেলে আমি আমার পেছনে ধাবমান লোকদের তোমাদের থেকে অন্য দিকে হটিয়ে দেব।'

তাঁরা বললেন, 'তোমার খাদ্য সামগ্রী ও আসবাবপত্রের প্রয়োজন আমাদের নেই। তবে তুমি লোকদের আমাদের থেকে দূরে হটিয়ে দেবে।' অতঃপর রাসূল (সা) তার জন্য দুআ করলেন। তার ঘোড়াটি মুক্ত হয়ে গেল। সে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাসূল (সা) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে ডেকে বললো, 'তোমরা একটু থাম, তোমাদের সাথে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আল্লাহর কসম, তোমাদের কোন অকল্যাণ আমি করবো না।'

রাসূল (সা) ও আবু বকর উভয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি আমাদের কাছে কী চাও?' সে বললো, 'আল্লাহর কসম, হে মুহাম্মাদ, আমি নিশ্চিতভাবে জানি শিগগিরই তোমার দ্বীন বিজয়ী হবে। আমার সাথে তুমি ওয়াদা কর, আমি যখন তোমার সাম্রাজ্যে যাব, তুমি আমাকে সম্মান দেবে। আর এ কথাটি একটু লিখে দাও।'

রাসূল (সা) আবু বকরকে লিখতে বললেন। তিনি একখণ্ড হাড়ের ওপর কথাগুলি লিখে তার হাতে দিলেন। সুরাকা ফিরে যাবার উপক্রম করছে, এমন সময় রাসূল (সা) তাকে বললেন, 'সুরাকা, তুমি যখন কিসরার রাজকীয় পোশাক পরবে তখন কেমন হবে'?

বিস্ময়ের সাথে সুরাকা বললো, 'কিসরা ইবন হুরমুয?' রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, কিসরা ইবন হুরমুয।'

সুরাকা পেছন ফিরে চলে গেল। ফেরার পথে সে দেখতে পেল লোকেরা তখনও রাসূলকে (সা) সন্ধান করে ফিরছে। সে তাদেরকে বললো, 'তোমরা ফিরে যাও।' আমি এ অঞ্চলে বহুদূর পর্যন্ত তাকে খুঁজেছি। আর তোমরা তো জান পদ-চিহ্ন অনুসরণের ক্ষেত্রে আমার যোগ্যতা কতখানি। তার এ কথায় লোকেরা ফিরে গেল।

মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের খবর সে সম্পূর্ণরূপে চেপে গেল। যখন তার স্থির বিশ্বাস হলো এত দিনে তাঁরা মদীনায় পৌছে কুরাইশদের শত্রুতা থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছেন, তখন সে তার ঘটনাটি প্রচার করলো। রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে সুরাকার ভূমিকা ও আচরণের খবর যখন আবু জাহলের কানে গেল সে তার ভীরুতা ও সুযোগের সদ্ব্যবহার না করার জন্য ভীষণ তিরস্কার করলো। উত্তরে সে তার স্বরচিত দু'টি শ্লোক আবৃত্তি করলো ঃ

'আল্লাহর শপথ, তুমি যদি দেখতে আবু হিকাম,
আমার ঘোড়ার ব্যাপারটি, যখন তার পা ডুবে যাচ্ছিল, তুমি জানতে
এবং তোমার কোন সংশয় থাকতো না, মুহাম্মাদ প্রকৃত রাসূল–
সুতরাং কে তাঁকে প্রতিরোধ করে?'

ইবন হাজার *'আল ইসাবা'* গ্রন্থে শ্লোক দু'টি উল্লেখ করেছেন।

সময় দ্রুত বয়ে চললো। একদিন যে মুহাম্মাদ (সা) মক্কা থেকে রাতের অন্ধকারে গোপনে সরে গিয়েছিলেন, আবার তিনি বিজয়ীর বেশে হাজার হাজার সশস্ত্র সঙ্গীসহ প্রবেশ করলেন সেই মক্কা নগরীতে। অত্যাচারী ও অহংকারী কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, যাদের দৌরাত্মে সর্বদা প্রকম্পিত থাকতো মক্কা, ভীত-বিহ্বল চিত্তে হাজির হলো মুহাম্মাদের (সা) নিকট করুণা ভিক্ষার জন্য।

মহানুভব নবী (সা) তাদের বললেন, 'যাও তোমরা সবাই মুক্ত, স্বাধীন।'

সুরাকা ইবন মালিক চললো রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে তার ইসলামের ঘোষণা দানের জন্য। সে সঙ্গে নিল দশ বছর পূর্বে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহর (সা) সেই অঙ্গীকার পত্রটি। পরবর্তীকালে সুরাকা বর্ণনা করেছেন ঃ

'আমি জি'রানা (মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থান) থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসলাম। আনসারদের একদল সৈনিকের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লে তারা আমাকে তীরের বাট দিয়ে পিটাতে শুরু করে এবং বলতে থাকে, 'দূর হও, দূর হও, কি চাও?' তবুও আমি তাদের সারির মধ্যে ঢুকে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহর (সা) কাছাকাছি গেলাম। তিনি তখন তার উটনীর ওপর সওয়ার। আমি সেই অঙ্গীকার পত্রটিসহ হাত উঁচু করে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সুরাকা ইবন মালিক। আর এই হলো আপনার অঙ্গীকার পত্র।'

রাসূল (সা) বললেন, 'সুরাকা, আমার কাছে এসো, আজ প্রতিশ্রুতি পালন ও সদ্ব্যবহারের দিন।'

আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছাকাছি গিয়ে তাঁর সামনে ইসলামের ঘোষণা দিলাম। এভাবে আমি তাঁর কল্যাণ ও বরকত লাভে ধন্য হলাম।'

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতে হযরত সুরাকা (রা) ব্যথিত ও শোকাভিভূত হন। একশ'টি উটের লোভে যেদিন রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সে দিনটির কথা ঘুরে ফিরে তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠতে থাকে। এখন পৃথিবীর সকল উটও রাসূলুল্লাহর (সা) একটি নখাগ্রেরও সমান নয়। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সেই প্রশ্নটি বার বার আওড়াতেন, 'সুরাকা, যেদিন তুমি কিসরার পোশাক পরবে, কেমন হবে?' কিসরার পোশাক যে সত্যি তিনি পরবেন সে ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা।

সময় বয়ে চললো। ইসলামী খিলাফাতের দায়িত্ব হযরত উমার ফারুকের (রা) হাতে ন্যস্ত হলো। তাঁর গৌরবময় যুগে মুসলিম সেনাবাহিনী ঝড়ের গতিতে পারস্য সাম্রাজ্যে প্রবেশ করলো। তাঁরা পারস্যের দুর্গসমূহ তছনছ করে দিয়ে তাদের বাহিনীকে পরাজিত করে পারস্য-সিংহাসন দখল করলো।

হযরত উমারের (রা) খিলাফাতকালের শেষ দিকে পারস্য জয়ের সুসংবাদ নিয়ে সেনাপতি সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের দূত পৌঁছলেন মদীনায়। তিনি সংগে নিয়ে এলেন পারস্যের গনীমাতের এক পঞ্চমাংশ। গনীমাতের ধন-দৌলত উমারের সামনে স্তূপীকৃত করা হলে তিনি বিস্ময়ের সাথে সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন। তার মধ্যে ছিল কিসরার মণি-মুক্তা খচিত মুকুট, সোনার জরি দেয়া কাপড়, মুক্তার হার, এবং তার এমন চমৎকার দু'টি জামা যা ইতিপূর্বে আর কখনও হযরত উমার দেখেননি। তাছাড়া আর ছিল বহু অমূল্য জিনিস। হযরত উমার হাতের লাঠিটি দিয়ে এই মূল্যবান ধন-রত্ন উল্টাতে লাগলেন। তারপর চারপাশে উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যারা এসব জিনিস থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে জমা দিয়েছে, নিশ্চয় তারা অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন।

হযরত আলী (রা), তিনি তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন, বলেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি বিশ্বাস ভঙ্গ করেননি, আপনার প্রজারাও ভঙ্গ করেনি। আপনি যদি অন্যায়ভাবে খেতেন, তাহলে তারাও খেত।

অতঃপর হযরত উমার (রা) সুরাকা ইবন মালিককে ডেকে নিজ হাতে তাঁকে কিসরার জামা, পাজামা, জুতো ও অন্যান্য পোশাক পরালেন। তাঁর কাঁধে ঝুলালেন কিসরার তরবারি, কোমরে বাঁধলেন বেল্ট, মাথায় রাখলেন মুকুট এবং তাঁর হাতে পরালেন বালা। সে বালা কতই না চমৎকার!

হযরত উমার (রা) সুরাকাকে পরাচ্ছেন কিসরার পোশাক, আর এ দিকে মুসলমানদের মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনিতে মদীনার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠছে।

কিসরার পোশাক পরা শেষ হলে সুরাকার দিকে ফিরে হযরত উমার (রা) বললেন, 'সাবাশ, সাবাশ, মুদলাজ গোত্রের ক্ষুদে এক বেদুঈনের মাথায় শোভা পাচ্ছে শাহানশাহ কিসরার মুকুট এবং হাতে বালা।' তারপর তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, এ সম্পদ তুমি রাসূলুল্লাহকে (সা) দাওনি, অথচ তিনি ছিলেন তোমার কাছে আমার থেকে অধিক প্রিয় ও সম্মানিত। তুমি দাওনি এ সম্পদ আবু বকরকেও। তিনিও

ছিলেন তোমার নিকট আমার থেকেও অধিকতর প্রিয় ও মর্যাদাবান। আর তা দান করেছো আমাকে পরীক্ষার জন্য। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।' অতঃপর তিনি সূরা মুমিনুনের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি পাঠ করলেন, 'তারা কি মনে করে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তা দ্বারা তাদের সকল প্রকার মঙ্গল তরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না।' (৫৫-৫৬)

সকল সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন না করা পর্যন্ত তিনি সে মজলিস ত্যাগ করলেন না।

হযরত সুরাকা ইবন মালিকের এ কাহিনী ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদও আল-বারা ইবন আযিব ও আবু বকর সিদ্দীকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আবু আমর বলেন, সুরাকা ইবন মালিক খলীফা 'উসমানের খিলাফতকালে ২৪ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত উসমানের পরে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইকরিমা ইবন আবী জাহল (রা)

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ 'শিগগিরই ইকরিমা কুফর ত্যাগ করে মুমিন হিসেবে তোমাদের কাছে আসছে। তোমরা তার পিতাকে (আবু জাহল) গালি দেবেনা। কারণ মৃতকে গালি দিলে জীবিতদের মনোকষ্টের কারণ হয় এবং মৃতের কাছে তা পৌছেনা।'

নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কায় দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করেন তখন ইকরিমার বয়সের তৃতীয় দশকটি শেষ হতে চলেছে। কুরাইশদের মধ্যে বংশের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সর্বাধিক সম্মানিত ও ধনশালী। মক্কার সম্ভ্রান্ত গৃহের সন্তান সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, মুস'য়াব ইবন উমাইর প্রমুখের মত তাঁরও উচিত ছিল প্রথম স্তরেই ইসলাম গ্রহণ করা। কিন্তু তাঁর পিতার জন্য তা সম্ভব হয়নি।

তাঁর পিতা আবু জাহল ছিল মক্কার সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাচারী, প্রথম যুগের মুশরিকদের নেতা ও কঠোর অত্যাচারী। আল্লাহ তা'আলা তার অত্যাচার-উৎপীড়নের মাধ্যমে মু'মিনদের ঈমান পরীক্ষা করেছেন এবং সে পরীক্ষায় তাঁরা সফলকাম হয়েছেন। তার ধোঁকার মাধ্যমে বিশ্বাসীদের সত্যতা যাচাই করেছেন এবং তাতে তাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন।

পিতার নেতৃত্বে ইকরিমা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) শত্রুতায় আত্মনিয়োগ করেন। এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত কঠোর। তাঁর অত্যাচারে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিল। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাঁর এ নিষ্ঠুরতা দেখে তাঁর পিতা আবু জাহল পরম আত্মতৃপ্তি অনুভব করতো।

তাঁর পিতা বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের নেতৃত্ব দেয়। সে লাত ও উজ্জার নামে শপথ করে যে, মুহাম্মাদের একটা হেনস্তা না করে মক্কায় ফিরবে না। বদরে ঘাঁটি গেড়ে দিন তিন অবস্থান করলো, উট জবেহ করলো, মদ পান করে মাতাল হলো এবং গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে নাচ-গানে মত্ত হলো। আবু জাহল যখন এ যুদ্ধ পরিচালনা করছিল, ইকরিমা তখন তার ডান হাত– প্রধান সহযোগী। কিন্তু লাত ও উজ্জা এ যুদ্ধে আবু জাহলের ডাকে সাড়া দেয়নি, এ দু'টি উপাস্য মূর্তি তাকে কোন সাহায্য করতে পারেনি। পারা সম্ভবও ছিলো না।

বদরের ময়দানে আবু জাহল মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো। ইকরিমা নিজ চোখেই দেখলেন কিভাবে মুসলমানদের তীরের ফলা তাঁর পিতার রক্ত পান করছে এবং তিনি নিজ কানেই শুনতে পেলেন তাঁর পিতার মুখের অন্তিম চিৎকার ধ্বনিটি।

কুরাইশ নেতা আবু জাহলের মৃতদেহটি বদরে ফেলে রেখে ইকরিমা মক্কায় ফিরে এলেন। শোচনীয় পরাজয় তাঁকে পিতার লাশটি দাফনের সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। মুসলমানরা বদরে নিহত অন্যান্য মুশরিক সৈন্যদের সাথে তারও লাশটি 'কালীব' নামক কূপে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দেয়। এভাবেই এ অহঙ্কারী অত্যাচারী কুরাইশ নেতার দর্প চূর্ণ হয়।

এ দিন থেকেই ইসলামের সাথে ইকরিমার আচরণ নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ

যাবত তিনি পিতার মান-মর্যাদা রক্ষার্থে ইসলামের সাথে দুশমনী করে এসেছেন। আর এখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন পিতার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের। বদরে অন্য যারা পিতৃহারা হয়েছিল, তিনি তাদের সাথে সম্মিলিতভাবে মুহাম্মাদের (সা) বিরুদ্ধে মুশরিকদের অন্তরে শত্রুতার আগুন জ্বালিয়ে দিতে শুরু করলেন এবং তাদেরকে বদরে নিহতদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন। এভাবেই উহুদের যুদ্ধটি সংগঠিত হয়।

ইকরিমা ইবন আবু জাহল উহুদের দিকে যাত্রা করলেন। সংগে তাঁর স্ত্রী উম্মু হাকীমও বদরে স্বামী, ভ্রাতা ও পুত্রহারা নারীদের সাথে চললেন। উদ্দেশ্য, তারা সেখানে যুদ্ধরত সৈনিকদের পশ্চাতে অবস্থান করে বাদ্য বাজাবেন, কুরাইশদেরকে যুদ্ধে উৎসাহ দেবেন এবং পলায়ন উদ্যত সৈনিকদেরকে সাহস ও শক্তি যোগাবেন।

কুরাইশরা তাদের অশ্বারোহী সৈনিকদের ডান দিকে খালিদ বিন ওয়ালিদ ও বাম দিকে ইকরিমা ইবন আবী জাহলকে নিয়োগ করলো। সেদিন তারা দু'জন সাহসিকতা ও রণকৌশলের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। তাঁরা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীদের হাত থেকে বিজয়ের গৌরব ছিনিয়ে এনে কুরাইশদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তাই সেদিনকার কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান বলতে পেরেছিলেন ঃ 'এটা বদরের দিনের প্রতিশোধ।'

এরপর এলো খন্দকের যুদ্ধ। মুশরিক সৈন্যরা কয়েকদিন যাবত মদীনা অবরোধ করে রেখেছে। ইকরিমার ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে যাচ্ছে, তিনি তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠছেন। অবশেষে তিনি দেখতে পেলেন খন্দকের এক স্থানে সংকীর্ণ একটা পথ। তার মধ্য দিয়ে অতি কষ্টে তিনি তাঁর ঘোড়াটি ঢুকিয়ে দিলেন এবং খন্দক পার হয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করে খন্দক পার হলো আরো কিছু মুশরিক সৈনিক। মুসলিম সৈনিকরা তাদেরকে তাড়া করে। ইকরিমা তাঁর অন্য সংগীদের সাথে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান, কিন্তু তাঁর একজন সংগী আমর ইবনু আবদে উদ্দ আল-আমিরী মুসলিম সৈনিকদের হাতে প্রাণ হারায়।

মক্কা বিজয়ের দিন কুরাইশরা বুঝতে পেল মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সাথীদের বাধা দেওয়া কোনভাবেই সম্ভব হবে না। তারা মুসলমানদের পথ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। মুহাম্মাদ (সা) ঘোষণা করলেন ঃ মক্কাবাসীদের যারা মুসলিম সৈনিকদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, কেবল তাদের সাথেই যুদ্ধ করা হবে। তাছাড়া অন্য সকলকে ক্ষমা করা হবে।

ইকরিমা ইবনে আবী জাহল এবং আরো একদল সৈনিক কুরাইশদের সিদ্ধান্ত অমান্য করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাড়া করেন। খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলিম সৈনিকদের ছোট্ট একটি দল তাদের এ প্রতিরোধ ব্যূহ তছনচ করে দেয়। তাঁরা তাদের অনেককে হত্যা করে এবং অনেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। এ পলায়নকারীদের মধ্যে ইকরিমা ইবন আবী জাহলও ছিলেন।

মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের পর ইকরিমা ইবন আবী জাহল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি এই প্রথম বারের মত তাঁর শক্তি মদমত্ততা থেকে সম্বিত ফিরে

পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন মক্কা আর তাঁর জন্যে নিরাপদ নয়। এদিকে রাসূল (সা) মক্কাবাসীদের সকলের অতীত আচরণ ক্ষমা করে দেন। তবে তিনি কয়েকজনের নাম উচ্চারণ করে তাদেরকে এ ক্ষমার আওতা থেকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করেন। কা'বার গিলাফের নীচে পাওয়া গেলেও তিনি তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন। হত্যার নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকার শীর্ষস্থানে ইকরিমার নামটি। তিনি কোন উপায়ান্তর না দেখে গোপনে মক্কা থেকে বের হয়ে ইয়ামনের দিকে যাত্রা করেন।

এদিকে ইকরিমার স্ত্রী উম্মু হাকীম ও হিন্দা বিনতু উতবা গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে। তাদের সাথে গেলেন আরো অনেক মহিলা। উদ্দেশ্য তাঁদের, রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত হওয়া। তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছলেন, তখন তার কাছে বসা ছিলেন তাঁর দু' স্ত্রী, কন্যা ফাতিমা ও বনী আবদুল মুত্তালিবের আরো বহু মহিলা। মাথা ও মুখ ঢাকা অবস্থায় হিন্দা কথা বললেন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে। হিন্দা ছিলেন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী ও আমীর মুয়াবিয়ার মা। উহুদের যুদ্ধে হযরত হামযার (রা) কলিজা চিবিয়েছিলেন ইনিই। তাই মক্কা বিজয়ের দিনে লজ্জা ও অনুশোচনায় মাথা ও মুখ ঢেকে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে উপস্থিত হন।

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তাঁর মনোনীত দ্বীনকে বিজয়ী করেছেন। আপনার ও আমার মাঝে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে সে সূত্রে আমি আপনার নিকট ভালো ব্যবহার আশা করি। এখন আমি একজন ঈমানদার ও বিশ্বাসী নারী' এ কথা বলেই তিনি তাঁর অবগুণ্ঠন খুলে পরিচয় দেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি হিন্দা বিনতু উতবা'। রাসূল (সা) বললেন, 'খোশ আমদেদ।' হিন্দা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, হেয় ও অপমানিত করার জন্য আপনার বাড়ী থেকে আমার নিকট অধিক প্রিয় বাড়ী ধরাপৃষ্ঠে এর আগে আর ছিলনা। আর এখন আপনার বাড়ী থেকে অধিক সম্মানিত বাড়ী আমার নিকট দ্বিতীয়টি নেই।'

রাসূল (সা) বললেন ঃ আরো অনেক বেশী।

এরপর ইকরিমার স্ত্রী উম্মু হাকীম উঠে দাঁড়িয়ে ইসলাম গ্রহণের স্বীকৃতি দিলেন। তারপর বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি ইকরিমাকে হত্যা করতে পারেন, এ ভয়ে সে ইয়ামনের দিকে পালিয়ে গেছে। আপনি তাকে নিরাপত্তা দিন আল্লাহ আপনাকে নিরাপত্তা দেবেন। রাসূল (সা) বললেন, 'সে নিরাপদ'।

সেই মুহূর্তে উম্মু হাকীম তাঁর স্বামী ইকরিমার সন্ধানে বের হলেন। সংগে নিলেন তাঁর এক রূমী ক্রীতদাস। তারা দু'জন রাস্তায় চলছেন। পথিমধ্যে দাসটির মনে তার মনিবের প্রতি অসৎ কামনা দেখা দিল। সে চাইলো তাঁকে ভোগ করতে, আর তিনি নানা রকম টালবাহানা করে সময় কাটাতে লাগলেন। এভাবে তারা একটি আরব গোত্রে পৌঁছলেন। সেখানে উম্মু হাকীম তাদের সাহায্য কামনা করলেন। তারা তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দিল। তিনি তাঁর দাসটিকে তাদের জিম্মায় রেখে একাকী পথে বের হলেন। অবশেষে তিনি তিহামা অঞ্চলে সমুদ্র উপকূলে ইকরিমার দেখা পেলেন। সেখানে তিনি এক মাঝির সাথে কথা বলছেন তাঁকে পার করে দেওয়ার জন্য, আর মাঝি তাকে

বলছেন ঃ

– 'সত্যবাদী হও'

ইকরিমা তাকে বললেন,

– **'কিভাবে আমি সত্যবাদী হবো?'**

মাঝি বললেন,

– **'তুমি বলো,** আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।'

– **'আমি** তো শুধু এ কারণেই পালিয়েছি।' তাদের দু'জনের এ কথোপকথনের **মাঝখানেই** উম্মু হাকীম উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

'হে আমার চাচাতো ভাই, আমি সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম ব্যক্তির নিকট থেকে আসছি। আমি তাঁর কাছে তোমার জন্য আমান চেয়েছি। তিনি তোমার আমান মঞ্জুর করেছেন। সুতরাং এরপরও তুমি নিজেকে ধ্বংস করোনা।'

এ কথা শুনে ইকরিমা জিজ্ঞেস করলেন ঃ

– 'তুমি নিজেই তাঁর সাথে কথা বলেছো?'

তিনি বললেন ঃ

– 'হা, আমিই তাঁর সাথে কথা বলেছি, এবং তিনি তোমাকে আমান দিয়েছেন'— এভাবে বার বার তিনি তাঁকে আমানের কথা শুনাতে লাগলেন ও তাঁকে আশ্বাস দিতে লাগলেন। অবশেষে আশ্বস্ত হয়ে তিনি স্ত্রীর সাথে ফিরে চললেন।

পথে চলতে চলতে উম্মু হাকীম তাঁর দাসটির কাণ্ড-কারখানার কথা স্বামীকে খুলে বললেন। ফেরার পথে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই ইকরিমা দাসটিকে হত্যা করেন।

পথিমধ্যে তাঁরা এক বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেন। ইকরিমা চাইলেন একান্তে তাঁর স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে। কিন্তু স্ত্রী কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

– 'আমি একজন মুসলিম নারী এবং আপনি এখনও একজন মুশরিক। স্ত্রীর কথা শুনে ইকরিমা অবাক হয়ে গেলেন।

তিনি বললেন,

– 'তোমার ও আমার মিলনের মাঝখানে যে ব্যাপারটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা তো খুব বিরাট ব্যাপার।!'

এভাবে ইকরিমা যখন মক্কার নিকটবর্তী হলেন, তখন রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদের বললেন ঃ 'খুব শিগ্‌গিরই ইকরিমা কুফর ত্যাগ করে মুমিন হিসেবে তোমাদের কাছে আসছে। তোমরা তার পিতাকে গালি দেবে না। কারণ মৃতকে গালি দিলে তা জীবিতদের মনে কষ্টের কারণ হয় এবং মৃতের কাছে তা পৌঁছে না।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইকরিমা তাঁর স্ত্রীসহ রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) তাঁকে দেখেই আনন্দে উঠে দাঁড়ালেন এবং চাদর গায়ে না জড়িয়েই তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর রাসূল (সা) বসলেন। ইকরিমা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ

– 'ইয়া মুহাম্মাদ, উম্মু হাকীম আমাকে বলেছে, আপনি আমাকে আমান দিয়েছেন।'

নবী (সা) বললেন, 'সে সত্যই বলেছে। তুমি নিরাপদ।'

ইকরিমা বললেন, 'মুহাম্মাদ, আপনি কিসের দাওয়াত দিয়ে থাকেন?'

রাসূল (সা) বললেন, 'আমি তোমাকে দাওয়াত দিচ্ছি তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল। তারপর তুমি নামায কায়েম করবে, যাকাত দান করবে।' এভাবে তিনি ইসলামের সবগুলি আরকান বর্ণনা করলেন।

ইকরিমা বললেন, 'আল্লাহর কসম, আপনি একমাত্র সত্যের দিকেই দাওয়াত দিচ্ছেন এবং কল্যাণের নির্দেশ দিচ্ছেন।' তারপর তিনি বলতে লাগলেন ঃ

– 'এ দাওয়াতের পূর্বেই আপনি ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী এবং সবচেয়ে সৎকর্মশীল।' তারপর একথা বলতে বলতে তিনি হাত বাড়িয়ে দেন এবং বলেন, 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।' একথার পর তিনি বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বলতে পারি, এমন কিছু ভাল কথা আমাকে শিখিয়ে দিন।'

রাসূল (সা) বললেন, 'তুমি বলো, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

রাসূল (সা) বললেন, "তুমি বলো, 'উশহিদুল্লাহা ওয়া উশহিদু মান হাদারা আন্নি মুসলিমুন মুজাহিদুন মুহাজিরুন'– আল্লাহ ও উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রেখে আমি বলছি, আমি একজন মুসলিম, মুজাহিদ ও মুহাজির।"

ইকরিমা তা-ই বললেন। এ সময় রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, 'অন্য কাউকে আমি দিচ্ছি, এমন কোন কিছু আজ যদি আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব।'

ইকরিমা বললেন, 'আমি আপনার কাছে চাচ্ছি; যত শত্রুতা আমি আপনার সাথে করেছি, যত যুদ্ধে আমি আপনার মুখোমুখি হয়েছি এবং আপনার সামনে অথবা পশ্চাতে যত কথাই আমি আপনার বিরুদ্ধে বলেছি– সবকিছুর জন্য আপনি আল্লাহর কাছে আমার মাগফিরাত কামনা করুন।' তক্ষুণি রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ, যত শত্রুতাই সে আমার সাথে করেছে, তোমার নূরকে নিভিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হতে যত পথই সে ভ্রমণ করেছে, সবকিছুই তাকে ক্ষমা করে দাও। আমার সামনে বা অগোচরে আমার মানহানিকর যত কথাই সে বলেছে, তা-ও তুমি ক্ষমা করে দাও।'

আনন্দে ইকরিমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য যতকিছু আমি ব্যয় করেছি তার দ্বিগুণ আমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবো এবং আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যত যুদ্ধ আমি করেছি, তার দ্বিগুণ যুদ্ধ আমি আল্লাহর রাস্তায় করবো।'

এ দিন থেকেই তিনি দাওয়াতের মিছিলে প্রবেশ করলেন। তিনি হলেন যুদ্ধের ময়দানে দুঃসাহসী অশ্বারোহী, মসজিদে সর্বাধিক ইবাদতকারী, রাত্রি জাগরণকারী ও আল্লাহর কিতাব পাঠকারী। পবিত্র কুরআন মুখের ওপর রেখে তিনি বলতেন ঃ 'কিতাবু

রাব্বি কালামু রাব্বি—আমার রবের কিতাব, আমার প্রভুর কালাম।' একথা বলতেন, আর আকুল হয়ে কাঁদতেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ইকরিমা যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তিনি অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা যত যুদ্ধই করেছে, তার প্রত্যেকটিতে তিনি অংশ নেন এবং যত অভিযানেই তারা বের হয়েছে তিনি থাকেন তার পুরোভাগে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে গ্রীষ্মের দুপুরে পিপাসিত ব্যক্তি যেমন ঠাণ্ডা পানির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি তিনি শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধের কোন এক পর্যায়ে মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হলো, তিনি তখন ঘোড়া থেকে নেমে তরবারি কোষ-মুক্ত করেন এবং রোমান বাহিনীর অভ্যন্তরভাগে ঢুকে পড়েন। অবস্থা বেগতিক দেখে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর দিকে ছুটে যান এবং বলেন, 'ইকরিমা এমনটি করোনা। তোমার হত্যা মুসলমানদের জন্য বিপজ্জনক হবে।'

জবাবে তিনি বললেন ঃ

'খালিদ আমাকে ছেড়ে দাও। রাসূলের (সা) ওপর ঈমান আনার ব্যাপারে তুমি আমার থেকে অগ্রগামী। আমার পিতা ও আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে বড় শত্রু। আমাকে আমার অতীতের কাফফারা আদায় করতে দাও। অনেক যুদ্ধেই আমি রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে লড়েছি। আর আজ আমি রোমান বাহিনীর ভয়ে পালিয়ে যাব? এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' একথা বলে তিনি মুসলমানদের কাছে আবেদন জানালেন, 'মৃত্যুর ওপর বাইয়াত করতে চায় কে?' তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিলেন তাঁর চাচা হারিস ইবন হিশাম, দিরার ইবনুল আযওয়ার ও আরো চার শ' মুসলিম সৈনিক। তাঁরা খালিদ ইবন ওয়ালিদের তাঁবুর সম্মুখভাগ থেকেই তুমুল লড়াই চালিয়ে ইয়ারমুকের ময়দানে বিরাট বিজয় ও সম্মান বয়ে এনেছিলেন। এই ইয়ারমুকের ময়দানেই হারিস ইবন হিশাম, আয়য়াশ ইবন আবী রাবিয়া ও ইকরিমা ইবন আবী জাহলকে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। পিপাসায় কাতর হারিস ইবনে হিশাম পানি চাইলেন। যখন তাঁকে পানি দেয়া হলো, ইকরিমা তখন তাঁর দিকে তাকালেন। এ দেখে তিনি বললেন, 'ইকরিমাকে দাও।' পানির গ্লাসটি যখন ইকরিমার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তখন আয়য়াশ তার দিকে তাকালেন। তা দেখে ইকরিমা বললেন, 'আয়য়াশকে দাও।' আয়য়াশের কাছে পানির গ্লাসটি নিয়ে যাওয়া হলে দেখা গেল, তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তারপর গ্লাসটি হাতে নিয়ে একে একে তার অপর দুই সাথীর কাছে গিয়ে দেখা গেল তাঁরাও তারই পথের পথিক হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলের প্রতি রাজী ও খুশী থাকুন। আমীন।

আসমা বিনতু আবী বকর (রা)

ঐতিহাসিকরা বলেন, 'হযরত আসমা (রা) একশ' বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু এ দীর্ঘ জীবনে তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি বা তাঁর সামান্য বুদ্ধিভ্রষ্টতাও দেখা যায়নি।'

এ মহিলা সাহাবী সর্বদিক দিয়েই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর পিতা, পিতামহ, ভগ্নি, স্বামী ও পুত্র সকলেই ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী। একজন মুসলমানের এর চাইতে বেশী সম্মান, মর্যাদা, ও গৌরবের বিষয় কি হতে পারে?

পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালের বন্ধু, ওফাতের পর তাঁর প্রথম খলীফা। মাতা কুতাইলা বিনতু আবদিল 'উয্যা। পিতামহ হযরত আবু বকরের পিতা আবু কুহাফা বা আবু আতীক। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা) তাঁর বোন। রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী বিশেষ সাহায্যকারী যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) তাঁর স্বামী ও সত্য এবং ন্যায়ের পথে শহীদ হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর তাঁর পুত্র। এ হলো হযরত আসমা বিনতু আবু বকরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। হিজরাতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথম যুগেই যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, আসমা (রা) তাঁদেরই একজন। মাত্র সতেরো জন নারী পুরুষ ব্যতীত আর কেউ তাঁর আগে এ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি। তাঁকে 'জাতুন নিতাকাইন'—দু'টি কোমর বন্ধনীর অধিকারিণী বলা হয়। কারণ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের সময় তিনি রাসূল (সা) ও তাঁর পিতার জন্য থলিতে পাথেয় ও মশকে পানি গুছিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখ বাঁধার জন্য ধারে কোন রশি খুঁজে পেলেন না। অবশেষে নিজের কোমরের নিতাক বা বন্ধনী খুলে দু'টুকরো করে একটা দ্বারা থলি ও অন্যটি দ্বারা মশকের মুখ বেঁধে দেন, এ দেখে রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করেন ঃ আল্লাহ যেন এর বিনিময়ে জান্নাতে তাঁকে দু'টি 'নিতাক' দান করেন। এভাবে তিনি 'জাতুন নিতাকাইন' উপাধি লাভ করেন।

যুবাইর ইবনুল আওয়ামের সাথে যে সময় তার বিয়ে হয় তখন যুবাইর অত্যন্ত দরিদ্র ও রিক্তহস্ত। তাঁর কোন চাকর-বাকর ছিলনা এবং একটি মাত্র ঘোড়া ছাড়া পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোন সম্পদও ছিলনা। তবে যুবাইর একজন পুণ্যবতী ও সৎকর্মশীলা স্ত্রী লাভ করেছিলেন। তিনি স্বামীর সেবা করতেন, নিজ হাতে তাঁর ঘোড়াটির জন্য ভুষি পিষতেন ও তার তত্বাবধান করতেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে প্রাচুর্য দান করেন এবং তাঁরা অন্যতম ধনী সাহাবী পরিবার হিসাবে পরিগণিত হন।

হযরত আসমা (রা) বর্ণনা করেছেন। যুবাইর (রা) যখন আমাকে বিয়ে করেন তখন একটি ঘোড়া ছাড়া তাঁর আর কিছু ছিলনা। ঘোড়াটি আমিই চরাতাম ও ভুষি খাওয়াতাম। খেজুরের আটি পিষে ভূষি বানাতাম। আমি যুবাইরের ক্ষেত থেকে– যে ক্ষেত রাসূল (সা) তাঁকে দিয়েছিলেন মাথায় করে খেজুরের আটি নিয়ে আসতাম। ক্ষেতটি ছিল পৌনে এক ফারসাখ দূরে। একদিন আমি খেজুরের আটি মাথায় করে ঘরে ফিরছি, এমন সময় পথে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখা। তাঁর সাথে তখন আরও কয়েকজন লোক ছিল। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং তাঁর বাহনের পিঠে উঠে বসার জন্য বললেন। কিন্তু আমি লজ্জা পেলাম এবং যুবাইর ও তার মান-মর্যাদার কথা মনে করলাম। রাসূল (সা) চলে গেলেন। বাড়ী ফিরে আমি এ ঘটনার কথা যুবাইরকে বললাম। এরপর পিতা

আবু বকর (রা) আমার জন্য একটি চাকর দেন। সে-ই তখন ঘোড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে যেন আমাকে মুক্তি দিল। (সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা-২/২৯০-২৯১, তাবাকাত-৮/২৫০, মুসনাদে আহমাদ- ৬/৩৪৭, ৩৫২)

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের সময় ঘনিয়ে এলো। তিনি তখন পূর্ণ অন্তঃসত্তা, আবদুল্লাহ্ তাঁর গর্ভে। তা সত্বেও এ কষ্টকর দীর্ঘ ভ্রমণে ভয় পেলেন না, আল্লাহর নামে বেরিয়ে পড়লেন। কুবা পৌঁছার পরই তিনি প্রসব করেন আবদুল্লাহকে। এ আবদুল্লাহ ছিলেন মদীনার মুহাজিরদের গৃহে, মদীনায় আসার পর জন্মগ্রহণকারী প্রথম সন্তান। এ কারণে মুসলমানরা তাঁর জন্মের খবর শুনে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করে। তাঁর মা আসমা সদ্য প্রসূত সন্তানটিকে কোলে করে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে যান এবং তাঁর কোলে তুলে দেন। রাসূল (সা) নিজের জিহ্বা থেকে কিছু থু থু নিয়ে শিশুটির মুখে দেন এবং তার 'তাহনীক' (খুরমা বা কিছু চিবিয়ে মুখে দেয়া) করে তার জন্য দু'আ করেন। তাই পার্থিব কোন জিনিস তার পেটে প্রবেশ করার পূর্বে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র থু থু তার পেটে প্রবেশ করেছিল।

হযরত আসমা বিনতু আবু বকরের মধ্যে সততা, দানশীলতা, মহত্ব ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার মত এমন সব সুষম চারিত্রিক গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছিল যা ছিল বিরল। তাঁর দানশীলতা তো একটি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বলেনঃ 'আমি আমার মা আসমা ও খালা আয়িশা থেকে অধিক দানশীলা কোন নারী দেখিনি। তবে তাঁদের দু'জনের দান প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ ছিল। আমার খালার স্বভাব ছিল প্রথমতঃ তিনি বিভিন্ন জিনিস একত্র করতেন। যখন দেখতেন যে যথেষ্ট পরিমাণে জমা হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ করে একদিন তা সবই গরীব মিসকীনদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মার স্বভাব ছিল ভিন্নরূপ। তিনি আগামীকাল পর্যন্ত কোন জিনিস নিজের কাছে জমা করে রাখতেন না।'

আসমা (রা) ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। তাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন সংকটের সময়ে। ইবন হিশামের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসূল (সা) ও আবু বকরের হিজরাতের খবর মক্কায় ছড়িয়ে পড়লে পরদিন আবু জাহল ও আরো কতিপয় কুরাইশ নেতা আবু বকরের বাড়ীতে আসে এবং আসমাকে সামনে পেয়ে তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার বাবা আবু বকর কোথায়?' আসমা বলতে অস্বীকৃতি জানালে নরাধম আবু জাহল তাঁর গালে জোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। ফলে তাঁর কানের দুল দু'টি ছিটকে পড়ে যায়।

হিজরাতের সময় রাসূল (সা) ও আবু বকরের (রা) সাওর পর্বতের গুহায় অবস্থানকালে রাতের অন্ধকারে আসমা তাঁদের জন্য খাবার ও পানীয় নিয়ে যেতেন।

তাঁর পিতা আবু বকর (রা) হিজরাতের সময় যাবতীয় নগদ অর্থ সাথে নিয়ে যান। দাদা আবু কুহাফা তা জানতে পেরে বলেন, 'সে জান ও মাল উভয় ধরনের কষ্ট দিয়ে গেল।' আসমা দাদাকে বললেন, 'না, তিনি অনেক সম্পদ রেখে গেছেন।' একথা বলে আবু বকর (রা) যেখানে অর্থ-সম্পদ রাখতেন সেখানে অনেক পাথর রেখে দিলেন। তারপর আবু কুহাফাকে ডেকে এসে বললেন ঃ 'দেখুন, এসব রেখে গেছেন।' আবু কুহাফা অন্ধ ছিলেন। তিনি আসমার কথায় বিশ্বাস করেন। আসমা বলেন ঃ 'আবু কুহাফাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমি এমনটি করেছিলাম। আসলে সেখানে কিছুই ছিল না।'

আসমা বিনতু আবু বকরের ঘটনাবহুল জীবনের অনেক কথাই ইতিহাস ধরে রাখতে পারেনি। তবে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর সাথে জীবনের শেষ সাক্ষাতের সময় তিনি যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক বল ও ঈমানী দৃঢ়তার পরিচয় দেন, ইতিহাসে তা চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদ বিন মু'আবিয়ার মৃত্যুর পর হিজায, মিসর, ইরাক ও খুরাসানসহ সিরিয়ার বেশীর ভাগ অঞ্চলের লোকেরা আবদুল্লাহকে খলীফা বলে মেনে নেয় এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। কিন্তু উমাইয়া রাজবংশ তা মেনে নিতে পারেননি। তারা তাঁকে দমনের জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে বিরাট এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী পাঠায়। দু'পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়, এবং তাতে আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর চরম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। পরিশেষে তাঁর সংগী সাথীরা বিজয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে। তিনি তাঁর শেষ মুহূর্তের অনুসারীদের নিয়ে কা'বার হারাম শরীফে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে উমাইয়া সেনাবাহিনীর সাথে চূড়ান্ত সংঘর্ষের কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি তার মা আসমার সাথে শেষবারের মত সাক্ষাত করতে যান। হযরত আসমা (রা) তখন বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত ও অন্ধ। মাতা-পুত্রের জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারটি নিম্নরূপ ঃ

– মা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

– আবদুল্লাহ, ওয়া আলাইকাস সালাম। হাজ্জাজ-বাহিনীর মিনজানিক হারাম শরীফে অবস্থানরত তোমার বাহিনীর ওপর পাথর নিক্ষেপ করছে, মক্কার বাড়ী-ঘর প্রকম্পিত করে তুলছে, এমন চরম মুহূর্তে তোমার উপস্থিতি কি উদ্দেশ্যে?

– উদ্দেশ্য আপনার সাথে পরামর্শ।

– পরামর্শ! কি বিষয়ে?

– হাজ্জাজের ভয়ে অথবা তার প্রলোভনে প্রলোভিত হয়ে লোকেরা আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে চলে গেছে, এমনকি আমার সন্তান এবং আমার পরিবারের লোকেরাও আমাকে পরিত্যাগ করেছে। এখন আমার সাথে অল্প কিছু লোক আছে। তাদের ধৈর্য ও সাহসিকতা যত বেশীই হোকনা কেন, দু' এক ঘন্টার বেশী তারা কোন মতেই টিকে থাকতে পারবে না। এদিকে উমাইয়ারা প্রস্তাব পাঠাচ্ছে, আমি যদি আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানকে খলীফা বলে স্বীকার করে নিই এবং অস্ত্র ফেলে দিয়ে তাঁর হাতে বাইয়াত হই তাহলে পার্থিব সুখ-সম্পদের যা আমি চাইবো তাই তারা দেবে—এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কি পরামর্শ দেন। হযরত আসমা (রা) একটু উচ্চস্বরে বলেন ঃ

– ব্যাপারটি একান্তই তোমার নিজস্ব। আর তুমি তোমার নিজের সম্পর্কে বেশী জান। যদি তোমার দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, তুমি হকের ওপর আছ এবং মানুষকে হকের দিকেই আহ্বান করছো, তাহলে তোমার পতাকাতলে যারা অটল থেকে শাহাদাত বরণ করেছে, তাদের মত তুমিও অটল থাকো। আর যদি তুমি দুনিয়ার সুখ-সম্পদের প্রত্যাশী হয়ে থাক, তাহলে তুমি একজন নিকৃষ্টতম মানুষ। তুমি নিজেকে এবং তোমার লোকদেরকে ধ্বংস করেছো।

– তাহলে আজ আমি নিশ্চিতভাবে নিহত হবো।

– স্বেচ্ছায় হাজ্জাজের কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং বনী উমাইয়াদের ছোকরারা তোমার মুণ্ডু নিয়ে খেলা করবে, তা থেকে যুদ্ধ করে নিহত হওয়াই উত্তম।

– আমি নিহত হতে ভয় পাচ্ছি না। আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমার হাত-পা কেটে আমাকে বিকৃত করে ফেলবে।

– নিহত হওয়ার পর মানুষের ভয়ের কিছু নেই। কারণ, জবেহ করা ছাগলের চামড়া তোলার সময় সে কষ্ট পায় না?

একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের মুখমণ্ডলের দীপ্তি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, 'আমার কল্যাণময়ী মা, আপনার সুমহান মর্যাদা আরো কল্যাণময় হোক। এ সংকটময় মুহূর্তে আপনার মুখ থেকে কেবলমাত্র এ কথাগুলি শোনার জন্য আমি আপনার খেদমতে হাজির হয়েছিলাম। আল্লাহ জানেন, আমি ভীত হইনি, আমি দুর্বল হইনি। তিনিই সাক্ষী, আমি যে জন্য সংগ্রাম করছি, তা কোন জাগতিক সুখ সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি লোভ-লালসা ও ভালবাসার কারণে নয়। বরং এ সংগ্রাম হারামকে হালাল ঘোষণা কব্বার প্রতি আমার ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণেই। আপনি যা পছন্দ করেছেন, আমি এখন সে কাজেই যাচ্ছি। আমি শহীদ হলে আমার জন্য কোন দুঃখ করবেন না এবং আপনার সবকিছুই আল্লাহর হাতে সোপর্দ করবেন।'

– যদি তুমি অসত্য ও অন্যায়ের ওপর নিহত হও তাহলে আমি ব্যথিত হবো।

– আম্মা, আপনি বিশ্বাস রাখুন, আপনার এ সন্তান কখনও অন্যায় অশ্লীল কাজ করেনি, আল্লাহর আইন লংঘন করেনি, কারো বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি, কোন মুসলমান বা জিম্মীর ওপর যুলুম করেনি এবং আল্লাহর রিজামন্দী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন কিছু এ দুনিয়ায় তার কাছে নেই। এ কথা দ্বারা নিজেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আমার সম্পর্কে আল্লাহই বেশী ভালো জানেন। আপনার অন্তরে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি হোক— কথাগুলি শুধু এ জন্যেই বলছি। জবাবে আসমা (রা) বললেন ঃ

– আলহামদুলিল্লাহিল্লাজী জা'আলাকা আলা মা ইউহিব্বু ওয়া উহিব্বু– সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তাঁর ও আমার পছন্দনীয় কাজের ওপর তোমাকে অটল রেখেছেন। বৎস! তুমি আমার কাছে একটু এগিয়ে এসো, আমি শেষবারের মত একটু তোমার শরীরের গন্ধ শুকি এবং তোমাকে একটু স্পর্শ করি। কারণ, এটাই আমার ও তোমার ইহজীবনের শেষ সাক্ষাৎ।

আবদুল্লাহ উপুড় হয়ে তাঁর মার হাত-পা চুমুতে চুমুতে ভরে দিতে লাগলেন, আর মা তার ছেলের মাথা, মুখ ও কাঁধে নিজের নাক ও মুখ ঠেকিয়ে শুকতে ও চুমু দিতে লাগলেন এবং তাঁর শরীরে নিজের দু'টি হাতের পরশ বুলিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি একথা বলতে বলতে তাঁকে ছেড়ে দিলেন ঃ

– আবদুল্লাহ তুমি এ কী পরেছো?

– আম্মা, এ তো আমার বর্ম।

– বেটা, যারা শাহাদাতের আকাঙ্খী এটা তাদের পোশাক নয়।

– আপনাকে খুশী করা ও আপনার হৃদয়ে প্রশান্তি দানের উদ্দেশ্যে আমি এ পোশাক পরেছি।

– তুমি এটা খুলে ফেল। তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার সাহসিকতা ও আক্রমণের পক্ষে উচিত কাজ হবে এমনটিই। তাছাড়া এটা হবে তোমার কর্মতৎপরতা, গতি ও চলাফেরার পক্ষেও সহজতর। এর পরিবর্তে তুমি লম্বা পাজামা পর। তাহলে তোমাকে মাটিতে ফেলে দেওয়া হলেও তোমার সতর অপ্রকাশিত থাকবে।

মায়ের কথামত আবদুল্লাহ তাঁর বর্ম খুলে পাজামা পরলেন এবং এ কথা বলতে বলতে হারাম শরীফের দিকে যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন – 'আম্মা, আমার

জন্য দু'আ করতে ভুলবেন না।'

সাথে সাথে তাঁর মা হযরত আসমা (রা) দু'টি হাত আকাশের দিকে তুলে দু'আ **করলেন ঃ হে আল্লাহ,** রাতের অন্ধকারে মানুষ যখন গভীর ঘুমে অচেতন থাকে তখন **তার জেগে জেগে দীর্ঘ ইবাদত ও উচ্চকণ্ঠে কান্নার** জন্য আপনি তার ওপর রহম করুন। **হে আল্লাহ, রোযা অবস্থায় মক্কা ও মদীনাতে মধ্যাহ্নকালীন** ক্ষুধা ও পিপাসার জন্য তার **ওপর রহম করুন। হে আল্লাহ,** পিতামাতার প্রতি সদাচরণের জন্য তার প্রতি আপনি **করুণা বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ,** আমি তাকে আপনারই কাছে সোপর্দ করেছি, তার জন্য **আপনি যে ফায়সালা** করবেন তাতেই আমি রাজী, এর বিনিময়ে আপনি আমাকে **ধৈর্যশীলদের প্রতিদান** দান করুন।'

সেদিন সূর্য অস্ত যাবার আগেই হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর তাঁর মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হন। তাঁর শাহাদাতের কিছুদিনের মধ্যেই হিজরী ৭৩ সনে হযরত আসমাও (রা) ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল এক শ' বছর। মহিলা সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে মৃত্যুবরণ করেন। (সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮৮)

হযরত আবদুল্লাহকে (রা) হত্যার পর হাজ্জাজ তাঁর লাশকে শূলিতে লটকিয়ে রেখেছিল। তাঁর মা আসমা এলেন ছেলের লাশ দেখতে। লটকানো লাশের কাছে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন, 'এ সওয়ারীর এখনো ঘোড়া থেকে নামার সময় হলো না?' জনতার ভিড় কমানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে নেওয়ার জন্য হাজ্জাজ লোক পাঠায়। তিনি যেতে অস্বীকৃতি জানান। সে আবারো লোক মারফত বলে পাঠায়, এবার না এলে, তাঁর চুলের গোছা ধরে টেনে আনা হবে। হযরত আসমা হাজ্জাজের ভয়ে ভীত হলেন না। তিনি গেলেন না। এবার হাজ্জাজ নিজেই এলো। তাদের দু'জনের মধ্যে নিম্নরূপ কথাবার্তা হলো। হাজ্জাজ বললো ঃ

– 'বলুন তো আমি আল্লাহর দুশমন ইবন যুবায়েরের সাথে কেমন ব্যবহার করেছি?' আসমা বললেন, 'তুমি তার দুনিয়া নষ্ট করেছো। আর সে তোমার পরকাল নষ্ট করেছে। আমি শুনেছি, তুমি নাকি তাকে 'যাতুন নিতাকাইন' তনয় বলে ঠাট্টা করেছো। আল্লাহর কসম, আমিই 'যাতুন নিতাকাইন'। আমি একটি নিতাক দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) ও আবু বকরের (রা) খাবার বেঁধেছি। আরেকটি নিতাক আমার কোমরেই আছে। মনে রেখ, নবী করীমের (সা) কাছ থেকে আমি শুনেছি, সাকীফ বংশে একজন মিথ্যাবাদী ভণ্ড এবং একজন যালিম পয়দা হবে। মিথ্যাবাদীকে তো আগেই দেখেছি। (আল-মুখতার) আর যালিম তুমিই।' হাজ্জাজ এ হাদীস শুনে নীরব হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম ঃ ২য় খণ্ড)।

হযরত আসমা থেকে ৫৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তেরোটি মুত্তাফাক আলাইহি এবং বুখারী পাঁচটি ও মুসলিম চারটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বহু বিশিষ্ট সাহাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ তাঁর দুই ছেলে—আবদুল্লাহ ও 'উরওয়া, পৌত্র আবদুল্লাহ ইবনে 'উরওয়া, প্রপৌত্র 'উব্বাদ ইবন আবদিল্লাহ, ইবন আব্বাস, আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী, সাফিয়্যা বিনতু শায়বা, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, ওয়াহাব ইবন কায়সান, আবূ নাওফিল মুয়াবিয়া ইবন আবী আকবার, আল-মুত্তালিব ইবন আবদুল্লাহ ইবন হানতাব, ফাতিমা বিনতুল মুনজির ইবনুয যুবাইর, ইবন আবী মুলাইকা, 'উব্বাদ ইবন হামযা ইবন আবদুল্লাহ এবং আরও অনেকে। (সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ২/২৮৮)।

মুসয়াব ইবন 'উমাইর (রা)

নাম মুসয়াব, কুনিয়াত আবু মুহাম্মদ। ইসলাম গ্রহণের পর লকব হয় মুসয়াব আল-খায়ের। পিতা 'উমাইর এবং মাতা খুনাস বিনতু মালিক। পিতা-মাতার পরম আদরে ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত মক্কার অন্যতম সুদর্শন যুবক ছিলেন তিনি। মা সম্পদশালী হওয়ার কারণে অত্যন্ত ভোগ বিলাসের মধ্যে তাঁকে প্রতিপালন করেন। তখনকার যুগে মক্কার যত রকমের চমৎকার পোশাক ও উৎকৃষ্ট খুশবু পাওয়া যেত সবই তিনি ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে কোনভাবে তাঁর প্রসংগ উঠলে বলতেন ঃ 'মক্কায় মুসয়াবের চেয়ে সুদর্শন এবং উৎকৃষ্ট পোশাকধারী আর কেউ ছিল না।' (তাবাকাত) ঐতিহাসিকরা বলেছেন ঃ 'তিনি ছিলেন মক্কার সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি ব্যবহারকারী।'

সৌন্দর্য্য, সুরুচি ও সৎ স্বভাবের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরটি দারুণ স্বচ্ছ করে তৈরী করেছিলেন। তাওহীদের একটি মাত্র ঝলকেই তিনি শিরকের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন এবং হযরত রাসূলে পাকের দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সেই সময়ের কথা যখন রাসূল (সা) হযরত আরকামের বাড়ীতে অবস্থান করে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চলেছিলেন এবং মুসলমানদের সামনে মক্কার মাটি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিলো।

মক্কার অলিতে-গলিতে, কুরাইশদের আড্ডায়, পরামর্শ সভায় তখন একই আলোচনা—মুহাম্মদ আল আমীন ও তাঁর নতুন দ্বীন আল ইসলাম। কুরাইশদের এই আদুরে দুলাল এসব আলোচনা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতেন। অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি হতেন কুরাইশদের সকল বৈঠক ও মজলিসের শোভা ও মধ্যমণি। তাদের প্রতিটি বৈঠকে সবার কাম্য হতো তাঁর উপস্থিতি। তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্য তাঁর হৃদয়ের সকল দ্বার, সকল অর্গল উন্মুক্ত করে দেয়।

তিনি শুনতে পেলেন, রাসূল (সা) ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীরা কুরাইশদের সকল অর্থহীন কাজ ও তাদের যুলুম অত্যাচার থেকে দূরে থেকে সেই সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আল আরকাম ইবন আবিল আরকামের বাড়ীতে সমবেত হন। সব দ্বিধা সব দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে একদিন সন্ধ্যায় তিনি হাজির হলেন দারুল আরকামে। রাসূল (সা) সেই দিনগুলিতে সেখানে তাঁর সাথীদের সংগে মিলিত হতেন, তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন এবং তাদের সাথে নামায আদায় করতেন।

মুসয়াব ইবন উমাইর দারুল আরকামে বসতে না বসতেই কুরআনের আয়াত নাযিল হলো। রাসূলের (সা) যবান থেকে সে আয়াত বের হয়ে তা যেন সকল শ্রোতার কর্ণকুহরে ও হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে লাগলো। সেই বরকতময় সন্ধ্যায় ইবন 'উমাইরও হয়ে গেলেন এক বিশ্বাসী অন্তঃকরণের অধিকারী। খুশী ও আনন্দে তিনি হয়ে পড়েন আত্মহারা। রাসূল (সা) তাঁর একটি পবিত্র হাত বাড়িয়ে দিলেন মুসয়াবের বুকের ওপর। দারুণ এক প্রশান্তিতে বিভোর হয়ে পড়েন মুসয়াব। মুহূর্তে তিনি তাঁর বয়সের

তুলনায় বহুগুণ বেশী হিকমত ও জ্ঞান লাভ করলেন এবং এমন দৃঢ়তা অর্জন করলেন যে হাজারো বিপদ মুসীবাত তাঁকে আর কোনদিন বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি।

মুসয়াবের মা খুনাস বিনতু মালিক ছিলেন এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। মুসয়াব তাকে যমের মত ভয় করতেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ধরাপৃষ্ঠে একমাত্র তাঁর মা ছাড়া আর কারো ভয় পেতেন না। কুরাইশ ও তাদের দেব-দেবীসহ সকল শক্তি তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হলো। কিন্তু মায়ের ভয় তিনি দূর করতে পারলেন না। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণের সংবাদটি চেপে যাওয়ার। দারুল আরকামে যাতায়াত চলতে লাগলো। রাসূলুল্লাহর (সা) মজলিসে বসতে লাগলেন। কিন্তু তার মা কিছুই জানতে পেলেন না।

একদিন গোপনে তিনি দারুল আরকামে প্রবেশ করছেন, উসমান ইবন তালহা তা দেখে ফেললো। আরেক দিন তিনি মুহাম্মাদের (সা) মত নামায পড়ছেন, সেদিনও তা উসমানের চোখে পড়ে যায়। বাতাসের আগে খবরটি মক্কার অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর মায়ের কানেও খবরটি পৌঁছে গেল।

মুসয়াবকে তাঁর মা, গোত্রের লোকজন ও মক্কার নেতৃবৃন্দের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। তিনি অত্যন্ত স্থির বিশ্বাস ও প্রশান্ত চিত্তে তাদেরকে পাঠ করে শুনাতে লাগলেন কুরআনের সেই মহাবাণী যার ওপর তিনি ঈমান এনেছেন। মা তাঁর গালে থাপ্পড় মেরে চুপ করিয়ে দিতে চাইলেন। বকাঝকা, মারপিট চললো। তারপর তাঁকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হলো।

তিনি বন্দী অবস্থায় কাটাতে লাগলেন। রাত্রিদিন চব্বিশ ঘন্টা তাঁকে পাহারা দেয়া হয়। এর মধ্যে তিনি খবর পেলেন, তাঁরই মত কিছু মুমিন মুসলমান হাবশায় হিজরাত করছেন। তিনি মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে সেই দলটির সাথে হাবশায় চলে গেলেন।

একদিন মুসলমানদের একটি দল রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে বসে আছেন। এমন সময় পাশ দিয়ে তারা মুসয়াবকে যেতে দেখলেন। তাঁকে দেখেই বৈঠকে উপস্থিত সকলের মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। তাঁদের দৃষ্টি নত হয়ে গেল। কারো কারো চোখে পানি এসে গেল। কারণ, মুসয়াবের গায়ে তখন শত তালি দেওয়া জীর্ণ শীর্ণ একটি চামড়ার টুকরো। তাতে মারাত্মক দারিদ্রের ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁদের সকলের মনে তখন তাঁর ইসলাম পূর্ব জীবনের ছবি ভেসে উঠলো। তখনকার পরিচ্ছদ হতো বাগিচার ফুলের মত কোমল চিত্তাকর্ষক ও সুগন্ধিময়। এ দৃশ্য দেখে একটু মুচকি হেসে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'মক্কায় আমি এ মুসয়াবকে দেখেছি। তার চেয়ে পিতামাতার বেশী আদরের আর কোন যুবক মক্কায় ছিল না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বতে সবকিছু সে ত্যাগ করেছে।'

কিছুদিন হাবশায় থাকার পর তিনি মক্কায় ফিরে এলেন। তারপর রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে আরেকটি দলকে সংগে করে হাবশায় চলে যান। কিন্তু মুসয়াব উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি মক্কায়, হাবশায় যেখানেই থাকুন না কেন, জীবন তাঁর নতুন-রূপ ধারণ করেছে। তাঁর একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা) এবং একমাত্র কাম্য মহাপ্রভু আল্লাহর সন্তুষ্টি।

তাঁর মা নতুন দ্বীন থেকে ফিরাতে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে সবকিছু দেওয়া বন্ধ করে দিল। যে ব্যক্তি তাঁদের দেব-দেবীকে ছেড়ে দিয়েছে, তাদের গালাগাল করে, তা সে নিজের পেটের ছেলেই হোকনা কেন, তাকে সে কোন মতেই খেতে পরতে দিতে পারে না।

মুসয়াব হাবশা থেকে ফিরে আসার পর তার মা আবারো তাকে বন্দী করতে চাইলো। তিনি মায়ের মুখের ওপর কসম খেয়ে বললেন ঃ যদি তুমি এমনটি কর এবং যারা তোমার এ কাজে সাহায্য করবে তোমাদের সবাইকে আমি হত্যা করবো। মা তার এই বেয়াড়া ছেলেকে জানতো। তাই কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বিদায় দিল, আর তিনিও মাকে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় দিলেন।

বিদায় মুহূর্তে মা যেমন কুফরীর ওপর ছেলেও তেমনি ঈমানের ওপর অটল। প্রাণ-প্রিয় ছেলেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে বের করে দিতে দিতে মা বলছে ঃ 'তোমার যেখানে খুশী যাও। আমাকে আর মা বলে ডেক না।' ছেলে একটু মায়ের দিকে এগিয়ে বললেন ঃ 'মা আমি আপনাকে ভালো কথা বলছি, আপনার প্রতি আমার দারুণ মমতা রয়েছে। আপনি একবার একটু বলুন, আশহাদু আন্-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।' মা উত্তেজিত হয়ে নক্ষত্ররাজির নামে কসম খেয়ে বললেন ঃ 'আমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করবো না। তোমার দ্বীন গ্রহণ করলে আমার মতামত ও বুদ্ধি বিবেক দুর্বল বলে মনে করা হবে।' এভাবে কুরাইশদের সেই চরম আদুরে ও বিলাসী যুবক মুসয়াব বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন। এখন তিনি মোটা শতচ্ছিন্ন তালিযুক্ত পোশাক পরেন। একদিন খাবার জুটলে অন্যদিন অভুক্ত কাটান। কিন্তু বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত তাঁর অন্তরটি।

হজ্জের সময় মদীনা থেকে কতিপয় লোক মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে গোপনে আকাবায় সাক্ষাৎ করলো এবং তাঁর ওপর ঈমান এনে বাইয়াত করলো। তারা মদীনায় ফিরে গেল। তাদেরকে দ্বীনের তালীম দেওয়ার এবং অন্যদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে, এবং মদীনাকে হিজরাতের জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে রাসূল (সা) মুসয়াবকে দূত হিসাবে মদীনা পাঠালেন। এভাবে তিনি হলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম দূত।

মক্কায় তখন মুসয়াবের চেয়েও বয়সে ও মর্যাদায় বড় অনেক সাহাবী ছিলেন। তা সত্ত্বেও এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য রাসূল তাঁকেই নির্বাচন করেন। মুসয়াব তাঁর খোদাপ্রদত্ত বুদ্ধি, মেধা ও মহৎ চরিত্রের সাহায্যে অত্যন্ত আমানতদারীর সাথে এ কঠিন দায়িত্ব পালন করেন। কঠোর সাধনা, নিষ্ঠা ও মহত্বের সাহায্যে তিনি মদীনাবাসীদের হৃদয়ের সাথে সংলাপ করেন। ফলে দলে দলে তারা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে।

মুসয়াব মদীনায় এলেন। এর আগে মদীনার মাত্র বারো জন লোক আকাবায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি মদীনায় আসার পর কয়েক মাস যেতে না যেতেই বহু মানুষ তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী হজ্জ মওসুমে মদীনাবাসী মুসলমানদের বাহাত্তর জনের একটি প্রতিনিধিদল তাদের ধর্মীয় শিক্ষক ও নবীর দূত মুসয়াবের সাথে মক্কায় এলো এবং আকাবায় আবার রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হলো।

মুসয়াব তাঁর দায়িত্ব এবং সে দায়িত্বের সীমা সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী এবং আল্লাহর এমন এক দ্বীনের সুসংবাদ দানকারী যা মানবসমাজকে হিদায়াত ও সরল সোজা পথের দিকে আহ্বান জানায়। তাঁর ওপর এ দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই।

মুসয়াব মদীনায় পৌঁছে আসয়াদ ইবন যারারার অতিথি হলেন। তাঁরা দু'জন মদীনার বিভিন্ন গোত্রে, বিভিন্ন বাড়ীতে এবং সমাবেশে এক আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে লাগলেন। নানারকম বাধারও সম্মুখীন হলেন। কিন্তু বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের সাথে সব বাধা তাঁরা অতিক্রম করলেন।

একদিন তিনি কিছু লোককে দাওয়াত দিচ্ছেন। হঠাৎ বনী আবদিল আশহালের নেতা উসাইদ ইবন হুদাইর সশস্ত্র অবস্থায় দারুণ উত্তেজিতভাবে উপস্থিত হল। তার ভীষণ রাগ সেই ব্যক্তিটির ওপর যে কিনা মুহাম্মাদের দূত হিসাবে এখানে এসেছে এবং মানুষকে তাদের পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করতে উৎসাহিত করছে। সে তাদের উপাস্য দেব-দেবীকে গালাগালও করছে। উসাইদের এ রণমূর্তি দেখে মুসয়াবের পাশে বসা মুসলমানরা ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু না, মুসয়াব ভয় পেলেন না, সহাস্যে উসাইদকে স্বাগতম জানালেন। হাসতে হাসতে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। উসাইদ তখন তাঁকে ও আসয়াদ ইবন যারারাকে লক্ষ্য করে বলছে ঃ তোমরা আমাদের গোত্রীয় এলাকায় এসে এভাবে আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাচ্ছো কেন? যদি তোমাদের মরার সখ না থাকে তাহলে আমাদের এলাকা থেকে বেরিয়ে যাও।

হাসতে হাসতে মুসয়াব তাকে বললেন ঃ আপনি কি একটু বসে আমার কথা শুনবেন না? আমার কথা শুনুন। ভালো লাগে মানবেন, ভালো না লাগলে আমরা চলে যাব।

উসাইদ ছিল একজন বুদ্ধিমান লোক। মুসয়াবের কথা তার মনে লাগলো। এ তো বুদ্ধিমানের কথা। শুনতে আপত্তি কিসের! সে অস্ত্র ফেলে মাটিতে বসে কান লাগিয়ে মুসয়াবের কথা শুনতে লাগলো।

মুসয়াব পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে নবী মুহাম্মাদ (সা) যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তার ব্যাখ্যা করছেন, আর এদিকে উসাইদের মুখমণ্ডল একটু একটু করে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠছে। মুসয়াব তাঁর বক্তব্য এখনও শেষ করতে পারেননি, এর মধ্যে উসাইদ ও তাঁর সংগী লোকটি বলে বসলো ঃ এ তো খুব চমৎকার ও সত্য কথা। তোমাদের দ্বীনে প্রবেশ করতে গেলে কি করতে হয়? মুসয়াব বললেন ঃ শরীর ও পোশাক পবিত্র করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই সাক্ষ্য দিতে হয়।

উসাইদ উঠে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর যখন ফিরে এল তখন তার মাথার চুল থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে। দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন, 'আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।' এ খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, সাদ ইবন মুয়াজ ও সাদ ইবন উবাদা ছুটে এলেন মুসয়াবের নিকট। তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এসব নেতৃবৃন্দের ইসলাম গ্রহণের পর সাধারণ মদীনাবাসী বলাবলি করতে লাগলো, আমরা পেছনে পড়ে থাকবো কেন। চল যাই মুসয়াবের কাছে ইসলাম গ্রহণ করি।

এভাবে আল্লাহর রাসূলের প্রথম দূত এমনভাবে সফল হলেন যে, তার কোন তুলনা ইতিহাসে নেই। সময় দ্রুত গতিতে বয়ে চললো। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সংগী সাথীরা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করে এসেছেন। হিংসায় কুরাইশরা জ্বলতে লাগলো। মদীনা থেকেও তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করার ষড়যন্ত্র করলো। বদরে তারা এমন শিক্ষাই পেল যে, তাদের হিংসা প্রতিশোধস্পৃহায় রূপান্তরিত হলো। তারা আবার উহুদে মুসলমানদের মুখোমুখি হলো। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে রাসূল (সা) মুসলিম বাহিনীর মাঝখানে সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। চিন্তা করছেন কার হাতে আজ ইসলামের ঝাণ্ডাটি দেওয়া যায়। গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর মুসয়াবকে ডাকলেন তাঁরই হাতে ঝাণ্ডাটি তুলে দিলেন।

তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কুরাইশ বাহিনী পরাজয়ের মুখোমুখি। এমন সময় মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ ভুলে গিয়ে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে কুরাইশদের পিছু ধাওয়া করলো। কিন্তু তাদের এ কাজ মুসলিম বাহিনীর সুনিশ্চিত বিজয় নস্যাৎ করে দিয়ে পরাজয় বয়ে নিয়ে এলো। মুসলিম তীরন্দায বাহিনীর ছেড়ে যাওয়া গিরিপথ দিয়ে কুরাইশ বাহিনী অকস্মাৎ ঢুকে পড়ে পেছন দিক থেকে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে বসলো। মুসলিম বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লো। এই সুযোগে কুরাইশ বাহিনী তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘিরে ফেললো।

মুসয়াব ইবন উমাইর বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেন। যতটুকু সম্ভব তিনি ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরলেন, গলা ফাটিয়ে নেকড়ের মত হুঙ্কার ছাড়তে এবং জোরে জোরে তাকবীর দিতে লাগলেন। আর সেইসাথে লম্ফ ঝম্ফ মেরে আস্ফালন দেখাতে লাগলেন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো শত্রুদের দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে ফিরিয়ে নিজের প্রতি নিবদ্ধ করা। এভাবে সেদিন তিনি নিজের একটি মাত্র সত্তাকে একটি বাহিনীতে পরিণত করেন। অত্যন্ত আমানতদারীর সাথে একহাতে ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরেন এবং অন্য হাতে প্রচণ্ড বেগে তরবারি চালাতে থাকেন। শত্রুবাহিনী তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর দেহের ওপর দিয়ে তারা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছার চেষ্টা করে। হযরত মুসয়াবের অন্তিম অবস্থা সম্পর্কে ইবন সাদ বর্ণনা করে, "উহুদের দিনে মুসয়াব ইবন উমাইর ঝাণ্ডা বহন করেন। মুসলমানরা যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে মুসয়াব তখন অটল হয়ে রুখে দাঁড়ান। অশ্বারোহী ইবন কামীয়া তাঁর দিকে এগিয়ে এসে তরবারির এক আঘাতে তাঁর ডান হাতটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। মুসয়াব তখন বলে ওঠেন ঃ 'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, কাদ খালাত মিন কাবলিহির রুসূল— মুহাম্মাদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে আরো বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন।' মুসয়াব বাম হাতে ঝাণ্ডাটি তুলে ধরেন। তরবারির অন্য একটি আঘাতে তাঁর বাম হাতটিও বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। আবারো তিনি 'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল' এ কথাটি বলতে বলতে ঝাণ্ডার ওপর ঝুঁকে পড়ে দুই বাহু দ্বারা সেটি তুলে ধরেন। তারপর তাঁর প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করা হয়। পতাকাসহ তিনি মাটিতে ঢলে পড়েন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হযরত

মুসয়াব শাহাদাতের পূর্বে যে বাক্যটি বার বার উচ্চারণ করছিলেন তখনও কিন্তু সেটি কুরআনের আয়াত হিসেবে নাযিল হয়নি। উহুদের এ ঘটনার পরই 'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল....' এ আয়াতটি নিয়ে হযরত জিবরীল (আ) উপস্থিত হন।"

যুদ্ধ শেষে হযরত মুসয়াবের লাশটি খুঁজে পাওয়া গেল। রক্ত ও ধুলোবালিতে একাকার তাঁর চেহারা। লাশের কাছে দাঁড়িয়ে রাসূল (সা) অঝোরে কেঁদে ফেললেন। হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত বলেন ঃ 'আমরা আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হিজরাত করেছিলাম। আমাদের এ কাজের প্রতিদান দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব। আমাদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের এ কাজের প্রতিদান মোটেও না নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে তাঁদের একজন মুসয়াব ইবন উমাইর।

উহুদে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁকে কাফন দেওয়ার জন্য একপ্রস্থ চাদর ছাড়া আর কোন কাপড় পাওয়া গেল না। তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যাচ্ছিল। শেষমেষ রাসূল (সা) আমাদের বললেন ঃ চাদর দিয়ে মাথার দিক দিয়ে যতটুকু ঢাকা যায় ঢেকে দাও, বাকী পায়ের দিকে 'ইযখীর' ঘাস দাও। রাসূল (সা) মুসয়াবের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে পাঠ করলেন ঃ মিনাল মু'মিনীনা রিজানুল সাদাকু আহাদুল্লাহ আলাইহি.... মুমিনদের এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে। তারপর তাঁর কাফনের চাদরটির প্রতি তাকিয়ে বলেন ঃ আমি তোমাকে মক্কায় দেখেছি। সেখানে তোমার চেয়ে কোমল চাদর এবং সুন্দর যুলফী আর কারো ছিল না। আর আজ তুমি এখানে এই চাদরে ধুলি মলিন অবস্থায় পড়ে আছ। তিনি আরো বলেন ঃ 'আল্লাহর রাসূল সাক্ষ্য দিচ্ছে, কিয়ামতের দিন তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে সাক্ষ্যদানকারী হবে।' তারপর সংগীদের দিকে ফিরে তিনি বলেন ঃ 'ওহে জনমণ্ডলী, তোমরা তাদের যিআরত কর, তাদের কাছে এস, তাদের ওপর সালাম পেশ কর। যাঁর হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ, কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ তাঁদের ওপর সালাম পেশ করবে তারা সেই সালামের জওয়াব দেবে।'

হযরত মুসয়াবের ভাই আবুর রাওম ইবন উমাইর, আমের ইবন রাবীয়া এবং সুয়াইত ইবন সাদ তাঁকে কবরে নামিয়ে দাফন কাজ সম্পন্ন করেন।

হযরত মুসয়াব ছিলেন প্রখর মেধাবী, উদার ও প্রাঞ্জলভাষী বাগ্মী। যে দ্রুততার সাথে ইয়াসরিবে (মদীনা) ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল তাতেই তাঁর এসব গুণের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর শাহাদাত পর্যন্ত যতটুকু কুরআন নাযিল হয়েছিল, তিনি মুখস্থ করেছিলেন। মদীনায় সর্বপ্রথম তিনিই জুময়ার নামায কায়েম করেন। মদীনায় মুসলমানদের সংখ্যা যখন একটু বেড়ে গেল তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি নিয়ে হযরত সাদ ইবন খুসাইমার (রা) বাড়ীতে জুময়ার নামাযের সূচনা করেন। তিনিই ইমামতি করেন। নামাযের পর একটি ছাগল যবেহ করে মুসল্লীদের আপ্যায়ন করা হয়। (তাবাকাত)

— প্রথম খন্ড সমাপ্ত —

গ্রন্থপঞ্জি

১. ইবন সা'দ– তাবাকাত,
২. ইবন হাজার আসকিলানী– আল ইসাবা,
৩. ইবন হিশাম– আস-সীরাহ,
৪. ইবন কাসীর– আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,
৫. ইবন আবদিল বার– আল-ইসতিয়াব,
৬. আজ-জাহাবী– তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ,
৭. তাবারী– তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক,
৮. আজ-জাহাবী– তারীখুল ইসলাম
৯. ইবন 'আসাকির– তারীখু দিমাশ্ক আল-কাবীর,
১০. ইউসুফ কান্ধালুবী– হায়াতুস সাহাবা,
১১. খালিদ মুহাম্মদ খালিদ– রিজালুন হাওলার রাসূল,
১২. ডঃ আবদুর রহমান রাফত আল-বাশা– সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা,
১৩. মুহাম্মদ আল-খিদরী বেক– তারীখুল উম্মাহ্ আল-ইসলামিয়্যা
১৪. মাওলানা মুঈনুদ্দীন নাদবী– মুহাজিরীন (উর্দু),
১৫. দায়িরাতুল মায়ারিফ আল-ইসলামিয়্যা,
১৬. হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ।